তোমাকে....

অনিরুদ্ধ বসু



Papia Ghoshal
27.07.2011

তোমাকে....

অনিরুদ্ধ বসু


Papia Ghoshal
27.07.2011

তোমাকে....

অনিরুদ্ধ বসু



স্মৃতি পাবলিশার্স্র্

TOMAKE
A Bengali Novel by ANIRUDDHA BOSE
Published by SMRITI PUBLISHERS
Email: smriti@smritipublishers.com
Website: www.smritipublishers.com

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১১

প্রচ্ছদপট: পাপিয়া ঘোষাল

অলংকরণ: স্বপন দত্ত

প্রকাশক

স্মৃতি বসু

ওয়েসিস্ব সি.এফ-৪১ সেক্টর ১

সল্ট লেক সিটি

কলকাতা ৭০০০৬৪

ISBN No: 978-93-82303-16-9

আমার বোন

সুমনা বসুকে

যাদের উপদেশ এ লেখাকে সমৃদ্ধ করেছে:

আশিস কুমার চট্টোপাধ্যায়

দেবজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

সুধীতি নস্কর

জাগরী বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা

অনিরুদ্ধ বসুর ‘তোমাকে’-র পান্ডুলিপিটি পড়ার পর একটা কথাই মনে হল যে আধুনিক বাংলা সাহিত্য সত্যি সত্যিই বোধহয় সাবালক হয়ে যাচ্ছে। সাহিত্যের ম্যচুরিটির পরিচয় বলতে একদল লোক বোঝেন অকপট যৌনতা অবাধে বলার অধিকার। আমি সে দলে নই। সাহিত্যের সাবালকত্ব শুধুমাত্র যৌনতার খুল্লামখুল্লা বিবরণেই হয় না। আরও অনেক কিছুই প্রয়োজন সেই তকমাটুকু অর্জন করার জন্য। সবচেয়ে বেশি করে যেটা লাগে, তা হল যাকে বলে সেরিব্রাল ম্যচুরিটি, অর্থাৎ মানসিক সাবালকত্ব। সেটা বোঝা যাবে কী করে? উত্তরটা হল, মানসিক বিস্তৃতি দেখে।

সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি। জীবন বলতে আমরা কী বুঝি, এ প্রশ্ন করলে নানান জন নানা উত্তর দেবেন, কেন না প্রত্যেকেই জীবনকে নিজের প্যারাডাইম দিয়ে দেখেন এবং বিচার করেন। কিন্তূ জীবন শুধুমাত্র একজন বা এক দল বা এক জাতির দর্শন নয়। জীবন মানে এর উপরেও অনেক কিছু। প্রকৃতির সঙ্গে ইন্টার্যা কশনটাই জীবন। তাই তার মধ্যে এমন অনেক কিছু ঢুকে পড়ে, যা হয়ত-বা একজন সাধারণ মানুষের হিসেবের বাইরে। সাহিত্য তখনই সাবালকত্ব অর্জন করে, যখন এই সব অজানা অচেনা দিকগুলো সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

‘তোমাকে’ উপন্যাসটি সেইরকম একটি গন্ডিভাঙা লেখা। না, চিঠি দিয়ে লেখা বলে নয়, কারণ বাংলা সাহিত্যে পত্রসাহিত্যের অভাব নেই। ‘তোমাকে’-র অনন্যতা অন্যখানে। এর নতুনত্ব হল ভার্টিকাল টাইম (যাকে বাংলা করে বলা যেতে পারে ‘উল্লম্ব সময়’)-এর মত একটা কঠিন ম্যথেমেটিকাল কনসেপ্ট নিয়ে দুজন মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাকে ফুটিয়ে তোলা।

নায়ক এবং নায়িকা, কারও নাম নেই (এটাও একটা নতুন স্টাইল বলা যায়)। নামহীন দুজন মানব-মানবী আধুনিক জীবনের গোলকধাঁধায় কানামাছি খেলছে

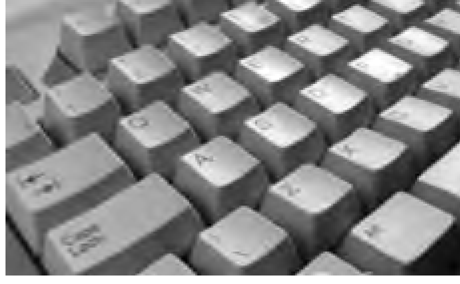
নিজের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে, সময়ের সঙ্গে। প্রেমকে খুঁজতে গিয়ে কামের চোরাবালিতেও পড়েছে। আর তাদের এই খোঁজাটা তাদের পৌঁছে দিচ্ছে সময়ের অন্দরমহলে। এই সেই সময়, যা এক উদাসী সন্ন্যাসীর মত বয়ে চলেছে কোন দিকে না তাকিয়ে। কিন্তূ হঠাৎ হঠাৎ এই উদাসীর চলার ছন্দেও আসে ছন্দভাঙার খেলা। সময় হয়ে ওঠে উল্লম্ব। আর এই ভর্টেক্সে যে পড়ে, সেই আস্বাদন করে এক তূরীয় লোকের অনন্য অভিজ্ঞতা।

অনিরুদ্ধর কৃতিত্ব, সে এই কঠিন কনসেপ্টটিকে আমাদের ধরা ছোঁওয়ার নাগালে পৌঁছে দিয়েছে। বাকিটা মননশীল পাঠকের নিজের মোকাবিলা, সময়ের সঙ্গে।

দুর্গাপুর,

মে, ২০১১ আশিস কুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচি



প্রথম চিঠি

কস্তূরী

ভালোবাসি!

কথাটা বলতে গিয়েও হয়ত কোনোদিন বলা হয়নি। নানানভাবে তা প্রকাশ পেয়েছে কখনও বা কবিতার ছন্দে। কখনও বা অনুভূতির আনন্দে! হয়ত বা কখনও নিস্তব্ধ কোনো এক মুহূর্তে, একাকী নির্জনে! ভাষা হয়ত থেমে গিয়ে হারিয়ে গেছে এক মৌনতার নিস্তব্ধ মিছিলে....আকাশের ওই উত্তঙ্গ নীলে....চুপ করে থাকা সাদা ধবধবে মেঘগুলো কী কিছু বলতে চেয়েছিল সেদিন? তোমাকে? আমাকে? কিংবা আমাদের দুজনকে? সুর্য্যের ওই বর্ণালি আলোর প্লাবনে ডুবে যাওয়া চাঁদের পাহাড়টাকে সরিয়ে....স্মৃতির দুয়ারে পেছন ফিরে আরেকবার দেখার?

স্পর্শটা বোঝার হয়ত সময় ছিলনা আমাদের....

যখন অনুভূতি ছুটে চলে উত্তাল বেগে, তখন হয়ত ঠিক সময় হয়না বিবেককে আরেকবার পরখ করে দেখার....বিহঙ্গের সাবলীল উড়ে যাওয়া নিস্তরঙ্গ ছন্দ তখন হয়ত ফিরে তাকাতে চায়না পুরোনো ফেলে আসা স্মৃতির জলসাঘরে। তখন জীবন এক কবিতা! জীবন এক সুর! জীবন এক পটে আঁকা ছবি! জীবন তখন বাঁচার এক নতুন মন্ত্র !! মগজের যন্ত্রটা তখন সাহারার মরুভুমির মতন একটা বেসুরো রাগ। শুনতে চায়না মন....

তুমি সপ্তর্ষির দিকে তাকিয়ে বলেছিলে— কোনটা ধ্রুবতারা বলতো?

আমি বলেছিলাম— তোমাকে যখন চিনে ফেলেছি ধ্রুবতারা জেনে কী হবে?

আসলে সব নক্ষত্রের মধ্যে তো ধ্রুবতারাটাই সব থেকে উজ্জ্বল । নক্ষত্র চিনে আমার কী লাভ? পাশে বসে থাকা ঢাকাই শাড়ি পরা একটু লম্বাটে মুখের ছিপছিপে অবয়বটা যখন আমার পাশে রয়েছে তখন ধ্রুবতারা, ইষ্টদেবতা, স্বর্গ-নরকের পরিত্রাতা এসব জেনে কী হবে?

তুমি যখন আছো, তখন মোহময় কিংবা নিরাময় পৃথিবীর স্বাদ তো তোমার মধ্যেই! সেই স্বাদ ছেড়ে, আর কোন স্বাদের পেছনেই বা ছুটব আমি বৃথাই? কিংবা বুঝব? কেন-ই বা?

তোমার আলতো সরানো সাদা-নীল ঢাকাই শাড়ির পাটের ফাঁক থেকে তোমার সাদা ব্লাউজে ঢাকা স্তনটা কী ধ্রুবতারার থেকে কম আকর্ষণীয়? দূরের কোনো এক না-চেনা উজ্জ্বলতা , কিংবা এক না-দেখা নিরাকার নিরাময়তার আকার খোঁজার কী কোনো মানে আছে? যখন সব সৌন্দর্যের সাকার, তোমার ওই আলতো নরম উষ্ণ হাতটা চেপে ধরে রেখেছে, আমার ঘাসে ভিজে যাওয়া তালুকে? তাকে অস্বীকার করি কী করে?

নামটা জানা না থাকলেও সৌম্যদার বিয়েতে রুপোলি থালা হাতে গোলাপটা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলে আমার দিকে। সেই মুহূর্তে প্রথম দেখেছিলাম তোমাকে....

আমার কাজ করা কোহিনূরের গিলে করা পাঞ্জাবির বোতামের ফাঁকে গোলাপটা গুজতে হাত উঠেছিল তোমার। আমার চোখে চোখ রেখে মিষ্টি হেসে বলেছিলে— এখানেই এটা মানায়।

কোথায় মানায় জানিনা। জানবার মতন মনের অবস্তাও তখন ছিলনা আমার। তোমার সুগন্ধি দেহের সুবাসে আমি তাকিয়েছিলাম তোমার ঘন এলোচুলের দিকে....বড় কাছ থেকে অনুভব করছিলাম তোমার দেহের নিজস্ব সুবাস। সেদিন কি তুমি মিষ্টি দ্য রোশা লাগিয়েছিলে? না কি শ্যনেল? না কি তোমার নিজের

দেহের-ই সুবাস? সুবাসটাকে অনুভব করতে পারি, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ধরেও রাখতে পারি। কিন্তু কি করব বলো? সুবাসের বাহারি নামটা তো কোনোদিন শিখিনি। শেখবার সুযোগও হয়নি....সামর্থ তো নয়-ই! তবে তোমার ঘিয়ে রং-এর মটকা শাড়ির খয়রি পাড়ে, অন্যান্য বেনারসী পরা মহিলাদের থেকে, তোমাকে মনে হয়েছিল আলাদা। এই নিরাম্বর আড়ম্বরটাই বেশি করে আকর্ষণ করেছিল আমাকে। তুমি যেই হও না কেন, তুমি সবার থেকে আলাদা। আমার স্বপ্নের আকাশের না-দেখা কোনো এক না-চেনা তারা।

সেই প্রথম তোমাকে দেখা। বিয়েবাড়ির হাজারও লোকের ভিড়ে আমার বুকে, নিমন্ত্রিত হাজারও জনকে আপ্যায়নের ফাঁকে, তোমার সেই ক্ষণিকের শ্বাস-প্রশ্বাস, সারা সন্ধেটাকে গোলাপের সুবাসে আর রঙিন আলোর স্বপ্নে ভরিয়ে দিয়েছিল।

সেই প্রথম!

তুমি বোধহয় সেই ভিড়ের মধ্যে ভালো করে দেখোনি আমাকে। তবুও একবার ফিরে না তাকালেও, তুষের আগুনের মতন ভেতরের পুঞ্জীভূত একটা অনুভূতিকে, দূরতর প্রদীপের মতন, একটা বহ্নিশিখা যে দাবানলে পরিণত করতে পারে, আমিও বুঝিনি সেদিন।

নাম জানিনা। হদিসও জানিনা। তবুও সেই স্নিগ্ধতার আগুন, ফাগুণ লাগিয়েছিল আমার কৃষ্ণচূড়ার রঙে ভরা মন্পলাশের আকাশে। আমার একলা রাতের শেষ নিদ্রাকে কেড়ে নিয়েছিল ভৈরবীর শেষ রাগিনীর নীরব ঝংকারের ঐকতানে....

এই সেই না-চেনা তুমি! হয়ত ঠিক সেই মুহূর্তে তুমি ছুঁয়ে গিয়েছিলে আমার আমিকে....

পরের দিন সূর্য্য উঠেছিল। কিন্তু সুর্য্যের প্রখর দিপ্তী ম্লান করে দিতে পারেনি তোমার ওই মুহূর্তে দেখা মুখ। সৌম্যদার বিয়ের অবগুণ্ঠন ভেদ করে বারবার

ফিরে এসেছিল আমার একাকী মনের নিভৃতে।

তার পর বেশ কয়েক মাস কেটে গেছে।

ওআমায় চিনতে পারছেনঃ এক আধা চেনা মেয়ের কণ্ঠস্বরে ফিরে তাকালাম ভিড়ের মধ্যে। প্রিয়া সিনেমা হলের সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে মুহূর্তের জন্য হলেও থমকে দাঁড়ালাম।

কে ডাকছে?

বহু লোকের ভিড় ঠেলে তুমি তোমার কচিঘাস রং-এর টাঙ্গাইল শাড়ির আঁচলের পাড়টা ঠিক করতে করতে আমার দিকে স্মিত হাসি হেসে এগিয়ে এসে আবার বললেওচিনতে পারছেনঃ

বহুদিন ধরে, বুকের মধ্যে এক স্বপ্নের নীড়ের মতন আগলে রাখা একটা না-ভোলা মুখ, যেন আবার স্বশরীরে জীবন্ত হয়ে উঠল প্রিয়ার সামনে অনেক লোকের ভিড়ের মধ্যে....আমার নিস্তব্ধ একাকী অনুভূতির বাস্তবের ফসল হয়ে।

ওকেন চিনব না? সেই তো বিয়েবাড়িতে দেখা হয়েছিল। ভাবতে পারিনি মনে রাখবেনঃ

ওএ মা! মনে রাখব না কেন? সেদিন গোলাপটা পরাতে গিয়ে মনে হয়েছিল এখানেই এটা বেশি মানায়। আপনার ওই পাঞ্জাবির বোতামের ফাঁকেঃ

আমি আশ্চর্য হয়ে গেছিলাম, কী করে এতদিন পরেও তুমি আমার কথা মনে রেখেছিলে? ভেবেছিলাম, ওটা তো আমার চোখ দিয়ে তোমাকে মুহূর্তের জন্য দেখা। পাওয়ার সুপ্ত বাসনা জাগার আগে, না-পাওয়ার বেদনা। হঠাৎ মনে পড়ল তোমার না-দেখা লাজুক চাওনির মধ্যেও হয়ত বা তোমার কাজলকালো চোখ সুনিবিড় ভাবে আড়চোখে দেখেছিল আমাকে।

ওআপনাকেও ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছিলঃ আমার বুকের হৃদস্পন্দনের কম্পণ যে কত দ্রুত স্বরে বাজছিল তুমি কি বুঝতে পেরেছিলে সেই মুহূর্তে? জানবই বা কী

করে? জানতে গেলে তো তোমার না-দেখা চাওনির ভাষা বুঝতে হবে আমাকে। হয়ত আরও চিনতে হবে তোমাকে....

একটু সলজ্জ হাসি হেসে বলেছিলেঃওআপনি কি কোনো কাজে যাচ্ছেনঃ

ওকাজের আগে কি কেউ সিনেমা দেখতে আসেঃ আমি একগাল হেসে বলেছিলাম।

ওতাহলে এক কাপ চায়ের দাবি কি করতে পারি? না কি সেটা অনধিকার চর্চা হয়ে যাবেঃ তুমি মুচকি হেসে আমার দিকে তাকিয়েছিলে।

ওকেন? অনধিকার হবে কেন? বেশ তো, চলুন না তবে কোথাও গিয়ে বসিঃ অধিকারের বেড়াজাল ভেঙে দেখতে চেয়েছিলাম তোমাকে।

দেশপ্রিয় পার্কের গা ঘেঁষে দুজনে তখন সিনেমার ভিড় পেছনে ফেলে এসেছি। সন্ধ্যেবেলার জমজমাট কলকাতা তার আলোর রোশনাই ছড়িয়ে দিয়েছে জনবহুল এই রাস্তা র সন্ধ্যালোকে। হাজারও লোকের নিজস্ব মিছিলে। উচ্ছল প্রাণনগরীর কেন্দ্রের কোলাহলে।

সূর্য্য পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়ার আগের মুহূর্তে লেক মার্কেটের ওপাশে হাজারও মানুষের পদধূলি স্পর্শ করে বিদায় নেওয়ার আগে, শাড়ির দোকান থেকে মহিলাগোষ্ঠির গুঞ্জন, সিনেমা ফেরত তরুণ -তরুণীদের সিনেমা নিয়ে সরব কুজন, আর ঘর ফেরা গৃহস্থদের কাজের শেষে গিন্নির ফিরিস্তি মেনে লেক মার্কেটের দিনের শেষ বাজারের মধ্যে....তো কোনো নতুন সুর শুনতে পাচ্ছিলাম না।

হয়ত সেই সুর আবার খুঁজে পাব তোমার মধ্যে....তোমার দিকে তাকিয়ে....তোমাকে পেয়ে....

মনে মনে ভাবছিলাম, যাই কোথায়? রাসবিহারী আর শরৎ বোস রোডের মোড়ে সেই সাবেকি তৃপ্তির দোকানে বসা যেতেই পারে। হঠাৎ মনে পড়ল রোয়িং ক্লাব তো এখান থেকে বেশি দূর নয়। একটু হাঁটলেই পৌঁছে যাওয়া যেতে পারে।

ওখানে লেকের পাশের মাঠটা নিরিবিলিও বটে। অনেকদিনের বুকের স্বপ্নটাকে বাস্তবে ঠাঁই দিতে হলে, এর থেকে আর ভালো জায়গা আর কী-ই বা থাকতে পারে এই মুহূর্তে?

ওএকটু হাঁটতে অসুবিধা আছেঃ তোমার চটির দিকে চেয়ে বললাম।

ওনাঃ....কদ্দূরঃ তুমি ফিরে তাকালে, আমি গ্রামের লোকের মতনওহোঃ বলে বসি কিনা।

ওআমি একমাত্র একটা ক্লাবেরই মেম্বার। ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব। আমার ক্ষিদেও পেয়েছেঃ

ওবেশ তো চলুন না। ওখানেই গিয়ে বসি। অনেকদিন আগে একবার কুট্টি কাকা আমাদের ওখানে নিয়ে গেছিল। জলের ধারে, তাই নাঃ

ওহ্যাঁ ঢাকুরিয়া লেকের গা ঘেঁষেঃ

ওআমার জলের ধারে বসতে খুব ভালো লাগেঃ তুমি ছোট্ট একটা বাচ্চার মতন নিজের মনেই বলে উঠলে।

ওআমারওঃ বলতে গিয়েও বলতে পারলাম না তোমাকে পাশে পেয়ে....

জল, ফুল আর অরণ্য কার না ভালো লাগে? আর যদি সন্ধ্যারাতে পরিষ্কার আকাশে তারা ওঠে, তাহলে তো কথাই নেই। শুষ্ক, রুক্ষ লোকের মনেও যে দু-কলি প্রেমের অনুভূতির উদয় হবেনা....এমনও কি স্বপ্নে ও ভাবা যায়?

স্বপ্ন যদি মুহূতের্র জন্য হলেও, বাস্তবের পৃথীবীতে চাঁদের মতন নেমে আসে, ক্ষতি কী? সেই মুহূর্তে স্বপ্ন ও থাকেনা, বাস্তব থাকেনা। শুধু থেকে যায় মুহূর্তটুকু। তোমাকে তো শুধু সেই মুহূর্তের জন্যই চাইছিলাম আমি। তুমিও বোধহয় সেভাবেই চেয়েছিলে আমাকে। ভাবনাটাকে চাঁদের পাহাড়ে ভাসিয়ে দিয়ে জীবনের ছন্দটাকে একটু-বা ঝালিয়ে নিতে....তার আগে কিছু ভাবিনি। পরেও কিছু ভাববার মতন কোনো অবকাশ-ই ছিলনা আমার। হয়ত সামনে-পেছনে সব

সময় সেই শূন্যতাই শুধু থাকে। আমরা বৃথাই তার মানে খোঁজার চেষ্টা করি অর্থহীন ভাবে।

তখনও পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে উদয় হয়নি। তখনও রাগ ভূপালির শেষ মূর্ছনাটা স্তব্ধ হয়ে যায়েনি। তখনও রোয়িং ক্লাবের প্লাষ্টিকের চেয়ারগুলো হয়ত সেই রাগের রেশটা শুনতে পায়নি।

আমি শুনেছিলাম। তুমিও বোধহয় শুনেছিলে। নিঃশব্দে নীরবে। ভাষাহীন অনুভূতির মৌনতার মিছিলে। দিনান্তের শেষ রশ্মির মায়াময় আলোকে।

তাই সেই ছোট্ট জলরাশির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিলেওকেন বলুন তো আপনার সঙ্গে এলামঃ

ওহয়ত আমি মনে মনে আপনার সঙ্গ চেয়েছিলাম। হয়ত বা তাই....সব-ই নিয়তিঃ

নিয়তি হয়ত সন্ধ্যারাগের নতুন সুর আঁকে। সন্ধ্যারাগ কেন? জীবনের সব রাগ তো নিয়তির সুরে-ছন্দে-স্পর্শে-চেতানায় বাঁধা। সেই না-জানা সুরটাকে আমরা কেবল-ই মেলাতে চাই, আমাদের চেনা চিরপরিচিত জীবনের ঝংকারে। হিসেবের হালখাতা খুলে বসে। ব্যবসায়িক অঙ্কের কালিমায়....কিংবা স্বপ্নের র মিথ্যে মোহের আঙিনায়....

ওযা চাওয়া যায়, তা কি পাওয়া যায়ঃ

আবার হিসেব। এই হিসেবের অঙ্ক কষতে কষতে ধুলিস্যাৎ হয়ে যায় আমাদের জীবন। কেনই বা তুমি সেই অঙ্ককে আবার মাটিতে টেনে এনে মিশিয়ে দিতে চাইছিলে আমার এই নিজের করে পাওয়া মুহূর্তটুকুকে?

ওওসব গূঢ় কথা ভেবে কী লাভ? পাওয়াটা তো একটা বোনাস। আজ আমি এই মুহূর্তে কী পেলাম....সেটাই বড় নয় কী? হারানোর জন্য তো পরেই আছে বাকিটা জীবনঃ

রোয়িং ক্লাবের পাশে ক্ষুদ্র জলতরঙ্গের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেওহয়ত ঠিক তাই। সেরকম ভাবে কোনোদিন ভেবে দেখিনি কখনও। পাওয়ার স্বাদ না পেলে, পাওয়ার অর্থটাই বা বুঝব কী করেঃ

আমি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলেছিলামওঅত ভেবে কী হবে? ভালো লাগলে ভালো। না লাগলে চলুন বাড়ি যাইঃ

ওযাব কেন? যাবার জন্য তো আসিনি....বেশ লাগছেঃ একটু থেমে বলেছিলে ওএসেছি ভালো লেগেছে বলেই। কেউ তো দিব্যি দেয়নি আপনাকে চেনারঃ

ওতবুও যখন চিনেছেন, তখন কোথাও তো মন চেয়েছেঃ

ওঅনেকদিন ধরেই। শুধু হদিসটা জানতাম নাঃ তুমি তোমার কচি কলাপাতা শাড়ির আঁচলটা ঠিক করতে করতে বলেছিলে।

ওতাই কীঃ যেন নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

জবাব আসেনি। আধো আঁধারিতে তোমার আবছায়া লেকের দিকে ফেরানো স্যিলুটটা শুধু এক অব্যক্ত রাগ শুনিয়েছিল। তুমি বুঝতে পেরেছিলে কিনা জানিনা। আমি শুনতে পেয়েছিলাম সেই না-বলা রাগ।

সেটাই হয়ত মুহূর্ত। কিংবা স্বপ্ন । কিংবা হয়ত অনেকদিনের ভেতরের পুঞ্জীভুত না-শোনা কোনো এক না-গাঁথা সুর। এই সব ছোটো ছোটো মুহূর্তের সুরের ঝংকারেই তো বোনা হয় জীবনের ছন্দময় কলতান। তারই মধ্যে বেঁচে থাকে আমাদের সুপ্ত নিভৃত প্রাণ। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এক নব ঐকতান।

শাঁখরাইলের কাঁচা মাটির রাস্তা , যা পুকুর পাড়ের পাশে শ্রাবণধারায় প্লাবিত হয়ে যায়, তার থেকে ঢাকুরিয়া লেকের একাংশের পাড়ের রোয়িং ক্লাবের লন-এর দূরত্বটা খুব বেশি না হলেও, এই পথ হাঁটতে বহুবছর লেগে গেছে আমার। কোনো আশা ছিলনা। কোনো স্বপ্ন ছিলনা। শুধু একটাই তাগিদ। বাঁচার তাগিদ। এগিয়ে চলার একটা দৃঢ় অঙ্গীকার।

তুমি হয়ত ভুলে গেছ। তোমায় পরে একদিন বলেছিলাম মনে আছে কী? ওতোমরা শাড়ি আর প্রসাধন নিয়ে যতটা সময় নষ্ট করতে পারো, আমাদের ডাল-ভাতের বন্দোবস্ত করতে তার থেকে অনেক বেশি সময় লেগে যায়ৼ

ওকেন? মুখ দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনিৼ

ঠিক। কথাটা পড়ার বইয়েই মানায়। ঘরে বসে তো বিনা পরিশ্রমে ডাল-ভাতের আমদানি হয়না? হত....যদি না এ্যডাম আর ইভ কোনোদিন ভুল করে জ্ঞানবৃক্ষের ফলটা লোভে পরে গিলে না ফেলত। হয়ত সৃষ্টির ইতিহাসটাই পালটে যেত।

ইতিহাস থাকুক ইতিহাসের পাতায়। আমাকে খুঁজেছিলাম আমার ছোট্ট পৃথিবীর পড়া মুখস্থ করার খাতায়।

কিন্তূ বাবা মারা যাওয়ার পর, সেই পুকুর পাড়ের একতলা বাড়ি আর বাবার গ্র্যচুইটির টাকা ছাড়া, আর আমাদের কোনো সম্বলই তো ছিলনা। যাতে দেনার দায়ে ভেসে যেতে না হয়, তাই আমার খদ্দরের পাঞ্জাবি আর কাঁধের ঝোলানো শান্তিনিকেতানি ব্যগটা নিয়ে বেড়িয়ে পড়েছিলাম সেই ডাল-রুটির খোঁজে।

রোয়িং ক্লাবের লেকের ধারে চায়ে চুমুক দিয়ে সেদিন বলেছিলামওসেদিনের তোমার হাতের গোলাপ ফুল আমার গিলে করা পাঞ্জাবিতে কী খুব মানানসই লেগেছিল? না, আমাকে খুশি করার জন্য বলেছিলেৼ

তোমার ঘন কালো চুলের বেণীটাকে পেছনে ফেলে তুমি বলেছিলেওভালো লেগেছিল....তাই। এখন ঠিক বলতে পারব না কেন। অনেকদিন হয়ে গেছে তো। সেটা আপনার পাঞ্জাবি না আপনাকে, কে জানে? ঠিক জানিনা। মনে হয় আপনাকে। পাঞ্জাবিটা তো একটা উপলক্ষ্য মাত্রৼ

ওএক অপরিচিত যুবককে কেন ভালো লেগেছিলৼ

সন্ধ্যার অন্ধকারে ভালো করে মুখটাও দেখা যায়নি তোমার। তবুও শ্যামবর্ণা সেই মুখের আবছায়া অবয়বের দিকে তাকিয়ে হয়ত একটা উত্তর খুঁজছিলাম সেই সন্ধ্যের আলো-আঁধারিতে। কী বোকাই না ছিলাম আমি!

সেই অন্ধকারে আমার দিকে ফিরে বলেছিলেঃকেন যে কার কাউকে ভালো লাগে, তা কি কেউ জানে? বোকার মতন প্রশ্ন করছেন কেনঃ

সত্যিই বোকার মতন প্রশ্ন করেছিলাম। ভালো লাগার কী কোনো কারণ আছে? না কি কোনো চেনা অঙ্ক? বিজ্ঞানিরা যাই বলুক না কেন? ফিনাইল-ইথাইল-এমাইন পড়ে থাক বাক্সবন্দি হয়ে রিসার্চের পাতায়। আমি তো আর বায়ো-কেমেষ্ট্রির ছাত্র নই!

আমি শুধু বুঝি মন। সেটাই আমার অন্তরের প্রতিধ্বনির নিভৃত অবগুণ্ঠন সর্বক্ষণ। হয়ত অনুভূতি দিয়ে যার শুরু , সময়ের প্রবাহে মিশে যায় চোখের জলের একটা বিশাল সাগরে। সেটাই তো অনুভূতির শেষ ঝালার অনন্ত রাগিনী। যা আমাদের অবচেতনে আজীবন দিয়া জ্বালিয়ে যায় জীবনের পাওয়া হারানোর বাইরের মনের কুঠরিতে লুকিয়ে রাখা একমাত্র সঙ্গিনী। বাঁচার অন্তঃসলিল নিভৃত এক স্ফুলিঙ্গ!

ততক্ষণে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ আঁচল, রোয়িং ক্লাবের ফাঁক দিয়ে দেখা, ঢাকুরিয়া লেকটাকে এক ঝাপসা ধূসর ওড়নায় বিছিয়ে দিয়েছে। ওপাশে কয়েকটা আলো জ্বলছে। বোধহয় লেক ক্লাবের শেষ ল্যাজটুকু। এদিকের রোয়িং ক্লাবের ঘরের থেকে ছিটকে আসা আলোর স্ফুলিঙ্গ একটা মোহময় আবেশে ভরিয়ে দিয়েছে রোয়িং ক্লাবের মাঠটুকু।

সেই মৃদু আলোয় চোখ পড়ল তোমার পায়ের দিকে। চমকে উঠলাম! এতক্ষণ তো লক্ষ্যই করিনি। আলতা মাখা পায়ের ধারটা ওই ফিকে চাঁদনির আভাসে চিকচিক করছে। ঠিক হেঁসেলে হাঁটু গেড়ে বসা মাটির উনুনে মায়ের ঘুঁটে ঠাসার সময় জ্বলজ্বল করা সিঁথির সিঁদুরের মতন।

মুহূর্তের মধ্যে এক অস্পষ্ট ছবি এক ঝলক চোখের সামনে রং খেলিয়ে মিলিয়ে গেল। চোখটা গিয়ে পড়ল তোমার সিঁথিহীন পেছনে টানা লম্বা গাঢ় ঘন চুলের দিকে। তোমার শাঁখের মতন কান, কচি কলাপাতা শাড়ি মোড়া সাদা

ব্লাউসে ঢাকা উন্নত স্তন...আবছায়ার মায়া যেন নিবিড় করে দিয়েছে সেই মুহূর্তটাকে। অপরচিত শিহরণে কেঁপে উঠল বুকটা। আহাঃ....এই মুহূর্ত তো এমন করে আসেনি কখনও আগে।

স্বপ্নের তারাটা তো বহুদূরের....এই মুহূর্তের তুমি তার থেকে বড় কাছের....

যদি বিয়ে হয়ে থাকত, কিংবা হয়েছে কিনা তাও তো জানিনা, সিঁদূরটা কোথায় লাগাতে? না কি, আজকালকার মেয়েরা সিঁদুর পরেনা? সিঁদুরটা কি রক্ষণশীল একটা সাবেকি প্রথার বহিঃপ্রকাশ মাত্র? নাকি সামাজিক নাগপাশের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ?

সিঁদুরের আবিরের আভা যদি নাই বা খেলল মনে, তবে তার উপঢৌকন সাজিয়ে কি কোনো লাভ আছে ক্ষণে-ক্ষণে প্রতিক্ষণে?

উদাসীন ভাবে লেকের দিকে তাকিয়ে বলেছিলামঃভালো লেগেছে, সেটাই বড় কথা। তাকে বিশ্লেষণ করে কী হবেঃ

ঃঠিক বলেছ। অতশত ভেবে কী লাভ বলো তো? এই মুহূর্তটাকে ভাগাভাগি করে নেওয়াই ভালো। নয়কিঃ

একফালি চাঁদ বোধহয় সুদূর আকাশের কোণে উঁকি মারতে শুরু করেছে। কখন পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় ভরিয়ে দেবে জানা নেই। ঈদের চাঁদের আলো-আঁধারিতে তোমার একটু লম্বাটে শ্যামলা মুখটাকে আরেকবার দেখা। তোমার কাজলকালো গভীর চোখের দিকে চেয়ে তোমার অনুভূতিকে অনুভব করার চেষ্টা। তোমার উপস্তিতিটাই যেন বহু না-পাওয়ার মধ্যে ক্ষণিকের পাওয়া।

হারিয়ে যাওয়া হাজারও লোকের ভিড়ে সেই তো আমার মানসীর প্রাণস্পন্দন। ওই ঢাকুরিয়া লেকের জলতরঙ্গের মতন মনের ভেতরে শিহরণ জাগাচ্ছিল এক নতুন অনুভূতি। এই কী ভালোবাসা? আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের প্রত্যাশা? নাকি দূরের ওই চাঁদটার এক ঝলক পরশের মতন হারিয়ে যাওয়া একটা মায়ার খেলা? ইহলোকে দ্যুলোকের কোনো এক না-দেখা অচেনা ছায়া?

সব-ই তো হারিয়ে যায়। দিন-ক্ষণ-রাত্রি। জীবন-মৃত্যু স্রোতস্বিনী নদীর পাশে আমরা শুধু নীরব এই বয়ে যাওয়া সময়ের স্রোতে এক অসহায় যাত্রী। নয় এক মুহূর্ত নিজের মতন করেই দেখলাম তোমাকে....

সেই মুহূর্তে পাওয়া-হারানোর বাইরে বেরিয়ে একা বসে দেখেছিলাম তোমায়। তোমার কাজলকালো চোখের গভীরে কোথাও কোনো নির্জন নিভৃতে একা একা। তুমি হয়ত অনুভব করেছিলে আমার নীরব চোখের চাওনি।

বুঝেও না বোঝার ভাণ করে, আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেওসিনেমাটা কেমন লাগলঽ

ওওই আর কি! সময় কাটানো। আজকালকার সিনেমা তো। মনে তেমন দাগ কাটেনিঽ

ওতাহলে দেখতে গেছিলে কেনঽ

ওকিছু করার ছিলনা বলে। তাছাড়া এত সস্তায় ফ্রী এসি পাব কোত্থকে ঽ

একটু থমকে বলেছিলেওলেকের পাড়ে বসেও তো হাওয়া খাওয়া যায়? সেটা কী আর্টিফিশিয়াল এসির থেকে মন্দঽ

ওভর দুপুরে? ছায়া খুঁজে নিতে হবে তো সেই অন্দরমহলে। ক্লাবের ভেতরে হাঁ করে বসে কি বেয়ারার মুখ দেখব? তার থেকে প্রিয়ার এসিটায় রং-বেরং-এর ভেলকি দেখা অনেকগুণ ভালো। তাছাড়া না এলে তো, তোমার সঙ্গে দেখা হতনাঽ

যেন সারা দুপুরের বিস্বাদ হারিয়ে গেছিল সেই মুহূর্তে অনুভূতির আবেগে। সেই ক্ষণে মালকোষ যেন সন্ধ্যাতারার মধ্যে আজানের সুর হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছিল।

ওএ মা! তোমার নামটাই তো জানা হয়নিঽ

ওকী হবে জেনে? তুমি যে নামে আমায় ডাকতে চাও, তাই দিয়ে দাও না কেন। আমি তো সেই একই মানুষঽ একটু থেমে তোমার চোখে চোখ রেখে বলেছিলাম

ওআজ থেকে আমি তোমার নাম দিলাম কস্তূরী নাম জানতে চাইনা। পরিচয় জানতে চাইনা। হিসাব মেলাতেও চাইনাই

ওকেনই

ওকী হবে জেনে? আমি নয় তোমাকে দেখলাম তোমার মতন করে। কস্তূরী .এইটাই তোমার প্রথম ও শেষ পরিচয়ই

হয়ত ঘরে ফিরে যাওয়া বলাকারা একবার নিজেদের মনে মুচকি হেসেছিল। একটা যুবক। একটা যুবতী। দুই পরিচয়হীন আত্মা যেন কাছে আসতে চাইছে মুক্ত বিহঙ্গের মতন....নামহীন, গোত্রহীন, সামাজিক পরিচয় বিহীন এক নিজস্ব ছন্দে। দুটি হৃদয়ের সপ্তসুরে গাঁথা নিজের অনুভূতির আনন্দে।

বিধূরতার ধারাস্নানে আনন্দের আবাহন।

ওবেশ। আজ থেকে আমি কস্তূরীই কচি কলাপাতা রং-এর টাঙাইল শাড়ির ওপর পড়ে থাকা সবুজ পুঁথির মালাটা নেড়ে আবার বলেছিলেওআজ থেকে আমি কস্তূরী । তোমাকে তাহলে কী বলে ডাকবই

ওযে নাম তুমি দিতে চাও আমাকেই আমার থেকে ছোটো একটা মেয়েকে আপনি বলতে মন সায় দেয়নি। ভালোবাসাতেওআপনিই হয়না - শুধুইওতুমিই।

ওকৌস্তভই

মুহূর্তের মধ্যেওআমিই টাওতুমিই তে রূপান্তরিত হল এক অজানা ছন্দে। আমরা জড়িয়ে পড়লাম এক না-জানা না-চেনা অলিখিত বন্ধনে। হয়ত নিভৃত অন্তর আবার বহুদিনের সুপ্ত স্বপ্নের ভাষা খুঁজে পেল, আমাদের যুগ্ম অনুভূতির নামকরণের অন্নপ্রশানে ....

কেউ প্রশ্ন করিনি কেন দিলাম নতুন একটা নাম। কেউ জানতে চাইনি কী তার পরিনাম। হয়ত দুজনেই একে অন্যের কাছে এক নতুন পরিচয় নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলাম আমাদের আলো-আঁধারির পৃথীবীতে। ছায়া নেই, তবু কায়া আছে।

গোত্র নেই, তবু সূত্র আছে। আকার নেই, তবু বর্ণ আছে। আশা নেই, তবু ভাষা আছে। সমাজ নেই, তবু আমরা তো আছি!

“কস্তূরী তুমি কোথা থেকে এসেছ জানিনা। কোথায় চলেছ তাও জানিনা....জানতেও চাইনা”

“জানার কী কোনো প্রয়োজন আছে? ওই যে পাখিগুলো আকাশে উড়ে চলে যাচ্ছে, ওরা তো জানে ওরা কোথায় যাবে। শেষ পর্যন্ত পৌঁছবে নিজেদের নীড়ে। তারপর থেমে যাবে। আবার সকালে উঠে সেই এক-ই খেলা খেলবে এক-ই চ ক্রে । এই খেলার বাইরেও তো একটা পৃথিবী আছে। এক বিশাল বিপুল পৃথিবী। মাটির বাঁধা গন্ডির খেলা ছেড়ে চলোনা আমরা ভেসে বেড়াই ওই নীল আকাশের কোনে। যতদিন না ইহকাল থামিয়ে দায়ে আমাদের দুজনকে”

“থামতে তো আমিও চাইনা। কিন্তূ ওই নীল তেপান্তরে ভাসার ভাষাটা কে বলে দেবে?”

“জেনেই বা কী হবে? যা জানা, তা তো একটা সীমার মধ্যে বাঁধা পড়ে আছে”

“আমরা নয় ভাসলাম সেই সীমাহীন অসীম সাগরে”

কস্মিনকালেও জানতাম না আমার মধ্যে এত কবিতা লুকিয়ে আছে। হয়ত সবার মধ্যেই থাকে। শুধু সেই অনুভূতির ছোঁয়ার স্পর্শের অপেক্ষায় তা আপন শব্দে ফুটে ওঠে আপন ছন্দে। সেই ছোঁয়া পেলে জীবনটা হয়ে ওঠে কবিতা। সুর ভেসে বেড়ায় মনে। এই মন আর সুরের যুগলবন্দিই তো জীবনের আসল মন্ত্র !

মাত্র কিছুক্ষণের আলাপ। কিন্তূ মনে হয়েছিল জন্ম-জন্মান্তরের কোনো এক অজ্ঞাত ছন্দ যেন নিজের সুপ্ত চেতনায় বাসা বেঁধে ছিল। শুধু অভাব ছিল পরশপাথরের। তার ছোঁয়ায় আবার তা নতুন ছন্দে জেগে উঠেছিল। অনুভূতির একান্ত গভীরে যেন আলতো করে তার কোমল হাতের ছোঁয়া বুলিয়ে দিয়েছে। নাম-না-জানা একটা রোমাঞ্চকর স্পর্শ!

সেই প্রথম!

কাছ থেকে দেখা। মনের সুরের ক্ষীণ আলাপটুকু বুক ভরে শোনা।

যাবার আগে বলেছিলে, যোগাযোগ থাকবে কী করে?

একটা দশ টাকার নোটে কোনো নাম না লিখে শুধু মোবাইল নম্বরটা এগিয়ে বলেছিলাম, এই দিয়ে।

তুমিও তোমার চামড়ার পার্স থেকে একটা বাসের টিকিটে মোবাইল নম্বরটা লিখে আমার হাতে তুলে দিতে দিতে বলেছিলে, তোমার কস্তূরী।

শাঁখরাইলের এক সাধারণ ছেলের কাছে স্বর্গটা যেন সেই মুহূর্তে মাটিতে নেমে এল। সংসার আর রোজগারের তাগিদের বাইরে যেন, আবার এক নতুন সুর খুঁজে পেল। জীবনের সুর।

না কি বেঁচে থাকার নতুন ঐকতান?

সেদিন সারাদিন ধরে টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। কী যে ভূত চাপল তোমার। বললে মেট্রোর সামনে দেখা করবে।

বৃষ্টি তখনও থামেনি। প্যাঁচপ্যাঁচে ক্লান্তির মধ্যে নেই কোনো বিরাম। নেই সারাদিনের একঘেয়েমির অবসান....অবিরাম বৃষ্টির ছটায়। জল জমেছে কলকাতার আনাচে-কানাচে। ছোটোবেলা থেকে যেমন দেখে আসছি। পরিবর্তনহীন ভাবে। কলকাতায় বৃষ্টি মানেই হাঁটু জল। কলকাতায় বৃষ্টি মানেই ট্র্যাফিক জ্যাম। কেন যে একটু বৃষ্টি হলেই কলকাতায় ট্র্যাফিক জ্যাম শুরু হয়ে যায়, কে জানে?

বাস থেকে নেমে চটিটা ঠিক করতে করতে বললে, ফুচকা খাব।

এই রে সেরেছে! এই টিপটিপে বৃষ্টির মধ্যে ফুচকাওয়ালা কি এখনও ফুচকা সাজিয়ে বসে আছে? এসপ্ল্যানেডের বাস ষ্ট্যন্ডের কাছে হয়ত বা থাকলেও থাকতেও পারে, কিন্তূ ভিক্টোরিয়ার গেটের পাশে যে থাকবে না সেটা সুনিশ্চিত।

কুঁড়েমির জন্য একটু হেসে বললামঙঅনাদি কেবিনে মোগলাই পরোটা খেলে হয়নাঃ যদিও সেই মুহূর্তে আমারও ফুচকা খেতে ইচ্ছে করছিল।

ঙনা। ফুচকা খেতে ইচ্ছে করছেঃ

কথা না বাড়িয়ে হাঁটতে লাগলাম এসপ্ল্যনেডের বাস গুমটির দিকে। দূরপাল্লার বাসগুলো ছাড়ার আগে হয়ত বাঙালির রসনাতৃপ্ত করার স্পৃহা জাগলেও জাগতেও পারে। সেই আশায় দু-একজন ফুচকাওয়ালা দিনের লাভের টুকরো গোণার আশায় হয়ত-বা বসেও থাকতে পারে।

দূরে আকাশবানির পাশে আকাশটার দিকে তাকালাম। জমাট বাঁধা মেঘ ছড়িয়ে আছে আনাচে-কানাচে ইডেন গার্ডেন্সের ওপর। তার ফাঁক থেকে পড়ন্ত বিকেলের সূর্য্য লুকোচুরি খেলে যাচ্ছে মেঘের সঙ্গে। সেই লুকোচুরির মধ্যে সুপ্ত একটা অনুভূতির আলো-অন্ধকারের মাখামাখি যেন মনের মধ্যে আবির ছড়িয়ে দিচ্ছে।

তুমিও কী তাকিয়েছিলে ওই পড়ন্ত বিকেলের ধূসরে?

না-জানাকে জানা। না-দেখাকে দেখা। না-পাওয়াকে একটু মনের মতন করে পাওয়া। এ যেন সেই আলো-আঁধারির লুকোচুরিতে মাখামাখি করা এক স্বপ্নের দেখা, না-পাওয়া খেলা!

হাটতে হাটতে লক্ষ্য করলাম তোমার পিঠের ব্লাউজটা ভিজে গেছে বৃষ্টির জলে। তোমার সে দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। তুমি তাকিয়ে আছ ওই বৃষ্টি-ভেজা দূরের ঘাসের দিকে। যেখানে বৃষ্টির কণা আলতো করে নরম ছোঁয়া বুলিয়ে দিচ্ছে গড়ের মাঠের সবুজের বেলাভূমিতে। সেখানেই যেন জীবনের ছন্দ। সেখানেই যেন পাওয়ার আনন্দ। সেখানেই যেন লুটিয়ে আছে মনের নিভৃত স্বপ্নের আতর ভেজা সুগন্ধি জীবনের লাবণ্য। হয়ত-বা তোমার না-পাওয়া তুমি। হয়ত আমার হাতে হাত রেখে তোমার আমি।

আহা রে! ঠান্ডা লাগবে না তো আবার?

ওকি অদ্ভূত, তাই নাঃ হাঁটতে হাঁটতে আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলেছিলে।

ওকীঃ

ওতোমার আর আমার মোবাইলের রিং টোন দুটোই একঃ

সত্যি তো। লক্ষ্য করিনি।

তুমি লক্ষ্য করেছিলে!

হয়ত নিজের অজান্তেই সে ভাবে যুগলবন্দি সুর ভেজেছিল আমাদের দুজনের না-পাওয়া পৃথিবীর ধূসর বালুচরে।

হয়ত সেই মুহূর্তে একটা সুপ্ত চেতনা কোনো আবছায়া ছবি খুঁজছিলো....

একটা ছবি!

একটা না-পাওয়া জীবনের নতুন স্ফুলিঙ্গ!!

তোমাকে

কৌস্তভ



দ্বিতীয় চিঠি

কৌস্তভ

সত্যি তুমি আমার জীবনে একটা স্ফুলিঙ্গ!

রোজকার একঘেঁয়ে জীবনে না-পাওয়ার এক নতুন অঙ্ক। সব কিছুই তো আছে আমার....বাড়ি....স্বামী.... কন্যা। বেঁচে থাকার মতন কিছু অর্থটুকুও। তার বাইরেও তো আছে মনের মতন একটা নিঃশব্দ বাক্যহীন আত্মচেতনার যন্ত্র । তবুও সেই সব কিছু পেয়েও কোথায় যেন একটা অনন্ত বিস্তৃত শূন্যতা। তাই মহাশূন্যের তেপান্তরের অনন্ত গভীরে না হারিয়ে, জাগতিক বালুচরে বহুদিন ধরে হয়ত মন চাইছিল এই অসম্পূর্ণ আমির একটা নিঃশব্দ উন্মোচন। হয়ত-বা নিজের মনের আয়নায় আরেকবার নিজেকে দেখা নতুন কোনো এক আভরণ। অতৃপ্তির সমুদ্রে ডুবে থাকার মধ্যেও, মনের স্পর্শের এক আশ্চর্য না-ছোঁয়া মলম!

মুখঢাকা গৃহবধূটা যেন নিজের অপূর্ণতার বালুচরে লক্ষ্মণরেখার বলয় আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দি হয়ে এক টুকরো আকাশ খুঁজছিল। হয়ত দেবীর আরাধনার নৈবেদ্য সাজাবার আগে এক টুকরো বেশ্যালয়ের মাটি। বলয়ের বাইরে মনের এক নতুন স্ফুলিঙ্গ। আমার না-বলা কথার, নতুন কোনো এক না-জানা সুরের অপরিচিত রেশ। সেই না-শোনা পাখির ডাক। যা বহুদিন ধরে খুঁজেছিলাম জীবনের গহ্বরে। যাকে ছুঁতে গিয়েও ছুঁতে পাইনি গভীর হৃদয়ের অন্তরে । তবুও

সেই না-শোনা কলরব বারবার স্বপ্নের আকারে ভেসে আসছিল আমার অবচেতন গভীরে। সেই পাওয়ার স্বপ্নের গলি ধরে এগিয়ে যাওয়া....মনের স্বপ্নের রাজপথকে আবার নতুন করে খুঁজে নেওয়া। সেটাই তো আমার বেঁচে থাকার দোসর। সেটাই তো আমার একাকী নিভৃত অন্তর ।

সেই যে বিয়েবাড়িতে যেদিন তোমায় প্রথম দেখি, মন বলেছিল তুমি একা অন্য। অন্তরের কেমেষ্ট্রির মানেটা বুঝিনা। কারণ আমি ইকনমিক্সের ছাত্রী। তবে তোমার জিওগ্রাফিটা দেখে মনে হয়েছিল তুমি আমার অন্তরের গোলাপের না-দেখা, না-জানা কোনো এক অচেনা কেমেষ্ট্রি। তাই তোমার বুকে গোলাপ আঁটতে গিয়ে নির্বাক সর্মপণ করেছিলাম তোমার কাছে, আমার অন্তরের অনুভূতির দৃষ্টি। আমার না-পাওয়া অন্তরের এক নিভৃত আত্মার মুহূর্তের পরিতুষ্টি। বলতে গিয়েও কিছু বলতে পারিনি আমি।

তাইতো কলম তুলে নিজের কথা লিখতে বসেছি তোমাকে....

সৈকত তো বেশিভাগ সময়ই বাড়ির বাইরেই থাকে। দূরে-দুরান্তে নিজের কাজের সূত্রে ছুটে বেড়ায় এখানে-ওখানে। একা একা পিঙ্কুকে নিয়ে কেমন যেন ছন্দহীন একটা আবর্তে পড়ে ছিলাম। প্রাচীরহীন এক অদৃশ্য দেওয়াল ঘিরে রেখেছিল আমার প্রতিটা ক্ষণ। মুক্তির মধ্যেই বদ্ধতার গুমোঠ ক্লষ্ট্রোফোবিয়া গ্রাস করেছিল আমার মন।

নাকতলার বাড়ির বসার ঘরে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবতাম....এই কী বিবাহিত জীবন? মাত্র এইটুকু? এর বেশি চাওয়াটা কি সমাজের চোখে বেসুরা রাগ হয়ে বাজবে? আমার মনের আকাশ কি চিরদিন চিরকাল ধরে অসম্পূর্ণতার সুরে ভাসবে? বারবার খুঁজতাম আমার না-পাওয়া হারিয়ে যাওয়া, না-দেখা সেই আকাশটাকে। আমার একান্ত নিভৃত পিপাসী মন খুঁজত সেই না-পাওয়া অলীক পৃথিবীর রূপটাকে। বর্ণহীন ধোঁয়াশায় ভরা স্বপ্নটাকে যদি নিয়ে আসতে পারি বাস্তবে নোঙরহীন তরীটাকে যদি ভেড়াতে পারি কোনো এক অজানা পাড়ে....

ধীমান মাঝে-মধ্যে আস্ত । আমার থেকে বয়সে কতো ছোটো। অনর্গল বক বক করে যেত। সেটুকুই যেন আমার একাকী নিভৃতে একটু আলোর ঝিলিক। অথবা সময় কাটানোর বাইরে ঘরে বসে দেখা আরেক মিরিক।

ওআচ্ছা দিদি বলো তো বিয়ে করতে গেলে কি চাকরি-ই করতে হবেঃ

ওকে বললঃ

ওসুধীতি

ওসুধীতি কি তোমায় বিয়ে করবে, না তোমার চাকরিকেঃ

ওভালো যখন বাসে, তো আমাকেই করবে বলে মনে হয়। চাকরিকে আবার বিয়ে করা যায় নাকিঃ

ওআমি তো কোনো চাকরি করিনি কোনোদিন। বলবই বা কী করেঃ

ওজানো দিদি....একটা ব্যবসা করার ইচ্ছে আছে। এই যে তোমাদের সিকিউরিটি এলার্ম সিস্টেম, তার ব্যবসা

ওএ দেশে চলবেঃ

ওকেন চলবে না? এই যে বড় বড় মাল্টিন্যাশনাল কম্পানিগুলো অফিস খুলছে, মাসে মাসে লাখ-লাখ টাকা সিকিউরিটির ওপর খরচা করছে। যদি সব কিছু ইলেকট্রনিক্যলি করে দেওয়া যায়, অনেক সস্তা পড়বে। ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে তো সেটাই এখন বড় কস্ট সেভিং ভেনচার

আমি তখন ভাবছিলাম এই আকাশ ছোঁয়া ইনফ্লেশনের বাজারে সংসার চালানোর খরচা কী করে কমানো যায়? আর উনি ভাবছেন কোটি-কোটি টাকার মাল্টিন্যাশনালদের খরচ কমানোর কথা। তারাই হয়ত এই ইনফ্লেশনের মূলে। হয়ত আমি বাস্তবের মধ্যে পৃথিবীটাকে দেখতে চাইছিলাম। ধীমান দেখতে চাইছিল ওর আগামী দিনের বুনিয়াদ স্বপ্নের নতুন আলোকে।

জাগতিক পাওয়ার স্বপ্নটা তো একদিন অজানা দিগন্তে হারিয়ে যায়। কিন্তূ মনের চাওয়ার স্বপ্নটা দিগন্ত ছাড়িয়ে উড়তে থাকে....ওই ডানা মেলা মাইগ্রেটারি বার্ডসদের মতন....এক দেশ থেকে অন্য দেশে....দূর থেকে দুরান্তে ..ওঅনন্ত অসংখ্য লোকে লোকান্তরেঃ

এই রে!

ওই দাড়িওয়ালা বুড়োটা যে আমার পিছু ছাড়েনা। তোমাকে লিখতে বসলেও নিজের অজান্তে উনি যেন ভাষাটুকু বলে দিয়ে জান। উনি আলোকিত করে রেখেছেন আমাদের জীবনের প্রতিটা কণা। কিন্তূ বেঁধে দিয়েছেন আমাদের ভাষা থেকে চিন্তার সর্বস্তরের উঠতি ফণা। না....না...না....না....দেবনা। কিছুতেই দেবনা....আমার অনুভূতিকে ওই বুড়োটাকে গ্রাস করতে। কোনো মতেই নয়। এটা আমার একান্ত নিজের অন্তরের পৃথিবী। এখানে ওনার কোনো প্রবেশাধিকার নেই।

এখানে আমি একা অন্য, কোনো এক সাধারণ নারী।

ধীমান তো শুধু অবসর মাত্র। একটা ছোটোভাই এর সঙ্গে কিছু সময় কাটানোর একটা ফলহীন যন্ত্র । কিন্তূ তাই দিয়ে কী ভরে আমার না-পাওয়া হৃদয় সর্বক্ষণ? কিছু এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ানো। স্রেফ টাইম পাস্ এর জন্য কিছু ক্ষণস্থায়ী মুহূর্ত। তার সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ আমার চিত্ত।

সিনেমা হল থেকে গড়ের মাঠ। মাঝে মাঝে সুধীতি ও পিঙ্কুও ভিড়ে যেত আমাদের সঙ্গে। ধীমান আমাদের ভালো ভালো রেষ্টুরেন্টে খাওয়াত। সিনেমা দেখাত।

তবুও....কোথায় যেন একটা না-পাওয়ার শূন্যতা....

সৈকতের অনুপস্থিতিতে সময়টা অন্তত দিব্যি কেটে যেত।

একদিন হেসে সুধীতিকে বলেছিলামওঘোরা তো অনেক হল। বিয়েটা করছ কবেঃ

ওবিয়ে করেই বা কী হবে? ও তো ব্যাঙ্গালুরুতে যাওয়ার প্ল্যন করছে। বিয়ে করে আমি থাকব এখানে, আর ও যাবে ব্যাঙ্গালুরুতে। সে বিয়ে করেই বা কী লাভঃ

ওকেন তুমিও তো যেতে পারো ওর সঙ্গেঃ

ওআগে যাক। ব্যবসা জমাক। তারপর তো। ভেবে দেখা যাবে তখনঃ

থোড় বড়ি খাড়া। খাড়া বড়ি থোড়। বিয়েটা যেন সিঁথির সিঁদুরের মতন একটা লাইসেন্স। লাইসেন্স পরিয়ে দিলেই যেন মনের বন্ধন তৈরি হয়ে যায়!

যেমন রজনীগন্ধার মালা বদল করে এক রাতে সৈকত আমায় বন্ধনে বেঁধে ফেলেছে। বন্ধন তো বটেই! মানসিক না হলেও সামাজিক শৃঙ্খলে বাঁধা একটা উপঢৌকন। কিন্তূ তাতে কি ভরে অতৃপ্ত মন? আমার অর্থহীন নিঃসঙ্গ দুপুরের একাকী দগ্ধ নিরালায়....

বাকিটা সময়, একাকী নিঃসঙ্গ মনের অবগুণ্ঠনে একটা অব্যক্ত কান্না আছড়ে পড়ত। বাঁধভাঙা অশ্রুর নীরব প্লাবনে। সেই স্থিতিশীল জলের কোনো গতি নেই.... কোনো দিক নেই....কোনো বর্তমান নেই....কোনো ভবিষ্যৎ নেই!

পরমা আর ওদের সাঙ্গ-পাঙ্গরা মাঝে মধ্যেই আড্ডা মারতে আ স্ত । যেন যীশুখ্রীষ্টের লাষ্ট সাপারের মতন তেরোজন গৃহিনীদের অর্থহীন প্রলাপের সমাগম। যার যত টাকা, তার তত গরম। অর্থহীন বাক্যালাপের চট-চটানির ফুলঝুরি। সাব-থ্যলামিক সব আলাপ-বিলাপ-সংলাপ-প্রলাপ....ওই আর কি!

মাঝে মাঝে পরমার সঙ্গে কীর্তন শুনতে যাওয়া কোনো এক আসরে। বয়স আমার যাই হোক না কেন, পরমার সঙ্গে পিঙ্কুকে নিয়ে সময়টা কাটানোর একটা তো সদুপায়। পরমা আমার থেকে বয়সে অনেক বড়। অযথা বকবকানির চেয়ে গান শোনা তার থেকে অনেক ভালো। ও ও তো লাষ্ট সাপারের তেরজনের একজন। সেখানে কী করে থাকবে এর থেকে বেশি আলো?

ও বলতওআমার জীবনটাও তাই রে....ছেলেটা মুম্বাইতে চাকরি করে। স্বামীর তো চাকরি নেই সেই কবে থেকে। ঘরে বসে সারাদিন মাল খেয়ে যাচ্ছে। এই যে

গান করি, এটুকুতেই আমার মুক্তিহ্

ওদেয় কীঃ আমি সেরকম গান জানিনা বলেই হয়ত এই অবান্তর প্রশ্ন ।

ওজানিনা। তবুও তো কিছুক্ষণের জন্য ভুলে থাকা যায় নিজেকেহ্

যে বয়সই হোক না কেন, সবাই যেন নিজের নাম-না-জানা ছোটো ছোটো আবর্তের পৃথীবীতে একাকী বাস করছে, বিরাট এই ভূমন্ডলের মধ্যে। ওই অলিখিত আবর্তটা মানসিক বলয়কে সামাজিক বলয়ের ঘেরাটোপে আবদ্ধ করে রেখেছে।

মুক্তি নেই! পরিত্রাণ নেই!

এর মধ্যেই বাঁচা....এর মধ্যেই জীবনের সুখ-দুঃখ্য-আনন্দ-বেদনা খুঁজে নেওয়া.....এর মধ্যেই মরা। এই বলয়ের মধ্যেই যেন জীবনের সবকিছু চাওয়া-পাওয়া লুকিয়ে আছে। জীবনের পরিব্যাপ্তিটা যেন ভুমন্ডলের ছোটো ছোটো আবর্তের পৃথীবীতে সংকীর্ণ লক্ষ্মণরেখাগুলোর পরিব্যাপ্তির মধ্যে এক্কা-দোক্কা খেলছে।

ওতোর রাজার খবর কীঃ

ওআছে রানীর সঙ্গে। মাঝে মধ্যে ঘুরতেও যাই। সিনেমাও দেখি। ওর ও তো বউ বাচ্চা আছেহ্

ওডাক্তরি করছেঃ

ওহ্যাঁ। সে ব্যপারে ঠিক আছে। তা না হলে সংসার চলবে কী করে? তবে ওই আর কি। এর বেশি আর কি চাইতে পারি ওর কাছ থেকেঃ

ওশুতে ইচ্ছে হয়নাঃ

ওনা রে। কোথায় যেন বিবেকে লাগেহ্

পরমা আমার থেকে বয়েসে কত বড়। ওর হয়ত, সে সব সাধ আহ্লাদও চলে গেছে। কিংবা তাকে সামাজিক অবগুণ্ঠনের হাঁড়িকাঠে বলি দিয়েছে।

সংস্কার!

বিবাহিত জীবনের সঙ্গে জড়ানো একটা সংস্কার। সুযোগটা তো পরের ব্যাপার। মনটাই যেন একটা ছোটোবেলা থেকে শেখানো ধারাবাহিক রাগে বাঁধা পড়ে গেছে। সেই সামাজিক গন্ডির লক্ষ্মণরেখায় বড় হতে হতে, মন বলে আর কিছু নেই। আছে শুধু একটা পার্থিব প্রাণহীন অবয়ব। যার আচ্ছাদনের স্থিতিশীলতায় নিজেকে সংরক্ষীত রেখে, জীবনটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া একটা চেনা সুরের সামাজিক ঐকতানে। সেই তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার নয়! বিচ্ছিন্নতা মানেই পাপ। বিচ্ছিন্নতা মানেই সামাজিক বিচ্যুতি। বিচ্ছিন্নতা মানেই চারিত্রিক অবনতি। সে সুর যেন সময়, কাল, যুগের অঙ্কে বাধা পড়ে গেছে এক প্রবহমান বলিরেখার মধ্যে। শান্তি খুঁজতে চাও? সেখানেই। তৃপ্তি খুঁজতে চাও? সেও সেই পরিমন্ডলের মধ্যেই সীমিত। সুখ দুঃখের লাল-নীল খাতা নিয়ে বসতে চাও? সেও তো সেখানেই।

এর নাম কি সংসার? না সংস্কার?

দিয়া আবার অন্য। অন্যান্যদের থেকে অর্থে অনেক বেশি বলীয়ান। কর্তার মাদকের ব্যবসার আমদানিতে অর্থের ঔদ্ধত্য আকাশচুম্বি। মাটিতে যেন পা-রাখা ভার। সেখানেও আমার শিক্ষা-সংস্কার- রুচি সব কিছুই অর্থহীন, ওই অর্থের দাপটের নাগপাশে। জাগতিক মানসিক সার্থকতার এক জলন্ত রূপ। সেখানেও আমি নেই....আছে দিনগত অর্থহীন প্রলাপ। নিঃশব্দে বসে হজম করা, আমার নিজের অন্তরের পুরোনো এটিকেটস্-এর আরেকটা সামাজিক রূপ কিছু প্রচলিত সংলাপ। প্রবহমান জীবনের এক ছন্দহীন স্বরূপ। যতই হই না তার থেকে বিরূপ! তার মধ্যেই গড়তে হবে আমার জীবনের গন্ডিবাঁধা স্বর্গ। সোনার পাথরবাটিটা যেন জীবনের নিশ্চিন্ত রূপ। সেখানে আমার আমি অনেক মূল্যহীন গৌণ। মুখ্য আমার পারিবারিক অস্তিত্বের মধ্যে ধরে রাখা একটা চেনা মুখোশ।

ওঘরের পর্দাটা বড্ড সেকেলে লাগছিল। পালটে ফেল্লাম্

মুচকি হেসে বলতাম, ‘বাড়িটাই পালটে ফেলতে পারতিস’

‘কর্তা বলেছিল। কিন্তু জানিস পুরোনো বাড়ি ছেড়ে যেতে মন চায়না। অবশ্য ও দুটো ফ্ল্যাট কিনে দিয়েছে। থাক সে দুটো পড়ে। মেয়ে বরো হয়ে বিয়ে করলে, জামাই নিয়ে থাকবে ওখানে’

কতো চিন্তা তাই না? পিঙ্কুর মতন ছোট্ট মেয়ে কবে বরো হবে....বরো হলে বিয়ে হবে....বিয়ে হলে সংসার হবে....সংসার হলে ফ্ল্যাটের দরকার হবে....জাগতিক আশার ব্যাপ্তিটা কত দূর যে যেতে পারে! এর কী কোনো শেষ আছে?

ভাবতে গিয়ে মনে মনে হাসি পেলেও সেটাকে চেপে বলতাম, ‘দাম বাড়বে’

যার পৃথিবী, সন্ধ্যেবেলা রক্সি বারের অর্ধ উলঙ্গ নৃত্যের শেষে দিনের হিসাব গুনে বাড়ি ফেরা, তার পৃথিবীটা তো ওর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। তাকে এর থেকে বেশি বোঝাব কী করে?

তবুও....

এদের সঙ্গেই বাঁচতে হবে। এদের সঙ্গেই মিশতে হবে। নেমতন্ন করে খাওয়াতে হবে। ওরাও খাওয়াবে। এর নাম বুঝি চক্র ব্যূহের মধ্যে ঘুরপাক খাওয়া সংসার? এর নাম বুঝি বেঁচে থাকা? এর নাম বুঝি জীবনকে ভোগ করার মূলমন্ত্র ? ক্রমশ বুঝতে পারছিলাম, জীবনের সংজ্ঞাটা আমি যেন কেমন গুলিয়ে ফেলছি। আমার অবচেতন হারিয়ে যাচ্ছে সংসারের চেতনার গোলকধাঁধায়।

যারা শূন্যতা-পূর্ণতার পার্থক্য বুঝল না, তাদের কাছে মনকে খুলে ধরবই বা কী করে?

ওই....

কিছু তো একটা করতে হবে। তাই করা। এই আর কী!

পিঙ্কু তখন গভীর ঘুমে মগ্ন । সৈকত বাড়ি নেই। কাজের জন্য গেছে কলকাতার বাইরে। আমার যে আর ঘুম আসেনা। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে চেয়ে

থাকতাম চাঁদের দিকে। হয়ত ওই চাঁদের স্নিগ্ধ তার স্পর্শের মধ্যেই যা কিছু শান্তি। ওই রোশনি আমার না-পাওয়া ছন্দের, একাকী রাতের যা কিছু পরিতৃপ্তি। ধ্রুবতারা তো কখনও খুঁজিনি কোনোদিন। শুধু জানি ওটা বহুদূরের একটা নির্দিষ্ট নক্ষত্র। যাদের জীবনে জাগতিক চাওয়া আছে, তারাই তো ধ্রুবতারা খোঁজে। আমার জাগতিক চাহিদার তো কোনো অভাব রাখেনি সৈকত। তাই শুধু একটু চাঁদের মৃদু আলোর মলমের মতন স্পর্শটাকে অনুভব করতে চেয়েছিলাম। কাছ থেকে....একাকী!

আচ্ছা এমনি চাঁদের মিঠে আলোটাকে কী একা একা অনুভব করা যায়না? সব সময় কী চাঁদ দেখতে গেলে প্রেম করতে হয়? প্রকৃতি আমার অনন্ত রাত্রির সাথী। প্রকৃতি আমার না-কেনা ব্যথার মলম নীরবে একাকী। প্রকৃতি আমার না-ছোঁয়া প্রেমের বলিরেখা। তার পেছনে ছুটে খুঁজছিলাম আমার না-পাওয়া মরীচিকা।

আমার তো সম্বন্ধ করেই বিয়ে হয়েছিল। খবরের কাগজ দেখে। আর পাঁচটা বাঙালি মেয়ের মতন। চাঁদকে বোঝবার রেশটুকু প্রেমিকের হাত ধরে অনুভব করার অবকাশ-ই হয়নি। প্রেমিককে চাঁদের আলোয় দেখা সে তো অনেক দূরের কথা!

যেদিন আসামে প্রথম সৈকতের বাড়িতে পৌছলাম....সৈকত তখন অন্য কাজ নিয়ে ব্যস্ত । সদ্য বিবাহিত স্ত্রী যে সেদিন প্রথম এসেছে, তার জন্যও তার সময়টুকুও নেই। আমি একা ঘরে সৈকতের জন্য সারাদিন অপেক্ষা করেছিলাম। কিন্তূ সৈকত এলনা। কাজের অছিলা না সত্যি কাজ ছিল, কে জানে? বেরিয়ে গেল আমাকে একা রেখে।

তবুও এর নাম বিয়ে! সিঁদুরের লাল বহ্নি শিখা তখন প্রথম আলোর প্রখর কিরণের মতন সিঁথিতে জ্বলজ্বল করলেও অভিমান ছিলনা। শুধু বিয়ের রাতের সিঁদুরের দাগ পরিয়ে যেন আমাকে সতী করে দিয়েছে। সতীত্বের সংজ্ঞাটা যেন

ওই সিঁদুরের লাল দাগটাই ঠিক করে দেয় সামাজিক সাজে। তার মধ্যেই খুঁজে নিতে হয় জীবনের গতানুগতিক সুখ-দুঃখের উপাখ্যান। সেখানেই পড়ে থাকে বেঁচে থাকার কলতান।

হ্যাঁ....তখনও আমি সিঁথিতে সিঁদুর পরতাম। নতুন বউকে সিঁদুর না পরলে কী মানায়? সিঁদুরের সেই বন্ধন যেন সামাজিক একটা অবগুণ্ঠনের লক্ষণ। একটা আচ্ছাদনের বাতাবরণ। সবাই যেন সেখানে বাঁধা পড়ে আছে জীবনের নামে।

আমিও....

সেখানে গোলাপ নেই, তবু জীবন আছে। সেখানে বর্ণ নেই, তবু তাশের দেশের একটা অলিখিত নিয়ম আছে। সেখানে মানুষের প্রাণ নেই, তবু টেনে নিয়ে যাওয়ার অভিপ্রায় আছে। সেখানে আমি নেই, তবুও আমার খোলসে ঢাকা দেহটা আছে।

সেই মুহূর্তে অনুভব করেছিলাম আমার ভেতরের আমি, আর আমার বেঁচে থাকার আমির মধ্যে, কত-ই না তফাত!

এই কী জীবন?

তবে কেনই বা একটা কনভেন্টে পড়া মেয়েকে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে একটা বাঙালি সংস্কৃতির অর্থহীন মায়াজালে? এই কী তবে সংসারের স্হায়িত্বের অলিখিত নিয়ম? জিওগ্রাফিটা বেঁচে থাকবে, কিন্তূ কেমেষ্ট্রিটা হারিয়ে যাবে? তা যাক। এর নাম সংসার। রামচন্দ্রের মতন তার নিজের গড়া সীতার লক্ষ্মণরেখার বলয়ে....

তার কারণ আর কেউ নয়....আমার বাবা। একটা সামাজিক স্হিরতার বাতাবরনে মানুষ করেছিলেন আমাকে। তৈরিও করতে চেয়েছিলেন একই আদলে। পাওয়া নয়....দেওয়া। হয়ত বা নিজের করে সবকিছুকে বুঝে নেওয়া।

সেই সামাজিক সন্দেশের ছাপের ছাঁচে আমিও বড় হয়ে উঠেছিলাম। সংসারের নিয়মমাফিক খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে আর পাঁচটা মধ্যবিত্ত

বাঙালির মতন, সৈকতের হাতে তুলে দিয়ে, তার কর্তব্য শেষ করলেন অন্য হাজারটা মধ্যবিত্ত বাবার মতন।

প্রথম প্রথম ঠিক বুঝতে পারিনি।

অতৃপ্ত যৌবনের চাহিদাটা তো সব বাঙালি মেয়ের মধ্যেই তুষের আগুনের মতন ধিক-ধিক করে জ্বলে। বিয়ের স্বপ্নের সেই বহু আকাঙ্খিত চাহিদাটা হঠাৎই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে জৈবীক চাওয়া রূপে । আমিই বা তার থেকে কোন্ ছাড়? সৈকত যেন দেহের চাহিদাটাকে সিঁথিতে একটা লাইসেন্স পরিয়ে মাইথন ড্যমটা খুলে দিল। এবার খরস্রোতা বরাকর নদীর বাঁধভাঙা প্লাবন। সেই প্লাবনের জোয়ারে যে আমি অংশীদার হবনা, এ তো ভাবাও ভুল! সেই জোয়ারের প্লাবনের ফলস্বরূপ পিঙ্কুর আর্বিভাব।

কিন্তূ কোথায় যেন বাংলা স্কুলে পড়া সৈকত আর কনভেন্টে বড় হওয়া আমার মানসিকতার মধ্যে এক বিরাট তারতম্য ছিল। সেদিন বুঝিনি। আসলে সৈকত এত চাপা, যে ওকে কোনোদিন ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি।

আজও নয়!

আর বুঝতে পারিনি বলেই, তোমাকে সেদিন সৌম্যদার বিয়েতে দেখে মন বলেছিল, হয়ত তুমি বুঝবে। কিংবা হয়ত আমি তোমাকে বুঝব। মনের অবচেতনে যখন এই কেমিষ্ট্রি ঘোরাফেরা করছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে তোমার বুকে আমার না-বলা কথার গোলাপ আঁটতে গেলাম।

মনে হল, আমার না-পাওয়ার অবগুণ্ঠনে কোথায় যেন ওই গোলাপের রক্তিম আভা নতুন রং-এর রেশ নিয়ে এসেছে। তোমার পাঞ্জাবির ওপর ছাড়িয়ে চলে গেছে আরও গভিরে। যে আভার রোশনাই হয়ত আমার বুকে হিল্লোল তুলেছিল, তোমার দ্রুত বয়ে যাওয়া শ্বাসের শব্দে।

তুমি বুঝতে পারনি। হাজার লোকের ভিড়ে বোঝাও সম্ভব নয়।

জীবনের বাজি নিয়েই তো এ পৃথীবীতে আসা। জীবনের বাজি নিয়েই তো স্বপ্ন দেখা বাঁচার। জন্ম....বিয়ে....সংস্কার.....প্রেম....মৃত্যু। সবটাই একটা জুয়া। খেলে চলেছি আমরা সবাই প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে সর্বদাই।

আমি তার থেকে কোন ছাড়?

বাবা বলেছিল ‘বুঝলি এই বুড়ো বয়েসে এসে বুঝলাম জীবনটাই একটা জুয়া। জেতা বা হারা....তারপর মরা’

‘মরতেই যদি হয় তো বেঁচেই মরব’ আমি হেসে বলেছিলাম।

বুঝিনি এত বছর পরে কথাটা কতখানি সত্যি হবে। আজ তোমাকে কাছে পেয়ে মনে হচ্ছে ‘স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল ক্ষণকালের ছন্দ’। তার মধ্যেই বেঁচে থাকার নিত্য নতুন আনন্দ। সে আনন্দের স্বাদটা যেন বারবার কড়া নেড়ে যাচ্ছিল আমার রুদ্ধ মনের বদ্ধ ঘরের দরজায়। সোনার চাবির কল্পিত পরিভাষায়।

নিজের অস্তিত্বের দৈনন্দিন শবটা, হয়ত ক্ষণকালের জন্য হলেও, সেই আনন্দটাকে বারবার খুঁজেছিল।

তারপর হঠাৎই আচমকা সৌম্যদার বিয়েতে সেদিন পেয়ে গেলাম তোমাকে....

মানিব্যগ থেকে দশ টাকার একটা নোট বার করে বললাম ‘ওই যে গান্ধীজির ছবিটার ওপর কিছু একটা লিখে দাও তো’

‘কী লিখব?’

‘যা আমি সারাজীবন বুকে ধরে রাখব’

তুমি হয়ত ভাবছিলে কী লিখবে? আমি ভাবছিলাম, এই কি সেই না-শোনা কথা, যা শোনার আগ্রহে, আমি সারাজীবন ধরে বসে আছি। সব পেয়েও নিরালায় অপেক্ষা করেছি একা একা?

তোমার লেখা দশ টাকার নোট-টা এখনও আমার ব্যগে আছে। হয়ত তোমার মনে নেই। আমি আজও ওটা বুকে বেঁধে রেখেছি।

ওউড়ে বেড়ালে আমাকে পাবে....

ধরা দিলে সব হারাবে

সেদিনের লেখা তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

কেন জান? তুমি তো আমায় ধরতে চাওনি। তুমি তো আমায় হারিয়েই পেতে চেয়েছ।

সৈকত আমায় ধরতে চেয়েছিল কিনা জানিনা। হয়ত ধরতেও চায়নি। হয়ত পেতেও চায়নি। শুধুই রাখতে চেয়েছিল। আর পাঁচটা সামগ্রীর মতন, আমাকে দিয়ে ওর সুসজ্জিত ঘর সাজাতে। দামি কোনো আসবাবের মতন। কিংবা পিঙ্কুর জননীর বেশে। অভিসারের স্বর্গ মুছে। দিনের আলোর লিখিত নিয়মের অলিখিত কোষে। বাক্সবন্দি একটা সামাজিক অস্তিত্বের মধ্যে।

আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল ঘরটা তো তোমার। তোমার নিজের মতন করে সাজিয়ে নাও তাকে

কী সাজাব? ইট-কনক্রিট-পাথর-সিমেন্ট দেওয়া একটা নীড়? পাখিরা তো খরকুটো দিয়েও নীড় সাজায়। সৈকত ঘরটাকে সাজাতে চেয়েছিল আরেকটা পুতুল দিয়ে....সিঁথিতে সিঁদুর দেওয়া অগ্নিসাক্ষির বরণমালা পরিয়ে কিনে আনা লাইসেন্সড্ পুতুল। তার একার সই করে আনা ম্যরেজ রেজিস্ট্রারের অফিসের কেনা সামগ্রী। বুঝতে পারেনি। শুধু বিয়ের রাতের হোমের মধ্যে আগুনের তাপ শেষ হয়ে যায়না। আগুনের তাপ লেগে থাকে বুকের স্পন্দনের আকাশে। যা দিনকে দিন যৌবনের রসতৃপ্তির মধ্যে স্থিতি লাভ করলেও, অন্তর্নিহীত ফল্গুধারার মতন বয়ে চলে সারাটা জীবন ধরে। বন্ধনের দৃঢ়তার দীপ্ত বহ্নি শিখায়....

তখন আর আমার কতই বা বয়েস হবে? পঁচিশ কি ছাব্বিশ। হয়ত বুকভরা একটা স্বপ্ন নিয়ে উড়তে চেয়েছিলাম। ডানামেলা আকাশে ওড়া ওই সাদা পায়রাটার মতন। সামাজিক বন্ধনের মধ্যে থেকেও, বন্ধনহীন নীল আকাশের

দিগন্তে ভেসে বেড়ানো ওই পাখিটার মতন অনন্ত অসীম নীলিমায়। পাখিদের কি ঘরে ফেরার তাড়া আছে?

বলে দেয়নি, হাতে পড়া ঘড়ির সময়। হয়ত সে ফিরবে মিলিয়ে যাওয়া সাঁঝের আলোতে। হয়ত সে ফিরবে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে ঘরে বসে ক্লান্তিকে একটু আবার জুড়িয়ে নিতে। সেখানেও কি সে আবার স্বপ্ন দেখবে কোনো এক নীড়ের? নিজের মনের দুয়ার খুলে আবার ভাসবে বাঁধভাঙা চাঁদের আলোর প্লাবনে?

সৈকতকে একদিন বলেছিলামওতোমার কৃষ্ণচূড়া গাছের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগেনাঃ

ওওসব দেখার সময় আমার নেই। রোজগার করে খেতে হবে তো। তোমার সময় আছে....তুমি দেখোঃ

আমাকে কৃষ্ণ চূড়া গাছের দিকে তাকিয়ে থাকতে দিয়ে, সৈকত ডুবে যেত তার কাজের মধ্যে। সময় হয়নি একবারও তাকাবার জীবনের খোলা আকাশের দিকে। সময় হয়নি তার জীবনের রং-রূপ-রস দিয়ে জীবনকে আবার রঙিন করে তোলার। জীবন চলুক তার নিজের গতিতে। সে পড়ে থাক তার জীবিকার আলোকে। কবিতা? ওসব কেবল ছন্নছাড়া বাউন্ডুলে লোকেদের মায়া। তার পাল্লায় পড়লে ধসে যাবে জীবনের অর্ধেকটা কায়া।

আমি বোধহয় খুঁজছিলাম সেই না-শোনা গান। ভোরের আকাশে পাখিদের কলকাকলিতে ভরিয়ে দেওয়া কোনো এক নতুন সুরের তান। যেখানে হিসেবের বাইরেও একটা পৃথিবী আছে। সেখানেই তো বাঁচার স্পৃহা আবার নতুন করে জাগে। সেখানে আছে তন্দ্রাহারা দিনের গান। সেখানে আছে আমার বেঁচে থাকার নব অভ্যুত্থান জীবনের মধ্যেই তো লুকিয়ে আছে হাজারও কবিতা। সেটাকেই তো খুঁজে নিতে হয় আলোকের ঝর্ণাধারায় হাতে হাত রেখে কোনো এক মিতা।

সৈকত বোধহয় কোনোদিনও সেই কবিতাটাকে দেখতেই শেখেনি। অনুভব করা, সে তো দূরের স্বপ্নহীন সময়ের অপব্যয়। হিসেবের খাতা ওলট-পালট হয়ে

যেতে পারে, যে কোনো সময়। তার থেকে পরে থাক ওসব কবিদের মায়া। সে ভুলে থাকতে চেয়েছিল নিজেকে, তার হিসেবের খাতার প্রশস্ত পাতায়। বটবৃক্ষের মতন নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সংসার রথের পাল্কিতে চড়ে।

বুকটা কেঁপে উঠেছিল। বুঝছিলাম রোজগারের মাটি আর স্বপ্নের মায়ার মধ্যে কত তফাত। স্বপ্ন শুধু খেলে বেড়িয়েছিল আমার মনের আকাশে। বাস্তব তাকে বেঁধে রেখেছিল অন্য এক শূন্য বাতাসে।

সম্ভোগের কাতরতার মধ্যে ছিলনা কোনো প্রাণ। শুধু ছিল যৌবনের নিশুতি রাতের ঘুমতে যাওয়ার আগে, আকাঙ্খিত কোনো ফেলে আসা মুহূর্তের, অযাচিত বিরল দান। সব ছাপিয়েও কোথায় যেন একটা বিরাট ফাঁক। হয়ত সম্ভোগের পরিপূর্ণতাটা লুকিয়ে আছে মনের যুগলবন্দির সুরে। সেখানেই যেন সাহারার নিঃশব্দ মরুভুমি আমাদের অন্তঃপুরে। লাল বেনারসী আর সিঁথির আবিরের মধ্যে নেই যে আসল স্বর্গভুমি। মনকে ছোঁয়ার মধ্যেই আছে পরিতৃপ্তির খনি।

ওআজকেই বেড়িয়ে যেতে হবে সৈকত ব্রীফের ফাইলগুলো গোছাতে গোছাতে বলেছিল।

ওকোথায়ঃ আগে থেকে বলেনি বলেই একটু চমকে গেছিলাম।

ওগুজরাট। আমেদাবাদে একটা প্রজেক্টের কনট্র্যাক্ট পেয়েছি

ওআগে বলনি তোঃ

ওকথা হচ্ছিল। আজকেই যে যেতে হবে জানতাম না। সকালে টি.এম.সি র প্রজেক্ট ম্যনেজার শৈলেশ প্যটেল ফোন করে বলল আজকেই যেতে। কাল ইন্সপেকশনে আসছে। ওরা প্রজেক্টের টেকনিক্যল ভ্যলিডিটি নিয়ে আলোচনা করতে চায়। সেটা তো আমি না থাকলে করা সম্ভব নয়

ওকবে ফিরবেঃ সৈকতের স্যুটকেসটা গোছাতে গোছাতে ওর দিকে না ফিরেই প্রশ্ন করলাম।

“ঠিক জানিনা। এক সপ্তাহ পরে বুঝতে পারব। কী জানি? কয়েক মাসও লেগে যেতে পারে। ওদের প্রগ্রেস কী ভাবে এগোচ্ছে না-দেখে তো বলতে পারব না”

ততক্ষণে সৈকতের ফাইল গোছানো শেষ হয়ে গেছে। সেদিন সন্ধ্যের ফ্লাইটে হারিয়ে গেছিল আমেদাবাদের প্রজেক্টের মধ্যে। আমি পরে রইলাম একা, জনবহুল নিঃশব্দ এক সমুদ্রের মরুভুমিতে।

তাই তুমি যখন বললে “আমি তো লিখে দিলাম নোটে। তুমি কী লিখে দেবে আমার বুকে?”

আমি গোলাপ-ছাপা ব্যগে পড়ে থাকা কোনো এক বিয়ের প্রেসেন্টেশনের জন্য কেনা একটা গিফট্ কার্ডে লিখে দিয়েছিলাম “ইতি তোমাকে..”

তোমাকে খুঁজেছি আমার যৌবনের উচ্ছ্বাসে। তোমাকে খুঁজেছি আমার ব্যর্থতার বহ্নি শিখায়। তোমাকে খুঁজেছি আমার মনের হাজার দরজা খুলে....কতদিন....কতযুগ ধরে। কত বিনিদ্র রজনীর একাকী নীরব অন্ধকারে। কত নেভা দীপের বাসনার নির্লিপ্ত অবসরে। কত কামনার উচ্ছ্বাস নিয়ে জোৎস্নায় ভেজা জানলার ফাঁক ধরে। আমার একাকী নিভৃত মনের নিঃশব্দ সুরের ছন্দহীণ বাসরে।

সেখানে আমি একা অন্য!

তুমি একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলে “আচ্ছা বলতো প্রেম কী?”

“প্রেম শুধু কৃষ্ণ চুড়া গাছের দিকে তাকিয়ে পাশাপাশি বসে থাকা একটা মুহূর্ত মাত্র”

“তুমি কবিতা লেখ নাকি?” অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলে।

“কবিতা তো আমাদের সবার মধ্যেই লুকিয়ে আছে। আমি এতদিন ধরেই তো তাকেই খুঁজছিলাম”

“পেয়েছ?”

ওজানিনা। মনে হয় পেয়েছি। আসলে কি জানো? মনের সুপ্ত অনুভূতিটা যখন আবেগ নিয়ে বেরিয়ে আসে, নিজের মনের ভাষার ছন্দে....সেটাই হয়ে যায় কবিতা। যে ভাষা দিতে পারে, সে কবি হয়ে যায়। আর আমার মতন যারা পারেনা, তারা থেকে যায় সাধারণ মানুষ হয়ে। কবিতা তো আমাদের সবার জীবনেই আছে....শুধু অনুভব করা বাকি আছে একটু থেমে তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলামওকেউ পারে, আবার কেউ পারেনা, তাকে ছন্দে মেলাতে

ওআমার মধ্যে কোনো কবিতা নেই। ছন্দ ও সুর যেন বারবার একটা তার ছেঁড়া রাগে গিয়ে মেশে আকাশের দিকে তাকিয়ে উদাসীনভাবে কথাটা ছুড়ে দিয়েছিলে তুমি।

বোধহয় নিজেকে....

সেই আকাশের দিকে চেয়ে আমি বলেছিলামওচলোনা কোথাও বেড়িয়ে আসি

ওকোথায়?

ওকোথাও একটা। যেখানে ওই ডুবে যাওয়া চাঁদটাকে সরিয়ে স্মৃতির দুয়ারে নরম হাতের ছোঁয়া রাখা যায়

ওসে দেশের ঠিকানা তো আমার জানা নেই

ওঠিকানাটা তো লুকিয়ে আছে আমাদের অন্তরে । চলোনা তাকে খুঁজে বেড়াই কোনো এক তেপান্তরের । যেখানে আকাশ আর মাটি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে এক স্তব্ধ অনুভূতির পাহাড়ের চূড়ায়

কথাটা মনের আবেগে বলে ফেলেছিলাম। সেই মুহূর্তে ভাবিনি সৈকতকে কী বলব? সৈকত এখন কলকাতায়। পিঙ্কুকে দেখে রাখতে পারবে। সে ব্যাপারে কোনো অসুবিধা নেই। আর না পারলে আমার মা-বাবা তো রয়েছেই। হয়ত সেই মুহূর্তে মন ফিরে তাকাতে চায়নি সামাজিক বেষ্টনির ঘেরাটোপে।

তুমি আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলে‘বেশ তো। চলোনা কালকেই বেড়িয়ে পড়ি’

‘কাল? কোথায়?’

‘একবার তো ট্রেনে চেপে বসি। তারপর দেখা যাবে কোথায় তোমার তেপান্তরের মাঠ?’

যেন সব গন্ডির বাইরে খুঁজে পেতে চেয়েছিলে এক অসীম অর্নির্দিষ্টকে। গন্তব্য না জেনেও এক পথভোলা পথে ছোটা। তার মধ্যেই কোনো এক মুহূর্তে নিজেদের খুঁজে নেওয়া।

‘বেশ চল তবে বেড়িয়ে পড়ি’ কী করে যে সব সামলে বেড়িয়ে পরব ভাবিওনি সেই মুহূর্তে। তবুও মন বলছিল‘চলো যাই....বেড়িয়ে পড়ি তোমার সঙ্গে’

মনে পড়েনা নিজে থেকে কখনও এমন দুম করে কোনোদিন কিছু করে ফেলেছিলাম কিনা। এতকাল তো সব কিছুই করেছি চেনা সুরের ছকে বাঁধা অঙ্কে। এবার না হয় দু-পা হেটে নিলাম বেসুরা ছন্দে।

‘কালকেই?’

‘হ্যাঁ....কাল-ই’

কালকে?!

সৈকতকে কী বলব? ঘরের সব কিছু গুছিয়ে রেখে যেতে হবে তো।

মনে পড়ে গেল কলেজ দিনের কথা।

‘রেডি হয়ে নে। দু-ঘন্টার মধ্যে ট্রেন ধরতে হবে’ বৈশালী ফোন করতে চমকে উঠেছিলাম।

‘কোথায় যাব?’

‘অতশত জেনে কী হবে? ট্রেনে উঠে ভাববো’

ওটিকিটঃ

ওআরে ছাড় তো। টি.টি কে কিছু টাকা দিয়ে ম্যানেজ করে নেবঃ

এই ছিল বৈশালী। হুজুগে দাপুটে বাধা বন্ধহীন....বাউন্ডুলে.... বেপরোয়া....ছন্নছাড়া....উদ্দাম বাঁধভাঙা যৌবনের উল্লাসে ভরপুর। বৈশালী হোস্টেলে থাকত বলেই ওর এই বেড়িয়ে পরার হুজুগে কোনো রকম পিছুটান ছিলনা।

....আমারও নয়। দাদা তখন ইউনির্ভাসিটিতে। বাড়িতে বাবা-মা-আমি-দাদা। সংসার সামলানো, সে তো মা-ই করে। তবে আর অত চিন্তা কীসের?

গোছগাছ করতে দেখে মা বললওকোথায় চললিঃ

ওজানিনাঃ সুটকেশে সালোয়ার জীনস্ ভরতে ভরতে বললাম।

ওতার মানেঃ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল মা।

একটু ঝাঁঝিয়ে বললামওজানিনা....বললাম তো..ঃ

ওএ আবার কীঃ মা ঠিক বুঝতে পারছিল না আমাকে। নাকি নতুন ভাবে চেনবার চেষ্টা করছিল তার না-চেনা মেয়েকে?

বুঝতে পেরেই বললামওবৈশালীর সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি। বৈশালী জানে....আমি জানিনাঃ

মাকে ভাবতে দিয়ে, গোছাতে গোছাতে ভাবছিলাম, কী নিতে ভুলে যাচ্ছি। কিছু ফেলে যাচ্ছি না তো? তখনও কী ছাই বোঝার বয়স ছিল যে কিছুই তো নিয়ে যাওয়া যায়না।

কোথায় টি.টি? কোথায় বুকিং? ট্রেনের বাথরুমের সামনে চাদর পেতে বসে সারা-রাত কাটিয়ে দিলাম আমরা দুজনে। আমি আর বৈশালী। ঘুমে চোখ ঢলে আসছিল। এর আগে তো কখনও ট্রেনের বাথরুমের সামনে বসে সারারাত কাটাইনি।

তন্দ্রার রেশ কাটল বৈশালীর আওয়াজেওএই নে চা। মোগলসরাই এসে গেছিঃ

বৈশালীর হাত থেকে চা নিতে নিতে বললামওকোথায় যাচ্ছি বল্ তোঃ

ওদিল্লি পর্যন্ত টিকিট আছে। যেখানে খুশি নেমে যেতে পারিঃ

চায়ে এক চুমুক দিয়ে আড়ষ্ট ঘুম চোখে বৈশালীর দিকে তাকিয়ে বোকার মতন বলেছিলামওকিন্তূ কোথায়ঃ

আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে, বৈশালী তার জীনস্ এর পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে বলেছিলওখাবিঃ

মাথা নেড়ে বলেছিলামওনাঃ

বৈশালী সিগারেট জ্বালাতে জ্বালাতে বলেছিলওজীবনটা জানিস এই সিগারেটের মতন। পুড়ে শেষ হয়ে যাবি। কিছুই পাবিনা। অতশত ভেবে কী হবে? মরে যদি কেওড়াতলার শ্মশানেই পুড়তে হয়, তার আগে একটু দম দিয়ে নিইঃ

সেই অল্প বয়েসের জীবনে কিছু না ভেবেই কথাটা বলেছিল বৈশালী। এখন বুঝতে পারছি মিথ্যে বলেনি একটুও। তখন সেই ভিড়ের মধ্যে কবিতা খোঁজার সৌভাগ্য হয়নি আমার। কিন্তূ এই উদ্দেশ্যহীনভাবে বেড়িয়ে পড়ার স্পৃহাটা, কোথায় যেন মনের কোনে, একটা রবার স্ট্যাম্প ফেলে দিয়েছিল। মুছেও মোছেনি....বুঝতে পারিনি তখন! বুঝতে পারলাম তোমায় বলায় এখন।

তোমার আহ্বানে যেন ভেতর থেকে সেই রবার স্ট্যাম্পের মোহরটা বেরিয়ে আসতে চাইছিল কবিতার ছন্দে। ডাক দিচ্ছিল সেই না-পাওয়া সুর....সেই না-শোনা কবিতা আবার আমাকে।

....সেই ভেঙে দেওয়ার একচ্ছত্র স্বাধীনতা!

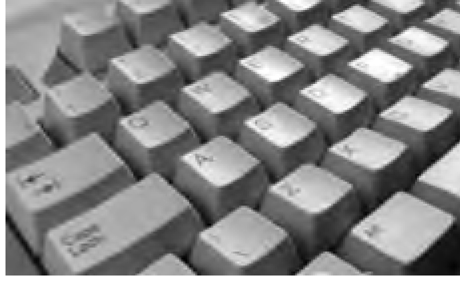
তাই কিছু না ভেবেই তোমাকে বলেছিলামওবেশ চলো। তাহলে বেড়িয়ে পড়ি কোথাও কালকেঃ

আমরা বেড়িয়ে পড়েছিলাম, অজানার খোঁজে। আমরা বেড়িয়ে পড়েছিলাম, বাঁধ ভাঙার নেশায়, চোখ বুজে। আমরা বেড়িয়ে পড়েছিলাম, এক অবিরাম গতিতে ছুটে চলার আশায়। আমরা বেড়িয়ে পড়েছিলাম, মোহনার দিশায়।

তোমার কী সেকথা এখনও মনে আছে কৌস্তভ ? ভুলে যাওনি তো সে দিনের কথা?

তোমাকে

কস্তূরী



তৃতীয় চিঠি

কস্তূরী

ইতি তোমাকে....

সেই গোলাপ ছাপা গিফট্ কার্ডটা আজও বুকে ধরে রেখেছি। এটাই আমার একান্ত নিজের পৃথীবীতে একটুকরো সান্ত্বনা । কিংবা আমার দৈনন্দিন টানা-পোড়েনের মধ্যে একটু বা না-পাওয়া আরাধানা।

টানা পোড়েনটা আমার বর্তমানকে ঘিরে। বিবেকের রূপের চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ী করতে চেয়েছিলাম আমার স্বপ্নের দেখা অঙ্গীকারে। বহুদিন ধরে লালিত নিজের একান্ত নিভৃত স্বপ্নের একাকী নিঃশব্দ বাসরে। স্বপ্নটা সেই ছোটোবেলায় দেখা শাঁখরাইলের পুকুর পাড়ে বসে। ধুসর রুক্ষ লালমাটি আর ঘাঁস বিছানো টিমটিম করা ল্যম্প-পোষ্টের আলো-আঁধারিতে জীবন গড়ার স্বপ্ন ।

কী বোকাই না ছিলাম আমি!

জীবনের মানেটা তখনও বুঝতে শিখিনি। জীবনের বাসর থেকে স্বপ্নের দোসর যে বহুদূর বুঝিনি সেদিন। পরে টের পেলাম দুটো পৃথিবীর ভিন্ন অঙ্ক। কিন্তূ ততক্ষণে বাঁধা পড়ে গেছি চলোমান গতির একটানা পথে। বাসর থেকে সংসারের ছন্দহীন রথে।

বিয়ে করেছিলাম হুট করেই। অতশত না ভেবেচিন্তে ।

অবন্তিকার সঙ্গে পরিচয় সেই ডাল-ভাতের তাগিদে। আনন্দবাজারের অফিসে প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিটে দুজনেই বসেছিলাম। কখন ডাক পড়ে। চাকরি চাই....যে কোনো একটা চাকরি। বৃহস্পতির দশা চলছিল কিনা তাও জানিনা। সুদূর শাঁখরাইলের এক অজ্ঞাত, অখ্যত কোনো ছেলেকে যে কেউ ক্যচ ছাড়া চাকরি দেবে, এটা স্বপ্নের ভাবাও ভুল। তবুও আশা। একটু বা প্রত্যাশা। তাই নিয়েই তো ছুটে চলা আশা মাখা কুয়াশায়।

আশাটা‘কুহকিনী’ হলনা। মায়ার স্বপ্ন নেমে এল বাস্তবের কায়ার পৃথীবীতে। কিছু বোঝার আগেই চাকরিটা পেয়ে গেলাম আমরা দুজনেই। এটাই হয়ত গ্রহের সংযোগ। চাকরিটা হয়ত একটা নিছক উপলক্ষ্য মাত্র।

অবন্তিকা বেরোতে বেরোতে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল‘আপনার জন্যই পেলাম। জানেন আজ দু-বছর ধরে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি’

মেয়েটির মুখের দিকে তাকালাম। দেখে মনে হল সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। কোনো প্রসাধন নেই। একটা সাধারণ ছাপা শাড়ি পড়া। সেই প্রথম কাছ থেকে অবন্তিকাকে দেখা। সেই দেখা যে কোনোদিনও শুভদৃষ্টিতে রূপ নিতে পারে, কল্পনাও করতে পারিনি সেই মুহূর্তে।

উৎফুল্ল হয়ে বেরোচ্ছিলাম সিঁড়ি দিয়ে নেমে। হঠাৎ সেই পাওয়ার আনন্দে ভাটা পড়ল কোনো এক অজ্ঞাত কারণে। ঠিক আনন্দবাজারের দোরগোড়ায় মেয়েটির চটির একটা ষ্ট্র্যাপ গেল ছিঁড়ে। চাকরি পাওয়ার আনন্দটাই মাটি হয়ে গেল নিমেষের তরে।

‘ইশ্‌!’

‘কী হল?’

‘চটিটা ছিঁড়ে গেল!’

‘চলুন দেখি কোথাও একটা মুচি পাওয়া যায় কিনা?’ আমার সহানুভূতির স্বরে বোধহয় কিঞ্চিৎ লজ্জা পেল মেয়েটি।

স্ট্র্যাপটায় গিট্টু মারতে মারতে বলল্ওনা থাক। বাড়িতে গিয়ে ঠিক করিয়ে নেব

ওএভাবে কী করে যাবেন? বাড়ি কোথায়?

ওহাওড়ায়। বালিটিকুরিতে

ওইস! এতদূর কি এভাবে যাওয়া যায়? চলুন দেখি, সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউতে একটা মুচি পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই

মেয়েটি একটু দ্বিধা করছিল। বুঝতে পেরেই বললাম্ওকোনো অসুবিধা আছে?

একটু ইতস্তত করে মেয়েটি বলল্ওনা....মানে....বাস ভাড়া ছাড়া আর আমার কাছে কোনো পয়সা নেই

কেমন যেন মায়া হল মেয়েটির প্রতি। এই দুপুরে এতটা পথ এসেছে এই কটা টাকা সম্বল করে। একটা চাকরির আশায়। সেখানে কোনো অনুভূতি ছিলনা। পৃথিবী যেন সত্যিই বড় কঠিন। ছন্দহীন গদ্যময়। বাঁচার সংগ্রামের দু-মুঠো রুটির প্রত্যাশা।

ওর অস্বস্তি কাটাতে বললাম্ওযদি কিছু মনে না করেন এটুকু পয়সা আমি দিয়ে দিতে পারব। আসুন তো আমার সঙ্গে

হয়ত ওর মনে একটু দ্বিধা ছিল।

এবার একটু দৃঢ়ভাবেই বললাম্ওআসুন তো। লজ্জা পাওয়ার অত কিছু নেই

আমার চাপের চোটে আর কোনো কথা না বাড়িয়ে আমার সঙ্গে চলতে শুরু করল। চাঙ-ওয়া ছাড়িয়ে পুলিশ স্টেশনের দিকে কিছুটা এগোতে অবশেষে মুচির দেখা মিলল।

চটি সারাই করে পয়সা দেওয়ার সময় মেয়েটি বিনম্র ভাবে বলল্ওইশ্....আমার যে কী লজ্জা করছে না..

ওএই তো কটা পয়সা। লজ্জা পাওয়ার কী আছে? এখন তো চাকরি পেয়ে গেছেন। নেকস্ট্ মাসে শোধ করে দেবেন তাহলে। যদি এতই সঙ্কোচ থাকে

এটাকে ধার হিসেবে নেবেন। মাইনাস সুদ্ধ

এবার আমার কথা শুনে হেসে ফেলল মেয়েটি। এই প্রথম ওকে নতুন পরিচয়ের জড়তা কাটিয়ে, একটু স্বাভাবিক দেখলাম। আমার সঙ্গে যেন সঙ্কোচের জড়তা কাটিয়ে স্বাভাবিক হতে পেরেছে আমার কাছে।

ছাপা শাড়িটার আঁচল দিয়ে ঘামে ভেজা কপালটা মুছে বলল থ্যঙ্ক ইউ

শুধু শুধু থ্যাংকস্ হয়না। চলুন ওই সামনের সেন্ট্রাল এভিনিউর মোড়ে কফি হাউসে গিয়ে বসি একটু থেমে বললাম আমিই কফি খাওয়াব। তা না হলে এখান থেকে বালিটিকুরি হাঁটতে গিয়ে আবার চটির স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে যাবে

আমার কথায় হেসে ফেলল মেয়েটি। এবার যেন আরও নিবিড় ভাবে দেখলাম ওকে। লক্ষ্য করলাম হাসলে ওর গালে ছোট্ট একটা টোল পরে। অনাড়ম্বর মেয়েটির মুখের একটা নিজস্ব লালিত্য আছে। হয়ত এর আগে শাঁখরাইলের মতন পাড়া গাঁয়ে আমার সে লালিত্য এতদিন পর্যন্ত চোখে পড়েনি। সেই লালিত্যটাই কোথায় যেন ছুঁয়ে গেল আমার হৃদয়। হয়ত প্রথম কোনো মহিলার কাছের সান্নিধ্য পাওয়ার চাপা উত্তেজনাটা অনুভব করছিলাম ভেতরে ভেতরে।

হাঁটতে হাঁটতে সেন্ট্রাল এভিনিউর ইন্ডিয়ান কফি হাউসে গিয়ে বসলাম। তখনই পরিচয় হল ওর সঙ্গে।

নাম অবন্তিকা ।

হাওড়ার দাশনগরের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এষ্টেটে বাবা চাকরি করত। বেশ কিছুদিন হল কারখানা বন্ধ। হাওড়া গার্লস্ কলেজ থেকে গ্র্যজুয়েশন করে, ক্যলকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে জার্নালিজিমে মাস্টার্স করা।

সেদিন আর বেশি কিছু বলেনি অবন্তিকা ।

শাঁখরাইলের ছেলে, যে মহিলার সংস্পর্শ থেকে দূরে দূরে থাকত, নিজের যোগ্যতার পরিমাপ না-জেনে, সে যেন জীবনে এই প্রথম কোনো একজন অচেনা

যুবতীর এত কাছে বসবার সুযোগ পেল। ভালো লেগে গেল তাকে সেই ক্ষণিকের কথার মধ্যে। ভালোবেসে ফেললাম একসাথে করা চাকরির ফাঁকে। তার পরিণতি গিয়ে ঠেকল সিঁদুরের বাসরসজ্জার কাঁসরে। বরণ করে গ্রহণ করলাম তাকে আমার সংসারের আসরে।

আজকে অবন্তিকা আমার বিবাহিত স্ত্রী । আমার ঘরের লক্ষী। জীবনের চলার পথের পাথেয়। আমার ছোট্ট পৃথিবীর একছত্র সাম্রাজ্ঞী।

তাই তুমি যখন বললে‘চলোনা কোথাও বেড়িয়ে আসি’, দুম করে তো‘হ্যাঁ’ বলে দিলাম তোমাকে।

মাঝখানে অনেকগুলো প্রশ্ন ঝুলছে।

একদিকে আমার বিবাহিত স্ত্রী অবন্তিকা । অন্যদিকে আমার চাকরি। যে দুটো পার্থিব সাংসারিক জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অন্যদিকে তোমার সঙ্গে উদ্দেশ্যহীনভাবে বেড়িয়ে পড়ার একটা ভেতরের ডাক। যেই ডাকের সহচর আমার মন। বহুদিনের স্বপ্নের প্রতিক্ষণ। পেছনের অন্ধকারকে দূরে ঠেলে আমার স্বপ্নের আকাশে ভাসার তাড়না। সেখানেই যে মনের দোটানার বিড়ম্বনা।

এই ত্রিভুজের ভেতরে ঘুরপাক খাচ্ছি আমি। দ্বন্দ ছাড়া কি জীবন আছে? মুক্তির মধ্যে যেমন আনন্দ আছে। বন্ধনের মধ্যেও তেমনি আছে কোথায় লুকিয়ে থাকা শান্তির নীড়। বন্ধন আর মুক্তি কি কখনও এক সুরে বাঁধা হতে পারে? হয়ত সেই খানেই ইহুদি মেনুইন আর রবিশঙ্কর ঝংকার তোলে সরগমের সুরে, কোমল থেকে নিখাদের সপ্তম মার্গে রুদিয়ার্দ কিপলিং আজ অতীত। বর্তমান শুধু তুমি আর আমি....আমাদের দুটি মন। না-পাওয়াকে নিজের করে পাওয়ার এইতো শুভক্ষণ।

তবুও....

আমি সেই মুহূর্তে সেটাই তো চাইছিলাম। এই পৃথিবীর বাইরের অন্য এক পৃথিবীকে দেখতে। তোমার পায়ে পা মিলিয়ে পাওয়ার স্বল্পতার মধ্যে বৃহত্তর

কোনো এক পাওয়াকে নিবিড় করে নিতে। নতুন স্বাদের খোঁজে....নতুন আশার দিশায়....নোঙরহীন পালতোলা নৌকোর মতন ছুটে যাওয়া দিগন্তের সীমারেখার মোহনায়....তোমার হাতে হাত রেখে নতুন কিছু পাওয়ার প্রত্যাশায়....

কিছুটা অন্যমনস্কভাবে টিভির খবর দেখতে দেখতে অবন্তিকাকে বললাম ওকাজের জন্য আমায় কয়েকদিন বাইরে যেতে হতে পারেঃ

ওকোথায়ঃ রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আঁচলটাকে কোমরে বাঁধতে বাঁধতে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল অবন্তিকা ।

ওপ্রথমে দিল্লি। তারপরে সেখান থেকে ওরা যেখানে পাঠায়ঃ

অবন্তিকা আর প্রশ্ন করেনি। এতদিনে আমার এই ছন্নছাড়া চাকরি জীবনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। ও ও তো আমার মতন একই কাজ করেছে। টুবলু হওয়ার পর আর চাকরি করা সম্ভব হলনা। ঘর-সংসার করা....বাচ্চা মানুষ করা....আমার বৃদ্ধ বাবা-মাকে দেখাশোনা করা। ওর জার্নালিজিমের সার্টিফিকেটটা এখন ম্যরেজ রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেটে রূপান্তরিত হয়েছে সংসারের চলার পথে। এতদিনে বোধহয় ভুলেই গেছে জার্নালিজম জিনিসটা কী? তবুও পুরোনো অভিজ্ঞতার স্বাদটার স্মৃতি এখনও বিলুপ্ত হয়ে যায়নি।

তাই অযথা প্রশ্ন না বাড়িয়ে বললওযাওয়ার আগে কিছু টাকা তুলে দিয়ে যেও তো। মাসকাবারি আনা বাকি। টুবলুর স্কুলের মাইনাটাও বাকিঃ

ওকতঃ

ওহাজার পাঁচেকঃ

আমার সিনিয়র এডিটর আশিস ঘোষ আমার দিকে তাকিয়ে বললওহঠাৎ বাইরে যাবে কেনঃ

একটু আমতা আমতা করেই বললামওওই যে আপনাকে অনেকদিন ধরেই বলছিলাম না, পাহাড়ের নতুন ডেভেলপ করা রিসর্টগুলো নিয়ে একটা স্টোরি

করব। হঠাৎ মনে হল, সেটা সেরেই ফেলি। আজকাল খুব ঘোরবার ডিমান্ড বেড়েছে। ওটা বাজারে ভালো খাবে।”

“কিন্তু ছবি তো লাগবে?” আশিস ঘোষ পার্ফেকশনিষ্ট। একটু থেমে বলল “পুষ্পেন্দুকে সঙ্গে নিয়ে যাবে?”

আমার আর তোমার মধ্যে পুষ্পেন্দু! কাবাব মে হাড্ডি।

মৃদু প্রতিবাদ করে বললাম “আবার খরচ বাড়াবেন কেন? আমার ডিজিট্যাল ক্যমেরাতেই কয়েকটা ছবি তুলে আনব। পরে ডি.টি.পি র লোককে দিয়ে একটু সাজিয়ে নেবেন।”

“বেশ যাও। পুরো কভারেজ চাই কিন্তু।” সম্মতি দিয়ে আশিস ঘোষ বলল “কবে যেতে চাও তাহলে?”

“কাল।” আমার আচমকা উত্তরে আশিস ঘোষ হকচকিয়ে তাকাল আমার দিকে। হয়ত মনে মনে ভাবছে এই পাগলটাকে নিয়ে কাজ করার অর্থ যতটাই অপ্রত্যাশিত হোক না কেন, তার লেখাকে বাজারে বিক্রি করা ততটাই সহজ। হাজার হোক মালিক তো মুনাফাটাই শুধু বোঝে। তাই আমার মতন পাগলকে একটু প্রশ্রয়ও দিয়েই থাকে।

মুচকি হেসে বলল “এইটাই তুমি। একবার যখন ঠিক করে ফেলেছ, কাজটা শেষ না করে ছাড়বে না।” একটু থেমে বলল “কত টাকা লাগবে?”

“পঞ্চাশ দিয়ে দিন। এর থেকে বেশি বোধহয় লাগবে না।” এতদিন রিপোর্টারের কাজ করতে করতে মনে মনে জানতাম, যে রিসর্ট নিয়ে লিখতে যাই না কেন, সব কিছুই তো “অন দ্য হাউস”। কলমের জোরে ব্যবসা চলে। আতিথিয়তায় পাবলিসিটি কথা বলে।

ভাউচারে লিখতে লিখতে বলল “একাউন্টস্ অফিস থেকে তুলে নিও। বেস্ট অফ লাক।” তারপর মুচকি হেসে চোখ টিপে বলল “আই ওয়ান্ট এ সেলিং স্টোরি।”

আশিস ঘোষ সম্পাদকদের মধ্যে একটু প্রগতিশীল। এতদিনে বেশ বুঝে গেছে, অর্ধ বিবস্ত্র নায়িকার ছবি, আর পলিটিক্যল নেতাদের প্যচপ্যচানি আর বাজারে বেশি খাচ্ছে না। এর থেকে অরন্য, প্রকৃতি, বাঘ, দ্রষ্টব্য স্থান রিসর্ট এখন এসব অনেক বেশি চলে। আমি তো জানি রিসর্টের কাহিনি লিখতে গেলে ওখানে থাকা-খাওয়াটাও ফ্রী। কে না চায় তাদের সম্বন্ধে খবরের কাগজ একটু ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে লিখুক? এ্যডভার্টাইজমেন্টের থেকে একজন রিপোর্টারের দেখভাল করা অনেক সস্তা । এ্যডভার্টাইজমেন্টের আতিশায্যে আজকাল ওগুলো কেউ আর তেমন গুরুত্বই দেয়না।

কম খরচে অনেক বেশি পাবলিসিটি!

সন্ধ্যেবেলা মালিক এক বোতল হুইস্কি হাতে হাজির হয়ে একটু ইনিয়ে-বিনিয়ে বলল্বে একটু ফলাও করে লিখবেন স্যর। যাতে আরও লোক এখানে আসে২ একটু থেমে আবার বলল্বে আমাদের সার্ভিসেস কিন্তূ এক্সিলেন্ট। দেখতেই তো পাচ্ছেন স্যর..২

কস্তূরী সেই প্রথম।

দুজনে একসঙ্গে না-পাওয়া স্বপ্নের হাত ধরে পথ চলা। সংসারের লক্ষ্মণরেখার বেড়া ছিঁড়ে সীতার মমতায় বনবাসে....সেখানে অতর্কিতে রাবণের আর্বিভাব হবে না তো আবার?

না কি, যুগ-যুগান্তরের অতৃপ্ত কোনো মোহময় স্বর্গ? ভেসে বেড়াব দুজনে। শুনব হৃদয়ের ডাক নিভৃত নিরালা কুজনে....

কে জানে?

তবুও তো বাঁধভেঙ্গে চলা। চলার আনন্দটাই বা কম কীসের? ওড়ার আনন্দের নেশা যেন আমায় পেয়ে বসেছে।

হয়ত তোমাকেও....

এর আগে কলকাতায় পায়ে পা মিলিয়ে দু-চার কদম হয়ত একসঙ্গে চলেছি। বর্ষাস্নাত ভিজে বিকেলে কাদা প্যচপ্যচে কলকাতার মাটিতে স্লোগানের ভিড় এড়িয়ে, কোনো এক নির্জন কোনে আধ-ভেজা দেহটাকে রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে, তোমার প্রলেপহীন অবয়বের উষ্ণ ঘ্রাণটাকে বর্ষার ভিজে মাটির গন্ধর মতন বুক ভরে অনুভব করেছি। তবুও অন্য দেশে তোমাকে নিয়ে অর্নির্দিষ্টের পথে যাওয়া অনেক তফাত! চেনা মাটির গন্ধকে পেছনে ফেলে একটা শোনা না-জানা আবছায়ার দেশে। সময়ের ধরা ছোয়ার বাইরে....একটা রঙিন পর্দার ওপারে....

আকাশে ওড়া পাখিটা যখন সন্ধ্যার অস্তাচলে নিজের নীড়ে ফিরে আসে, আমাদেরও কী কোনোদিন ফিরতে হবে চেনা পৃথিবীর গন্ডির আবদ্ধে? আমরাও তো অসীম সমূদ্রের মধ্যে সাঁতার কাটতে-কাটতে কিছু মুহূর্তকে মুক্তর মতন তুলে আনার প্রচেষ্টা করতে পারি। কিন্তূ সন্ধ্যা নামতেই ঘরে ফেরার চিন্তাটা মাথায় ঘোরাফেরা করে মনের আনাচে-কানাচে। সেখানে একটা বলয় তো এখনও আছে। দিনান্তের শেষ পলে সেই ঘরেই ফিরে যাই....আমাদের সাজানো সংসারের বদ্ধ আঙিনায়। শুধু মুহূর্তটাকে স্মৃতি করে আবার ভেসে বেড়াই দৈনন্দিন নিয়মের জাঁতাকলে। মন তখনও পড়ে থাকে ওই পাখিদের ওড়ার ছন্দের তালে তালে। দিন-রাত মিশে যায় মুহূর্তের আনন্দে।

বিহঙ্গ উড়তে উড়তে কোনোদিন থেমে যায় সামাজিক রাশের লাগামটানা বলিরেখায়। পাওয়াটা মুহূর্তের অনুভূতি হলেও পেছনে পড়ে যায় কায়ার মায়ায়। সেই মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে কায়ার পরশের স্বপ্নের বিভোর অর্নির্দিষ্ট থেকে ফিরে আসে নির্দিষ্টে। সে তো সকলের দৈনন্দিন জীবন কাহিনি।

এবার হয়ত সময় হয়েছে সেই র্নিদিষ্টের বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে আসার ভাষা শুনতে....ওড়ার ছন্দে মনের লেখায় স্বরলিপির সুর নতুন করে গাঁথতে। চলার পথে, শীতের রাতের ঘন কুয়াশা। কালকের ভোরের ছন্দে সেই সঙ্গীতের

রেওয়াজে, নতুন করে গলা সাধা। নির্দিষ্ট চিহ্নের চলার ছন্দ পেছনে ফেলে, অর্নির্দিষ্টের পথে সুরের কবিতায় ভাসা। বহুদিন পর মনে খেলে বেড়াচ্ছে ক্ষীণ আশা। আবার নিজেদের নিজের মতন করে খুঁজে পাওয়ার একটা মনগড়া প্রচেষ্টা।

এখনও মনে আছে সেই মুহূর্তের কথা।

তুমি ট্রেনের র্ফাষ্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টের বুনেট টানটান করা সোফায় গা এলিয়ে বলেছিলেওআচ্ছা কোথায় যাচ্ছি বলতঽ

ওজানিনা। জানতে চাই-ও-না। বোধহয় জহান্নামেঽ মুচকি হেসে উত্তর দিয়েছিলাম তোমাকে।

স্বর্গটা কোথায় তা তো এখনও বুঝতে পারলাম না। জাহান্নামটা যে কদ্দূর, জেনেই বা কী হবে? কিন্তু এই মুহর্তটাকে যে বহুদিন ধরে খুঁজছিলাম, সেটাই বা অস্বীকার করি কী করে? তোমার মধ্যে কী দেখেছিলাম জানিনা। তোমার থেকে কী পাব, তাও ভাবিনি কখনও। জানতেও চাইনি কোনোদিনও। কিন্তু এই মুহূর্তের আনন্দটুকুর তো কোনো ভাষা নেই। কোনো শব্দ নেই। আছে শুধু একটা না-বলা অনুভূতি। একটা নিঃশব্দ পাওয়া। সেটাই বোধহয় বহুকাল ধরে খুঁজে গেছি বারবার। কোকিলের ডাকে, ঝিঁঝি পোকার শব্দে, নিজের মনের নিভৃত কোণে, এক না-লেখা সিম্ফনি আঁকতে চেয়েছি প্রত্যেক রাতের স্বপ্ন ঘিরে। আজকে হয়ত বা তাকেই খুঁজতে বেড়িয়েছি নতুন করে আবার। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে স্বপ্ন সৌধ গড়ব নতুন বুনিয়াদে শেষবার।

কস্তূরী , তুমি জাহান্নামের পথটা আমায় দেখিয়েছিলে এক নতুন রূপের সাজে। নতুন এক ছন্দের মন ভরে যাওয়া, না-খুঁজে পাওয়া বুকভরা আনন্দে। নতুন প্রাণের নিত্য নতুন আবেগের পশরা সাজিয়ে। চলার ছন্দে, জীবনের গতির নতুন রজনীগন্ধার মালা পরিয়ে।

জানলার বাইরে চলমান ট্রেনের গতিপথে মুছে যাওয়া দৃশ্যপটের দিকে তাকিয়ে তুমি হঠাৎ বলে উঠলেওআচ্ছা,জাহান্নামটা কোথায় বলতঃ

ওজানিনা। বোধহয় আমাদেরই মধ্যে। অথবা অমাদের না-বলা নতুন কোনো এক ছন্দে। একটা পাওয়া না-পাওয়ার দ্বিধাহীন দ্বন্দে। কিংবা পরম প্রাপ্তির অভিলাষায় আশাহীন এক স্বপ্ন মাখা আনন্দেঃ

তুমি সেই সরে যাওয়া দৃশ্যপটগুলো দেখতে দেখতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেওআমিও জানিনাঃ

ওকী জাননাঃ

ওকোথায় চলেছি? আর কেনই বা চলেছিঃ

ওচলার আনন্দটাই তো বড় কথা। কী হবে ভেবে কোথায় গিয়ে থামব? আমরা কি কেউ গন্তব্যটা জানিঃ

ওকেওড়াতলাঃ তোমার দীর্ঘশ্বাসে, সেই মুহূর্তে, তোমার মুখে ফুটে উঠেছিল এক হতাশার ছবি।

জীবনের সুনিশ্চিত পরিণতি।

প্রশ্ন করিনি কেনই বা এ হতাশা? কীসেরই বা এত প্রত্যাশা? এর উত্তর পেতে গেলে জানতে হবে তোমার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের না-পাওয়া ভাষা। জানতে হবে তোমার স্বপ্ন ভরা দুচোখের না-দেখা গভীর চাওনির প্রত্যাশিত অভিলাষা। বুঝতে হবে তোমার না-জ্বলা প্রদীপের দীপশিখার আলোকের পেছনে পড়ে থাকা ছায়ার অনুচ্চারিত কাহিনি। কি হবেই বা জেনে তোমার অতীতের ফেলে আসা সম্ভারের সুপ্ত লিখনি? কী হবেই বা বুঝে তোমার অতীতের না-পাওয়া কোনো এক নিরালা অভিসার? কী হবেই বা জেনে তোমার অতৃপ্তির অন্ধকার?

তোমার ঘন কালো কোমর-ছোঁয়া মুক্ত বেণীর দিকে একবার তাকিয়ে বললাম ওজানবার কি কোনো দরকার আছে কস্তূরী ? এই মুহূর্তটাকেই শুধু সম্বল করে কি

বেঁচে থাকা যায়না?’

বাইরের চলমান মুছে যাওয়া চলন্ত ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে, মুখ না ফিরিয়ে বলেছিলে—‘যায় বলেই তো হুট করে বেড়িয়ে পড়তে পারলাম’

‘অসুবিধা হয়নি?’

‘সে কথা জেনে তোমার লাভ কী?’ তুমি কটাক্ষ করে বললে আমাকে।

সত্যিই তো!

লাভ-লোকসানের হিসেব মেলাতে তো আমরা বেরোইনি। আমরা বেরিয়েছি আমাদের মনের অবগুণ্ঠন খুলতে। না-পাওয়ার চোরাবালিকে পেছনে ফেলে স্বপ্ন সৌধ গড়তে। এর বেশি আর কী কিছু করার আছে? আমরা তো কেউই জানিনা পরের মুহূর্তে আমাদের জন্য কী পড়ে আছে?

চলন্ত ট্রেনের জানলার বাইরের দৃশ্যপটগুলো যেমন মুহূর্তে মুহূর্তে সরে সরে যাচ্ছে। আমাদের জীবনের রং-এর সপ্তরং-এর রামধনুটা তেমনি ক্ষণে ক্ষণে নানা বিচিত্র আভরণে রাঙিয়ে সাজাচ্ছে। আমাদের বেঁচে থাকার প্রতিটা মুহূর্ত যেন পটে আঁকা ছবি! সুখ দুঃখ, হাসি-কান্না, পাওয়া না-পাওয়া....প্রতিটা স্পর্শ যেন নতুন পটের রবি। সব মিলেমিশে একটা সাদা ক্যানভাস র প্রেক্ষাপটে অনুভূতি দিয়ে ছবি আঁকছে অবিরত। মুচছে....আঁকছে....আবার তাকে মুচছে। আবার মনের পাত্রে রঙে ভরিয়ে নতুন তুলির টানের স্পর্শে নতুন ছবির রং মেলাচ্ছে। নিজের অগোচরে তা কখন মুছে আবার নতুন দিগন্তে মেশাচ্ছে। রামধনুর সাতটা রং-এর ক্যালিডিওস্কোপের মতন মুহূর্তের রং-এর বর্ণের বাহারে। সেই অস্পষ্ট ছবির রূপটা ফুটে ওঠার আগেই ছবিটা যেন আবার মিলিয়ে যাচ্ছে ধূ ধূ প্রান্তের ধুসরে।

তুমি আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলেছিলে—‘তাই তো বেরিয়ে পড়লাম অর্নির্দিষ্টের পথে’

আমি তোমার কাজল-কালো চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম—‘আমার সাথে’

অবন্তিকার কথা তো তোমায় আর বলা যাবেনা। সেরিব্রাল এ্যটাকে আমার শয্যাসায়ী বাবার কাহিনিও তোমায় শোনানো যাবেনা। টবলুর স্কুলের ইতিহাস সে তো একান্ত আমার নিজের আপনার। ভালোবাসি কথাটা বারবার বলতে গেলে তেতো হয়ে যায়, যদি বলি বারবার।

তাই অনির্দ্রিষ্টকে নির্দিষ্টের মধ্যে দেখার মধ্যেই এই মুহূর্তের ছন্দ। সেই আনন্দটাকে মাটি করি কেন অতশত ভেবে, হারাই কেন এই মুহূর্তের আনন্দ?

তখন আর আমার কত-ই বা বয়েস। আট কিংবা নয়। শাঁখরাইলের পুকুরপাড়ে বসে চাঁদ দেখতাম। আর মনে মনে স্বপ্নের জাল বুনতাম....

আহা রে! যদি কখনও চাঁদের দেশে পাড়ি দিতে পারতাম!

স্বপ্ন দেখতে কার না ভালো লাগে? অনেক না-পাওয়াকে স্বপ্নের মধ্যে পেয়ে ফেলা যায়। সেই বয়সে মফস্বলের পুকুরপাড়ে বসে তো আর চাঁদকে ধরার স্বপ্ন দেখা যায়না। শুধু অনুভূতির রঙিন আলোয় মুহূর্তটাকে বরণ করে নিয়ে উপভোগ করা যায়।

তোমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে বললাম৩ভালো লাগছে২

তুমি তোমার খয়রি লিপষ্টিক মাখা পুষ্ঠ ঠোঁট নাড়িয়ে ফিসফিস করে বললে ৩তোমাকে..২

মায়াটা যেন সেই মুহূর্তে কায়া হয়ে ধরা দিল! আমার স্বপ্ন বাস্তবের রং পেল।

অবন্তিকা কে কাছে পেয়েও মানুষটাকে না-অনুভব করা....কোথায় যেন একটা শূন্যতা বুকের গভীর কোনে একটা ঢেউ-এর তরঙ্গ বুলিয়ে গেল। তোমাকে অনুভব করলাম, সেই পেয়েও না-পাওয়া কায়ার অবয়বে। আমাদের মনের জলতরঙ্গ আবার বেজে উঠল নতুন সরগম থেকে নিখাদের আশায়....মৌনতার অলিখিত ভাষায়....মুহূর্তের পূর্ণতার প্রচেষ্টায়....

অবন্তিকা পাক্কা গৃহিনী। সব কিছুই হিসেবের অঙ্কে বাঁধা। বাবার চাকরি চলে যাওয়ার পর থেকে দুনিয়াদারিটা ভালোই শিখে গেছে। কোথায় কতটা খরচ করতে হবে, সব যেন আঙুলের ডগার মধ্যে। টুবলু থেকে শ্বশুর-শাশুড়ি ....এমনকি আমার চা-সিগারেটের বরাদ্দ কোটা-টাও। এর বাইরে ভাবতে পারেনা। এর বাইরে ভাবতে চায়না। এখন গল্পের বই পড়তেও আলসেমি। অবসর মানে টিভির প্রলাপে সারাদিনের ক্লান্তির হানি। অবসর মানে সিরিয়ালের শুরু -শেষহীন অর্থহীন প্রলাপের মধ্যে সময় কাটানোর গ্লানি। অবসর মানে পাড়ার গিন্নিদের সঙ্গে গুলতানি করা, কিছু সামাজিক সংলাপ। অবসরের ফাঁকে চাঁদের পূর্ণিমাটাও দেখতে ভুলে গেছে দেখাটাই যেন আজগুবি প্রলাপ।

মন চাইছিল তোমাকে একটু ছুঁই। সংস্কার বলছিল এটা অন্যায়....এটা পাপ। একে প্রশ্রয় দিলে ভালোবাসা হয়ে যাবে মাটি। তুমি আঙুল তুলে বলবেঃতোমরা তো সবাই একঃ

বলে মুছে যাবে তোমার মিষ্টিমধুর হাসি।

তবুও....

মন মেতেছিল ন্যায়-অন্যায়ের বাইরে। তোমাকে নিবিড় করে স্পর্শ করার আছিলার দ্বারে। আর একটু কাছে ঘেঁষে বসলাম তোমার পাশে। আমার দিকে তাকিয়ে, মুচকি হেসে, তুমি আবার ফিরে তাকালে জানলার বাইরের ওধারে। যেন বুঝে গেছে আমার মনের সুপ্ত কথা। বুঝে গেছ আমার আমিকে বলা কথায় গাঁথা।

বাইরের দিকে তাকিয়েই বললেঃরাজকুমার কি রাজকন্যে পেয়ে গেলঃ

আমি হেসে বললামঃরাজকুমার রাজকন্যেকে বরণ করে নিলঃ

সেই মুহূর্তে তোমার মনে কি চলছিল জানিনা। আমার মনে জেগে উঠল নতুন একটা স্ফুলিঙ্গের আলোড়ন! একটা নতুন অনুভূতির ধক-ধক করা বুকে

বিবাদহীন শিহরণ। পালসের দ্রুত প্রবাহের অতিরিক্ত কম্পন। আমার মানুষটার ভেতরের সত্ত্বার আর এক নব উন্মোচন।

তুমি বললেওবরণ করে কী কোনো লাভ হলঽ

আমি হেসে বললামওআবার সেই হিসেবের খাতা খুলে বসলে? হিসেবটাকে নয় আমাদের সম্পর্কের বাইরে কলকতার হালখাতায় ফেলে রেখে দিলে। আমরা এখন কলকাতা থেকে অনেক....অনেক....অনেক দূরে..ঽ

ওবেশ তো। তুমি যদি সেভাবেই চাও, তাই হবেঽ

ওলোকসান তো হয়নি। লাভ-লোকসানের হিসেব নয় বাদ-ই দিলাম এ-কঽদিনের জন্য। পড়ে থাক পিছে আমাদের নিজেদের জীবনের উপাখ্যান। এই হিসেবের দৌড়ে আর কতদিন ছুটব বলতে পারে কোনো অভিধানঽ

ওযতদিন এ জীবন আছেঽ বাধা দিয়ে তুমি বলেছিলে আমাকে।

ওতুমি বড্ড বোকাঽ উত্তর দিয়েছিলাম তোমাকে।

ওকেনঽ জানলার থেকে মুখটা ঘুরিয়ে আমার চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করেছিলে।

ওকেউ কি কখনও জেতে? কেউ কি কখনও হারেঽ

ওতাহলে কেন মারামারি করে মরে? এমনও হয় কি বুঝি কখনওঽ

ওএকেবারেই নয়। এ শুধু আমাদের মনগড়া একটা কল্পনার মায়া। শুধুই আমরা নিত্য নতুন পথ খুঁজি সেই কল্পনাকে বাস্তবের ছায়ায়ঽ

ওযদি সব বুঝেই গেলে তবে আবার মাড়ালে কেন আমার ছায়াঽ

দরজাটা আধা ভেজানো ছিল। বেয়ারা ঢুকে বলল ওরাত কা অর্ডার....ভেজিটেরিয়ান ইয়া নন-ভেজিটেরিয়ানঽ

ওনন-ভেজিটেরিয়ানঽ তুমিই জবাব দিয়েছিলে মনে হয়। বেয়ারা সীট নম্বরের পাশে রাতের অর্ডার নিয়ে চলে গেছিল।

ট্যু বার্থ র্ফাষ্ট ক্লাস এসি কেবিন। রাতে দরজা বন্ধ করলেই আমাদের নিজস্ব পৃথিবী। একেবার লাইনের শেষ কিউবিকেলটা। হয়ত নামের ছটায় দুরন্ত-ঘুমন্ত-বসন্ত - কবিগুরু রেলের মতন, এর নামওহনিমুন কেবিন্থ্ হয়েও যেতে পারে কোনোদিন। মনে মনে হাসলাম। আমাকে সুযোগ দেওয়া হলে পৃথ্বিরাজ সংযুক্তা নাম দিতাম। ওরা তক্কের খাতিরে বলতওলায়লা মজনু্থ। নামটা যাই হোক না কেন, স্বাধীনতাতে যে কোনো হস্তক্ষেপ নেই, সেটা অনস্বীকার্য।

তুমি বেয়ারা যাওয়ার আগে ওর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেওচায় মিলেগাঃ্

ওকেউ নেহী? অভী আ রহা হ্যয়। চায় ঔর প্যাটিস ইয়া চিকেন স্যান্ডুইচ্থ

ওচিকেন স্যান্ডুইচ্থ্ লক্ষ্য করলাম খাবার অর্ডারের ব্যাপারে তোমার কোনো দ্বিধা নেই।

বেয়ারা বেরিয়ে গেছিল। কোনোদিন কী শাঁখরাইলের পাড়া-গাঁয়ের ছেলে পুকুর পাড়ে বসে র্ফাষ্ট ক্লাসে চড়ার স্বপ্ন দেখেছিল? তো তাও আবার ট্যু কিউবিক্যল বার্থে কোনো অচেনা মহিলার সঙ্গে নির্জনে?

ডান দিকে জানলার বাইরে তাকাতে হঠাৎ একটা নীলচে কালো রক্তিম আভা বুঝিয়ে দিল সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। ট্রেনের মিউসিক সিষ্টেমে বেজে চলেছে কোনো এক রাগের মিষ্টি সুর।

আমি বলেছিলামওকি রাগ বলতে পারবেঃ্

ওরাগ মিয়া-কি-টোড়ি্থ নির্দ্বিধায় উত্তর দিয়েছিলে আমাকে।

ওঢপ মারছ্থ মুচকি হেসেছিলাম মনে হয়।

ওমোটেই না। এক সময় সেতার শিখতাম। তুমি তো সে-কথা জানন্থ্ তুমি প্রতিবাদ করেছিলে।

কে জানে? সেতার অবশ্য খুব-ই শুনি। তবে রাগ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নেই বললেও কম বলা হবে, সেকথাও নিজে মানি। অবন্তিকা কি কোনোদিন সেতার

শুনেছে? বিবাহিত জীবনে তো কোনোদিন সে দেখার সৌভাগ্য হয়নি আমার। ইচ্ছেও প্রকাশ করেনি কোনোদিন, করেনি ডোভার লেন মিউসিক কনফারেন্সে যাবার আবদার। বুঝবেই বা কী করে? যার জীবন সিরিয়ালের প্রলাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তার কাছে রাগের আলাপটা বিলাসিতার অর্থহীন স্বর্গ।

চায়ে চুমুক দিয়ে স্যান্ডুইচটা যেই না কামড় দিয়েছি, হঠাৎ আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিটা মিলিয়ে যাওয়ার সাথে, আকাশে মিটিমিটি করে তারা ওঠার আগে, দুম করে ট্রেনটা থেমে গেল।

কী হল?!

বেশ কিছুক্ষণ নীরবে বসে স্যান্ডুইচ আর চা শেষ করে কারণটার কথা ভাবছি, তুমি বললে ‘দেখোনা কী হয়েছে?’

এখনও যখন ট্রেন ছাড়েনি কিউবিক্যল থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম অনেক যাত্রীরাই এটেনডেন্টকে ঘিরে ফেলেছে।

‘কেয়া মালুম সাহাব? দেখিয়ে কোই লাইন কা ফিস প্লেট খুল রখা হ্যয়। ইধর তো ঐসে হী চোরি হোতা হ্যয়।’

যদি তাই হয় তবে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে অনিবার্য রক্ষা। কিন্তু ডাকাতের ভয় প্রাণের ধড়ফড় দ্বিগুন হয়ে গেল। ততক্ষনে তুমি এসে দাঁড়িয়েছ আমার পেছনে।

‘কী হয়েছে?’

‘বোধহয় কেউ ফিস-প্লেট খুলে নিয়ে গেছে।’

আমার কাঁধ ঘেসা স্বপ্ন -ওড়া পাখিটার শ্বাস-প্রশ্বাসে একটা দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে পড়ল। তুমি কিছু না বললেও বেশ বুঝতে পারছিলাম, মনে মনে একটা আশঙ্কা কাজ করছে।

‘ইশ্! বড় জোর বেঁচে গেছি।’

যাত্রীদের মধ্যে যখন এই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছে, হঠাৎ এক পুলিশ বাহিনী আমাদের কিউবিক্যলের পাশের দরজা খুলে ঢুকল। সঙ্গে গোটা কয়েক জি.আর.পি। প্রত্যেকটা কিউবিক্যলে উঁকি মারছে। ঠিক তল্লাশি নয়। কাউকে যেন খুঁজছে। কম্পার্টমেন্টের শেষের ওপাশের দু-কামরার কিউবিক্যলটায় শেষ পর্যন্ত পেয়ে গেল ওদেরকে। যার জন্য এই ট্রেন থামা তাদেরকে।

দুই যুবক-যুবতী। পুলিশ দেখে একটু হকচকিয়ে গেছে। ওদের মধ্যে যে সিনিয়ার অফিসার ওদের কামরায় ঢুকে বললওতুমহে থানে মেঁ জানা হ্যয়ৼ

ওকেঁওৼ যুবকটি প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল।

ওও জানে সে হী পতা চলেগাৼ

ওহমলোগ তো কোই গলতি নেহী কিইৼ যুবকটি আবার প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল।

ধমকে উঠল পুলিশ অফিসারটিওরুক্সানা কো লে কর ভাগ রহে থে, ঔর বোলতা হ্যয় গলতি নেহী কিইৼ

রুক্সানা বলে মেয়েটি বললওহামলোগ সাদী কিই হ্যয়। দেখিয়ে হামারে পাস ম্যরেজ রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট ভী হ্যয়ৼ

রুক্সানার কথায় কর্ণপাত না করে পুলিশটি বললওআরে ছোড়্ ইয়ে সব সাদী কা বাহানা। পৈসে দেনে সে শও সার্টিফিকেট ঐসে হী মিল যাতা। চলো পুলিশ চৌকি মে। পাপা ইনতেজার কর রহা হ্যয়ৼ

র্ফাষ্ট ক্লাস এসি স্লীপারে যখন উঠেছে অবস্হা নেহাত খারাপ নয়। তুমি মেয়েটির সজল চোখের দিকে কি চেয়েছিলে? কী না হয় এই দুনিয়াদারির পৃথীবীতে? বৈধ বিবাহ মুহূর্তের মধ্যে অবৈধ করে দিতে পারে আমাদের সভ্য সমাজ। তবুও সেই চিরন্তন সত্যকে সামনে রেখে, ঢালের মতন আভরণ পরিয়ে, ঘোমটার অন্তরালে খেমটা নেচে চলেছে সকলেই....আমাদের সামাজিক সভ্য প্রগতিশীল সেই সমাজ। অনেকটা ডুগডুগি বাজানো বাঁদর নাচের মতন।

বিয়ে নামক লাইসেন্সটার অর্থ যেন কেমন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে সত্যি প্রেমের বলিদানে। হাজারটা বিবাহিত জীবনের অন্তরালে , হয়ত মোটে দু-এক টুকরো প্রেমের অনুভূতি আজও লুকিয়ে আছে। হয়ত-বা তাও নয়। হয়ত এই যুগল তার সাক্ষাৎ নিদর্শন। সেই নিদর্শনকে বলিকাঠে চড়াতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করেনা আমাদের গন্য মান্য জঘন্য সমাজ।

তাহলে কাগজের ওপর দুটো সাক্ষর দিয়ে সাত পাঁকে বাঁধতে চাইছে কেন মনটাকে? উড়ুক না সে নিজের মতন খোলা পৃথিবীর আকাশে। উড়িয়ে তুফানে নিজের প্রাণটাকে। সপ্তম সুরের মালা দিয়ে গাঁথা নিজের অঙ্গীকারের কল্পনাকে।

সজল চক্ষু রুক্সানাকে আর তার সদ্য-বিবাহিত ভীত সন্ত্রস্ত স্বামীকে, কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে নিয়ে গেল ওরা। তোমার মনে তখন কী চলছিল, জানিনা। আমার মনে বেজে চলেছিল, এই বলয়ের বৈধতার দামামা। সে দামামা হয়ত রাগেও বাজায়নি। সে লহরা আল্লা রাখা থেকে গোবিন্দ বসু শুনতে পেরেছিল কিনা, কে জানে?

আমাদের এই যাত্রার বৈধতার সংশয় ঘুচে গেল মন থেকে সেই মুহূর্তে। বাস্তব ছাড়িয়ে পড়ল কল্পনার উদ্ভাসিত আলোকে। কল্পনা নিয়েই তো তোমার স্বপ্ন দেখেছিলাম আমি।

শুধুই তোমাকে....

এখন যেন সেই কল্পনাই নিজের তানে বন্দনাগান গাইছে নতুন চেনা সুরে। তোমাকে কাছে পাওয়ার অভিলাষা নিয়েই তো এই পথ চলা। তবে কেন মায়ার রং ছেড়ে আজকের মূর্খ পৃথিবীর পথের ভাষা বলা?

সেই বিয়েবাড়ির পর কত বিনিদ্র রাত্রি কেটেছে তোমার স্বপ্নের । আজকের ট্রেনের সামাজিক ছবিটা চেতনা দিল আমার মনের অবচেতনে। বৈধতা কোথাও কুরবান হয় সামাজিক চাপে। আমরা হয়ত উড়ে বেড়াই অলক্ষ্যে সেই বৈধতা ভুলে অন্তরের নিভৃত আড়ালে।

ট্রেন আবার চলতে শুরু করেছে অর্নির্দিষ্টের পথে। আমারা আবার ফিরে এলাম রুদ্ধ দ্বার কক্ষে। মিয়া-কি-টোড়ি এখন মিশে গেছে বেহাগের সুরে। হয়ত বা এই ছোট্ট ঘটনাটি ছাপ ফেলেছে তোমার দ্বন্দের না-ছোঁয়া আলোকে। সেই দ্বন্দ ফুটে উঠল তোমার প্রশ্নের সন্ধ্যাপ্রদীপে।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেওআমার পরিচয় জানতে ইচ্ছে করেনাঃ

ওনাঃ সংক্ষিপ্ত উত্তর।

ওকেনঃ

ওজেনেই বা কী লাভ বলত? সেখানেও তো সেই হিসেবের চেনা অঙ্ক। এই যা দেখলে, তার অন্য কোনো এক ছন্দঃ

যে অঙ্ক থেকে পালাতে চাইছি বারবার। তাকে আবার ফিরিয়ে আনা কেন শত রূপে শতবার? চলোনা দুজনে উড়ে যাই বাধন ছিন্ন করে। নিজেদের মনকে আবার নতুন করে খুঁজে ফিরি আমাদের মনের দ্যূলোকে।

পড়ে থাক, না-বলা অনেক কথা। পড়ে থাক, আমাদের জীবনের না-পাওয়া অনেক ব্যথা। পড়ে থাক, না-বলা কথার কাঁটায় ভরা ফেলে আসা পৃথিবীটা। এখন শুধু আমরাই ঘুরব আপন মনের বৃত্তের বাইরে। পড়ে থাক, জীবনের যত চোরাবালি।

আমার বোতামের চাপেও এখন আর ফুটবে না কম্পিউটারে নতুন কোনো শব্দের কলি।

তোমাকে

কৌস্তভ



চতুর্থ চিঠি

কৌস্তভ

বিয়ের স্বপ্ন তখনও দেখিনি আমি।

প্রেমের তো নয়ই। দু-একটা ছেলে যে আসে-পাশে উশখুশ করেনি এমনও নয়। দেখতে তো নেহাত খারাপ ছিলাম না কোনোদিন। নীল স্কার্ট আর সাদা টপস্ পরে যখন কারমেল কনভেন্টের বাস থেকে নেমে স্কুলে ঢুকতাম, ব্যঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় ওঠার সিড়িতে, নানাদার পানের দোকানের পাশে বসে থাকা যাদবপুর ইউনির্ভাসিটির ছেলেগুলোর, ড্যাবড্যাবে চোখে তাকিয়ে থাকা বুঝিয়ে দিত, আমার যৌবন বাড়ন্ত । সেটা কি, যে কোনো উঠতি মেয়ের প্রতি যে কোনো ছেলের আকর্ষণ? না কি, আমার প্রতি একটু বিশেষ আকর্ষণ? সেটা বোঝার ক্ষমতা ছিলনা আমার। আর থাকলেই বা কী? গায়ে পড়ে তো আর জানতে যাবনা? যদিও মনে মনে ভীষণ ইচ্ছে করত, কেউ অন্তত একবার উঠে এসে একটু কথা বলার চেষ্টা দেখাক।

দাদার বন্ধুরা তো হামেশাই আকারে ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইত সে কথা। তবে সেরকম ভাবে নয়। আমি যখন এগারো-বারো তে পড়ি, তখন ওরা রীতিমত আই.আই.টি র ইঞ্জিনিয়ার।

লাজপত রায় হল থেকে ফিরে সীতেশদা তো হাঁকই দিল্ঙএই পুচকে, একটু চা করে খাওয়াবিঃ্

কিন্নরদা একটু সহানুভূতির সঙ্গে বলল্ঙওকে পুচকে বলিস না সীতেশ। ও তো এখন বড় হয়ে গেছে। মনে কষ্ট পাবে্

বুঝতে পারতাম ওরা আমাকে এত ছোটো বয়স থেকে দেখেছে, যে আমার বড় হয়ে ওঠাটা ওদের চোখ এড়িয়ে গেছে। একদিকে ভালোই। কেউ প্রেমে পড়ে গেলে আবার আর এক মুশকিল হত। এমনিতেই ওদের কাউকে আমার বিশেষ করে কখনওই তেমন পছন্দ হয়নি। তার ওপর আবার ঘাসিকালচার ইঞ্জিনিয়ার....থুড়ি আই.আই.টি ভাষায় ওটা এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ার।

সেই বয়সে নিজের যৌবনকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার মধ্যে মনে মনে একটা স্বতন্ত্রতা খুঁজে পেতাম। নিজেকে বেশ দামি দামি লাগত। এই নিজেকে দামি করে রাখার উন্নাসিকতায়, নিজের দূরত্ব বজায় রাখতে গিয়ে, আর প্রেম করা হয়েই উঠল না।

কলেজে উঠে ব্যাপারটা কিন্তু একেবারে পালটে গেল। যাদবপুর ইউনিভার্সিটির কফি হাউসে ছেলেদের সঙ্গেই আড্ডা মেরে কেটে যেত দিনের অতিরিক্ত তাদের সঙ্গে আবার প্রেম করা যায় নাকি?

মন তো তেমন করে কাউকে কাছে চায়নি....টানেনি....ভালোবাসতে পারেনি। বিশেষ করে যখন আমি ইকনমিক্সের ছাত্রী। প্রেমের কেমেষ্ট্রি-টা বুঝবোই বা কী করে? তাই স্কুল-কলেজ-ইউনির্ভাসিটির গন্ডি পেরিয়ে যৌবনটা এসেও তার পূর্ণ স্বাদটা আধুরা থেকে গেছিল, মনের অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে।

ইকনমিক্সের মাস্টার্স শেষ করে ভাবছিলাম আমেরিকা যাব। ডক্টরেট করার ইচ্ছেটা কোনোদিনই ছিলনা। হয়ত যাদবপুরের মেয়ের পক্ষে আমেরিকা যাওয়ার ইচ্ছেটা নিছক-ই একটা স্বপ্ন ! তবুও ছোটোবেলা থেকেই স্কুলে যাওয়ার সময়,

সেই স্বপ্নের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতাম। স্বপ্নটাকে বাস্তবে রূপায়িত করার মতন করে আদা-জল খেয়ে কখনও লাগিনি। যা হয়ত কোনোদিনও সম্ভব হবেনা।

তবুও....

স্বপ্ন দেখতে তো ক্ষতি নেই?

বাবা বলত: ‘স্বপ্ন না দেখলে কিছু হয়না’।

তাই বুকভরে যাদবপুরের বাদেরাইপুরের বাবার ছোট্ট ফ্ল্যাটে বসে জানলার গরাদ ধরে স্বপ্ন দেখতাম। খোলা আকাশটার দিকে তাকিয়ে। দমদম থেকে উড়ে যাওয়া উড়ো-জাহাজটার দিকে তাকিয়ে মন ভেসে যেত সুদূর আমেরিকার পথে। ওটাই স্বপ্নের নগরী। ওরা বলত, ওখানেই নাকি ভবিষ্যৎ তৈরি হয়।

‘ছুটি’ একদিন বাবা কাজ থেকে ফিরে, জামাটা খুলে আলনায় ঝোলাতে ঝোলাতে, মাকে বলল।

মা ঠিক বুঝতে পারেনি। চায়ের পেয়ালাটা এগিয়ে দিয়ে বলল, ‘কীসের ছুটি?’

‘কাজের। ভুলে গেছ আজ আমার রিটায়ারমেন্টের দিন?’

ফুলের তোড়া আর রিটায়ারমেন্টের সাক্ষর অফিসের লোক নামিয়ে রেখে গেল বসার ঘরের বেতের সোফায়। একটা দীর্ঘ কর্মঠ জীবনের ইতি টেনে দিল একটা মেডেল আর ফুলের তোড়ার উপঢৌকন।

‘তার মানে?’ মা তখনও ঠিক কঠিন বাস্তবে ফিরে আসতে পারেনি।

‘কাল থেকে আর কাজে যেতে হবেনা’।

ধরাস্ করে বুকটা কেঁপে উঠেছিল আমার। খাটের ওপর শুয়ে বইটাকে উলটে, বাবার দিকে তাকালাম। বাবা তো আমাকে আগে বলেনি রিটায়ার করছে। আমি বোকার মতন খাটে শুয়ে স্বপ্ন দেখে যাচ্ছি সুদূর আমেরিকার গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের! ঝট করে স্বপ্নটা হাওয়ায় হারিয়ে গেল, বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলতেই। নেমে এলাম কঠিন রূঢ় বাস্তবে

ওকাল থেকে পেনশনের টাকায় সংসার চলবে্

ওমানেই্ মা শাড়ির আঁচলটা দিয়ে কপাল মুছতে মুছতে বাবার পাশে বসল।

মা যে কী না! এমন বোকার মতন প্রশ্ন কেউ করে? না কি কিছুটা ভ্যবাচ্যাকা খেয়ে গেছে আর্থিক দিকের কথা চিন্তা করে? যদিও পেশায় বাবা ডাক্তার, কখনও ডাক্তারি প্র্যাকটিস করেনি। ডি.ভি.সির মাইনে করা ডাক্তার হয়ে সারাজীবন কাটিয়ে দিয়েছে।

চেয়ারে বসে খালি গায়ে চায়ের পেয়ালাটা হাতে নিয়ে, টাকে হাত বোলাতে বোলাতে বাবা বললওআমার কর্মজীবনের এখানেই শেষ। যখন সারাজীবন প্র্যাকটিস করিনি রিটায়ারমেন্টের পর আমার আর প্র্যাকটিস হওয়ার কোনো চান্স নেই। তাই এখন ওই পেনশনই একমাত্র ভরসা্

হঠাৎ যেন স্বপ্নের পৃথিবীটা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আমেরিকার উড়োজাহাজ যেন হঠাৎ-ই ক্র্যশ ল্যন্ডিং করল যাদবপুরের দোতালার ছোট্ট ফ্ল্যটে। স্বপ্নটা নেমে এল বাস্তবের দোরগোড়ায়। চূরমার করে দিল আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায়। এর পরে কি প্রশ্ন উঠবে তাও জানি। আমেরিকার স্বপ্নের র রূপসজ্জার আশা হারিয়ে যাবে বাসরের আতুরঘরে।

প্রশ্নটা যেন অপেক্ষা করছিল। শুধু মুহূর্তের প্রতীক্ষা। বাবা রিটায়ার করলে বাবা-মায়েদের মনে একটাই প্রশ্ন খেলে বেড়ায়। সোমত্ত মেয়েরটার বিয়েটা তো এখনও বাকি পড়ে আছে! আমেরিকা হোক আর দেশের ত্রিপুরার ইনষ্ট্রুমেন্টশন ইঞ্জিনিয়ার হোক, মেয়েকে পাড় করাটাই তখন মুখ্য কর্তব্য। যতই প্রগতিশীল হোক না কেন আমাদের সমাজ, জীবনটাকে কবিগুরুরওচার অধ্যায়্ এর বলয় বাঁধবার মধ্যেই যেন নারী জীবনের স্বার্থকতা !

যুগ পালটে যেতে পারে। ধর্ম ক্রুসেডের আকারে জেহাদ ঘোষনা করতে পারে। ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন রেনেসাঁ আনতে পারে। পুরোনো পৃথিবীর স্বপ্ন মনকে নিঙড়ে ধূলিস্যাৎ করে নতুন পৃথিবীর রং আঁকতে পারে....কিন্তূ পৃথিবী এগিয়ে চলে সেই

অলিখিত শাশ্বত পথ ধরেই! শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে ভালোবেসেও বিতাড়িত হয় রাজলক্ষ্মীর নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের ঘেরাটোপ থেকে, ভবঘুরে পৃথিবীর বাউন্ডুলে জীবনে। সিঁথিতে সিঁদুরের বহ্নি শিখা না লাগালে প্রেম-ভালোবাসা সব নিরর্থক।

কাহিনিটা তো সেই এক। সব কিছু কবিতা, সাহিত্য, গল্প পালটে যায়। কিন্তু বাস্তবে পৃথিবী এগিয়ে চলে তার আপন গতির পথে। সংসারের ধরা-বাঁধা নিয়মের ছকে।

সেখানে মায়ের সম্বিত ফিরতে হয়ত কিছুটা সময় লাগবে। মা স্বপ্ন বোঝেনা। মা বাস্তব কে চেনে। সেদিনও হয়ত ঠিক বাস্তব টাকে মেলাবার চেষ্টা করছিল এই আকাশচুম্বি ইনফ্লেশনের বাজারে। হাজার হোক, সংসার তো তাকেই চালাতে হয়!

একবার আমার দিকে তাকিয়ে, বাবার দিকে ফিরে বলেছিল ওর কী হবে গো

প্রশ্নটা হয়ত অনেকদিন ধরেই মনের ভেতরে উঁকিঝুকি মারছিল। উত্তরটাও হয়ত এসে পড়ত। যদি কোনো এক রাতে আমি এসে বলতাম প্রবালকে বিয়ে করব

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নের ঝড় বয়ে যেত কে প্রবাল? কী পড়াশোনা করেছে? কী করে? বাড়িতে আর কে কে আছে? নিজেদের পৈতৃক বাড়ি তো? না ভাড়া বাড়ি জানি সব প্রশ্নের সদুত্তর না বেরলেও একটা সমঝোতা হয়ে যেত। কণ্যাদায় থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আশায়....

তারপর কোনো এক ফাল্গুন মাসে, শুভ লগ্নে মালাবদল করে শুভদৃষ্টি হয়ে যেত। অগ্নি সাক্ষীর হোমে মিথ্যে মন্ত্র উচ্চারণ করে পবিত্রতার সাক্ষী নেওয়া অগ্নি সাক্ষরের ওপর, টকটকে লাল সিঁদুরের লাইসেন্স মেরে দিত পাড়া-পড়শী।

ভালোবাসার লাইসেন্স! প্রেমের লাইসেন্স!

আত্মীয়-স্বজন কেটারের সাজানো খাওয়া পেট পুরে খেয়ে, আমাদের আর্শীবাদ করে রাতের মতন বিদায় নিত ওরা। ফুলশয্যার বাসরে প্রবাল আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করত, চুমো খেত। সেই রাতের সম্ভোগের মধ্যে আমাদের

সভ্য সমাজ ভালোবাসার, ভালোলাগার পান্ডুলিপিতে মোহরের সীল বসিয়ে দিত আজীবনের জন্য চিরকালের চেনা গতে।

কিন্তূ পাগলা মনটা যে সর্বদাই ছুটে চলে স্বপ্নের খোঁজে। জীবনের হাট থেকে স্বপ্নের বাসর ঘর যে বহুদূর। সেখানে প্রবালের মতন হাজারও ভালো ছেলে থাকতে পারে, কিন্তূ সেখানে তো আমেরিকা নেই। আমি তো আমেরিকাকে খুঁজছিলাম। প্রবাল, তিমির, সৌরভ, দ্বিজমান সব এক একটা সুযোগ্য নাম। এরা তো আমার স্বপ্নের র নিভৃতে গড়া শিব নয়। শুধুই নিশ্চিন্ত আচ্ছাদনের একটা সংরক্ষিত ধাম।

আমার দিকে ফিরে বাবা বলল্ওএই বছরই তো তোর শেষ। তাই নাঽ

আমি খাটে বসেই, বই থেকে মুখ না তুলে মাথা নাড়লাম। শুধু যে আমার ইকনমিক্সের শেষ তা নয়....বেশ অনুভব করছিলাম, আমার স্বপ্নেরও সেই সঙ্গে যবনিকা পড়তে চলেছে।

বাবা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল্ওওর বিয়েটা দিয়ে ফেলতে হবে। তারপর যে করে হোক বুড়ো-বুড়ি চালিয়ে নেব কোনো ভাবেঽ

একবার যে শেষ চেষ্টা করিনি, তা কিন্তূ নয়। বই থেকে মুখটা তুলে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম্ওএখন বিয়ে না করলেই কী নয়ঽ

চায়ের কাপটা কাঁচের টেবলের ওপর রেখে বাবা বলল্ওতো কী করবিঽ

বইটা খাটের ওপর রেখে, উঠে বসে বললাম্ওআমেরিকা যাবঽ

ওটাকাঽ

ওপ্যাসেজ ফেয়ারটা দাদা দিয়ে দেবে। আমার জি.আর.ই পরীক্ষায় পাশ হয়ে গেছে। ওখানে গিয়ে পি.এইচ.ডি করবঽ

ছেলে-মেয়ে দুজনেই দেশের বাইরে থেকে যাবে, মন থেকে পুরোপুরি সায় না দিলেও, বিশেষ করে শেষ বয়সে গিন্নিকে কে দেখবে, এই কথা ভেবে একটা

দোটনা চলছিল বাবার ভেতরে ভেতরে।

তবুও....

নিজেদের সুবিধার জন্য তো আর সন্তানদের ভবিষ্যৎকে থামিয়ে রাখা যায়না?

কিছুটা অনিচ্ছা সত্বেও আমার দিকে তাকিয়ে উদাসীন ভাবে বললঃতোরা এখন বড়ো হয়েছিস। যা ভালো বুঝবি তাই কর্।

ভালো ক্জন মানুষ বোঝে? মনে মনে ভাবলেও চিত্রনাট্যটা তো উনিই আগে থেকেই লিখে রেখেছেন। আমরা বাধ্য স্তাবকের মতন কৃতিত্বের মিছেই আস্ফালন করে মরি।

সেই যৌবনের আস্ফালনে বাবা বাধা না দিলেও, হঠাৎ স্যু অর্বিভূত হল দাদার জীবনে। আর্বিভাব শুধু নয়, আমার ইকনমিক্সের স্নাতকোত্তর পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই, ওদের গাঠছড়া বাঁধা হয়ে গেল দেশি থেকে বিদেশি কায়দায়। এদের সদ্য বিবাহিত হনিমুনের সংসারে, আমি বাড়তি ভিড় বাড়িয়ে কেনই বা ওদের আর্থিক টালমাটালে ফেলব?

অতএব স্বপ্ন রয়ে গেল স্বপ্নের আকাশের অনন্তে। আমি পড়ে রইলাম আমার না-পাওয়া স্বপ্নের বন্ধনের শিকলে জড়ানো আবদ্ধতায় দেশের মাটির অন্ধকারে। সৈকতের বাহুর বন্ধনে।

স্বপ্ন থেকে ঘর। মুক্তি থেকে বন্ধনের স্বর্গ! পাওয়ার অভিলাষা থেকে নিজেকে উজার করে দেওয়ার এক অবিরাম প্রয়াস। আমার জীবনের স্বপ্ন কে মিশিয়ে দিতে চাইলাম, অন্যকে পূর্ণ করার চিরপরিচিত বলয়-এর আবর্তে।

সৈকতের কাছে সংসার যেন একটা জীবনের এক অলিখিত রীতি। তাকে না মানলেই সমাজের কাছে প্রচ্ছন্ন এক ভীতি। অগত্যা করতে হবে বলেই শুধু করা। আমি বন্ধনের আবর্তে মানসিকভাবে ছন্নছাড়া।

ওতোমার সংসার। তুমি চালাও৺ বিয়ে করতে হয় বলে, বিয়ে করা। বউকে সম্মান দিতে হয়, তাই দেওয়া। তাই সংসারের দ্বায়িত্বটা অনায়াসে তার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে হারিয়ে যাওয়া যায় নিজের কাজের মধ্যে।

কাজ আর শুধু কাজ!

আমার মানুষটা তো দূরের কথা, আমার শরীরটার দিকেও তাকাবার আবকাশ ছিলনা সৈকতের। তবে কি আমি পাতযোগ্য নই? দৈহিক চাওয়া যেন নিভে গেছে বাসর রাতের সূর্য্য ওঠার প্রাতে। সময় কই? এমনিতেই তো বিয়ের জন্য কত কাজ বাকি রয়ে গেল। এখন তো ফুলশয্যেও শেষ হয়ে গেল। শুধু দ্বিরাগমনটাই কেবল মাত্র বাকি।

কে আমি?

আমার সাংসারিক পরিচয় অগ্নি সাক্ষীর হোমের মধ্যে লেখা হয়ে গেছেওযদিদং হৃদয়ং তব যদিদং হৃদয়ং মম৺। যুগযুগান্তর ধরে কতগুলো সংস্কৃত পুরোহিত কিছু ভাষা দিয়ে মানুষের মনটাকে বেঁধে ফেলতে চেয়েছে, এক না-জানা ভালোবাসার সামাজিক বন্ধনে। ইংরেজিতেও কোনো এক ধর্ম বলে গেছেওইন সিকনেস অর ইন হেলথ, ইন রীচনেস্ অর ইন পর্ভাটি আনটিল ডেথ ড্যু আস এপার্ট৺ বিদেশি সভ্যতার ব্যবসায়িক পরিব্যাপ্তি তার জাগতিক কায়ার অঙ্কে ভালোবাসাকে বন্দি করে ফেলেছে বন্ধনের পৃথীবীতে।

ওরা ভাবে কী? কতগুলো মন্ত্র পড়লেই ভালোবাসা হয়ে যায়? আর আগেকার পুরোনো বাংলা সিনেমার মেলোড্রামার মতন সেই মন্ত্রের পুনরাবৃত্তির অগ্নি সাক্ষী কি এক অপরিচিত অতীতকে, বর্তমানের হৃদয়ডোরে অবার কখনও নিয়ে আসে?

জানিনা।

যুগের হয়ত একটা বিবর্তন হয়েছে। সঙ্গে নারী স্বাধীনতার চেতনারও। চেপে রাখা আকাঙ্খাটা যেন মনের নিভৃত কোন থেকে বারবার সমাজের নাগপাশ

ছেঁড়ে বেড়িয়ে আসতে চাইছে, ভেসুভিয়াসের মতন একটা সুনামি হয়ে।

সৈকতের তো আমার দিকে তাকাবারও অবকাশ ছিলনা। মন তো পড়ে আছে পৃথিবীর অন্য আরেক প্রান্তে । আমার স্বপ্ন ডানা-কাটা পাখির মতন ঝাপটাচ্ছে, একটু পাওয়ার আশায়। সেটা যেন হঠাৎ-ই আছড়ে পড়ল কঠিন বাস্তবের ধূসর মরুভুমির সাহারায়। পড়ে রইলাম আমি নিজের বাসরের একাকী নিভৃত অন্ধকারে।

তবুও সেই সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতার মধ্যে আমি নতুন আকাশে রামধনু আঁকতে চেয়েছিলাম....সৈকতেরই সঙ্গে। সীমাবদ্ধতার মধ্যে, নতুন তুলির টানে সপ্ত রং -এর ছটা ছড়িয়ে।

একবার সৈকতকে বলেওছিলাম“চলোনা কোথাও বেড়িয়ে আসি”

“তুমি যাও। তোমার মা-বাবাকে নিয়ে। তোমার বাবা রিটায়ার করেছেন। ওনাদের এখন প্রচুর সময় আছে হাতে। আমাকে এখন চেন্নাই ছুটতে হবে”

“তুমি যাবেনা?” চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে আয়না থেকে মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম।

সৈকত ফাইলের পাতাগুলো ওলটাতে ওলটাতে বলেছিল“বললাম তো। এখন আমার যাওয়ার ফুরসত নেই”

বেড়ানো হলনা। একতলার জানলার ফাঁক দিয়ে দুপুর কাটিয়ে রাতে“ট্র্যাভেল এন্ড লিভিং” চ্যনেল দেখে আমার বেড়ানো শেষ হয়ে গেল নাকতলার বসার ঘরের প্রাঙ্গনে। পড়ে রইল আমার একাকী জীবনের শূন্য বাসর শয্যার রজনীগন্ধাহীণ আসরে।

কম্পিউটার নিয়ে নাড়াচারা করতে করতে মনে হত দিনটা বুঝি বড্ডই বড়। মাঝরাতে ঘুমভাঙা দেহটাকে নিয়ে ছটফট করতে করতে পাশের বাড়ির বারান্দার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হত, হয়ত বা ওখানেও একফালি আকাশ আছে। চাঁদের মিঠে জ্যোৎস্না যেন ও-বাড়ির দাওয়া ভরিয়ে দিয়েছে।

ক্যালিডিওস্কোপের মতন আলোর হোলি খেলে যাচ্ছে অন্ধকার আকাশের বিসতৃতে। শেষ রাতের মালকোষের সুরে। ভৈরবীর রাগ যেন হারিয়ে গেছে আমার জীবন থেকে। এ বাড়ির ইট-পাটকেল সাজানো পৃথিবীটার মধ্যে সি.ই.এস.সি লোড-শেডিংহীন আলোকিত ঘরে, শুধুই যেন একটা বুকফাটা শূন্যের অন্ধকার।

যৌবন তো মুছে যায়নি। বেদের মন্ত্রোচ্চারণকে পেছনে ফেলে নিজের সদ্য যৌবনা দেহটার আশ তো তখনও সংসারের হাঁড়িকাঠে মৃত্যুবরণ করেনি। ভিজে যাওয়া নীচের উন্মাদনাটা যেন মুক্তি খুঁজছে অহল্যার মতন। কখন রামচন্দ্রের পায়ের ধুলির স্পর্শে স্বাভাবিক নিয়মে মুক্তি পাবে? আবার পাষাণ তার প্রাণ খুঁজে পাবে নতুন উন্মাদনায়! শুধু একটা আভরণহীন মন। আবরণ খুঁজছে। কিংবা হয়ত বা তাও নয়। দেহ যেন খুঁজছিল সরগমের নিখাদের জলপ্রপাতের বহিঃপ্রকাশের একটা উন্মুক্ত আকাশ। ঝর্ণার মত ভাসিয়ে স্নিগ্ধ শান্ত করে দেবে আমার উদ্বেল মনের অবকাশ।

সেই চাওয়াটাকে যেন আর বেঁধে রাখা যাচ্ছে না। পৃথীবীতে কটা মেয়েই বা তা পারে? সীতা যদি পঞ্চপান্ডব নিয়ে অগ্নির মধ্যে থেকে পবিত্র হয়ে বেরিয়ে আসতে পারে, আমিই বা পারব না কেন?

বনবাসে তো আর কেউ নেই!

আমি একা!

একদিন অজান্তে সেই বনবাসের একাকীত্বের বাঁধ ভাঙল। ইউনির্ভাসিটির বন্ধু তিমিরের পুরোনো প্রেম বোধহয় তখনও আমাকেই খুঁজছিল।

আমাকে? না কি, আমার না পাওয়া অবয়বটাকে?

বুধবারে বিগ-বাজারের ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে তিমিরের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। চিনতে পারছিস?

তিমিরের গলার শব্দে পেছন ফিরে তাকালাম। আমার সম্পূর্ণ অবয়বটাকে সুর্য্যপ্রদক্ষিণের মতন আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বলল ওজমিয়ে সংসার করছিস। ওজনও একটু বেড়েছে বটে

ওবিয়ের রস পড়লে একটু ওজন বাড়ে বৈকি মুচকি হেসে তিমিরের চোখের দিকে তাকালাম। মেয়েরা ঠিক বুঝতে পারে। ওই চাওনির মধ্যে একটা নিঃশব্দ ভাষা কথা বলছে। নিজের ভেতরটা ঝলাৎ করে উঠল সেই মুহূর্তে। ওটা কী আমার অতৃপ্ত চাওয়াটাকে কিছু বলতে চাইছে?

আমার অন্তরের উত্তাপের অগ্নি দগ্ধ আত্মা তখন খুঁজছে....যে কোনো আকারে। যে কোনো পৌরুষ....যার যৌবন আছে....যার মাদকতা আছে....যে আমার সৈকত থেকে না-পাওয়াটাকে পূর্ণতায় ভরিয়ে দিতে পারবে। সে যেই হোক না কেন? নামে কী আসে যায়? অবয়বটা একটা নিমিত্ত মাত্র। যে আমাকে দেশে বসেই উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে, আমার না-পাওয়া স্বপ্নের কায়ালোকে। আমার ধূলিস্যাৎ হওয়া আমেরিকার স্বপ্নকে আবার জাগাতে পারবে, দেহের প্রতিটা কোষের উন্মাদ স্ফুলিঙ্গে।

ওকাল ফ্রী আছিসঃ আমার আঁচল পরিবৃত পায়রার মতন নিটোল স্তনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা ছুড়ে দিল। দৃষ্টিটা কিন্তু এখনও ওই চত্বরেই আটকে পড়ে গেছে।

ওহ্যাঁ। কেনঃ

তিমির আমাকে সিনেমা দেখাল। ভালো হোটেলে খাওয়াল। তবুও তো....কারও তো আমার জন্য একটু সময় আছে। হোক না সে খেয়াল-খুশির খাতা। তাই দিয়েই লিখব জীবনের না-পাওয়া কাব্যগাঁথা। অনেকদিন পর মনটা যেন একটা পরিপূর্ণতার দিগন্তকে ধরবার জন্য হাত বাড়াল।

ওযাবি এক জায়গায়ঃ তিমির প্রশ্ন করল আমাকে।

ওকোথায়ঃ আমার উত্তরে ফিরে তাকাল আমার দিকে।

ওচল্না আমার সঙ্গে

স্পষ্ট করে না বললেও, ইঙ্গিতটা বুঝতে একটুও অসুবিধা হয়নি আমার। এই ইঙ্গিতের দুটোই উত্তর হয় - হ্যাঁ, অথবা না? মন কি বলছিল সেটা বড় কথা নয়। অবয়বটা তার বাসনার পরিপূর্ণতা খুঁজছিল। তখন সেই মুহূর্তে সেটাই আসল সত্য। সতীত্বটা তো আর বাক্সবন্দি করা বিয়ের মখমল পরানো সোনার চাবিকাঠি নয়? যে, বিয়ের মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই বন্দি হয়ে যাবে? তার ব্যঞ্জনাটা তখন ক্রমশ আমার কাছে ধূসর মলিন একটা প্রচলিত প্রথা মাত্র। তখন আমার আমির চাওয়াটা সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেছে।

পুরানের সংস্কারের রীতিগুলো যেন নতুনের ঝোরো হাওয়ার উল্কিতে কেমন পালটে যাচ্ছে। সব জেনেও মনে মনে, মেনে নিতে পারিনা আমরা। মুখে বলি বেদ-উপনিষদ-রীতি-নীতির তত্ত্ব কথা। সব ইন্দ্রিয়গুলো সর্বক্ষণ খোঁজে বেঁচে থাকার নতুন নতুন রসদ। অন্ন, বস্ত্র আচ্ছাদন, এমনকি দৈহিক অভিলাষাটাও। এগুলো যেন বেঁচে থাকার রসদ হয়ে দাড়িয়েছে আজকের এই পৃথীবীতে। এতদিন যা ছিল সুপ্ত, আজ যেন তা আবার আত্মপ্রকাশ করেছে সময়ের ঝড়ে।

তিমির আমাকে নিয়ে গেল বাগুইহাটির ছোট্ট একটা ফ্ল্যাটে। পুরোনো বাড়ির দোতালা। সবুজ দরজা। চলতে পড়া দেওয়ালের চুনটা খসে পড়েছে। ছোট্ট দুটো ঘর। চৌকি পাতা। এটা কি হরিপদ কেরানির আস্তানার মতন কোনো এক কিনু গোয়ালার গলির একটা নিরাপদ আশ্রয়?

সেটাও তো আমার অজানা। জানাটাকে পেছনে ফেলে অজানার পথে পা বাড়িয়েছি যখন। অতো ভেবেই বা কী হবে তখন?

তবে সেটা পরনে ঢাকাই শাড়ি পড়া কোনো না-পাওয়া স্বপ্নের নিঝুম শূন্যতা নয়। বরং ঢাকাই শাড়ি বিসর্জন দিয়ে, আবার নতুন করে উষ্ণ চাওয়াটার কাছে ফিরে যাওয়া। কোনো খরচ বাঁচাবার জন্য অভিলাষা নিয়ে শিয়ালদহে সন্ধ্যে কাটানোর জন্য নয়। ইন্দ্রিয়কে মুক্ত করার এক চমকহীন আচ্ছাদনের রুদ্ধ কক্ষে উন্মাদনার সম্মুখে।

ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, ‘এই ফ্ল্যাটটা কার রে?’

‘আমার এক বন্ধুর।’

‘এখানে নিয়ে এলি কেন?’

তিমির আমার চুলে হাত বোলাতে বোলাতে কাছে টেনে নিয়ে বলল, ‘ন্যাকা ....যেন কিছুই বুঝিস না? তোকে একটু আদর করব বলে।’

সৈকত তো আমায় এভাবে কাছে টেনে নেয়েনি কতদিন। মনে মনে একটা পুঞ্জিভূত কালো মেঘ ছেয়ে গেছিল মনে। তার সঙ্গে বাঁধ ভাঙার একটা নেশার ঘোর। না-পাওয়াকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা।

কোনো কিছু বোঝার আগেই, তার উষ্ণ অধর ডুবিয়ে দিল আমার দিকহীন পালতোলা খোলা নৌকের ভেসে যাওয়া স্রোতে। এক ঝটকায় হাত দিয়ে সরিয়ে দিলাম ওকে। মন বলছিল এটা ভুল, এটা অন্যায়, এটা পাপ। আমার বহুদিনের পুঞ্জিভুত আত্মার চাওয়া বলছিল, আমারও তো কিছু এ জীবনে চাওয়ার আছে। আমেরিকা নয় নাই বা গেলাম। এখানেও তো জীবনের অন্যান্য চাওয়াগুলো ধিক-ধিক করে তুষের আগুনের মতন কতদিন থেকে জ্বলছে। তাকেই বা অস্বীকার করি কেমন করে? না জেনে তো আর এ পথে পা বাড়াইনি।

একটা দোটানার মধ্যে, কিছু বোঝবার আগেই, কখন যে সব কিছু হয়ে গেল....ঘর এসে পড়ল বাহিরে। বিবাহিত জীবন এসে দাঁড়াল জলের ঘটি না-উলটে ঘরের চৌকাঠের অপর প্রান্তে । মধ্যবিত্ত শেখানো সাজানো অর্থহীন মানসিকতাটা যেন দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে হঠাৎ রাস্তায় এসে দাঁড়াল একটকু পাওয়ার নেশায়।

কিছু পেতে হবে - এই মুহূর্তে!

আমেরিকা স্বপ্ন হতে পারে। এটা তো আর স্বপ্ন নয়! আমার সামনের প্রতিটা রোম দিয়ে উপভোগ করা বাস্তব । তাই বাস্তব কে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধতে চাইলাম

দেহের চাওয়ার বন্ধনে। ওখানেই বুঝি আমার যৌবনের স্বর্গ! ওখানেই বুঝি আমার পাওয়ার বর্ণ! ওখানেই বুঝি আমার আসক্তির না-পাওয়ার পূর্ণতা!

তিমির ধরনের পোষাকে নিজেকে সভ্যতার মুখোশ পড়িয়ে বললওআবার কবে দেখা হচ্ছেঃ

ভ্যনিটি ব্যগ থেকে চিরুনি বার করে চুল আচড়াতে আচড়াতে বললামওজানিনা কবেঃ

তিমির আমার দিকে তাকিয়ে বললওতার মানেঃ

ওমানে আবার কী? জানিনা। ইচ্ছে হলে হবে। নয়ত নয়ঃ একটু নিরাসক্ত হয়েই উত্তর দিলাম ওকে। অনেকদিনের বাসনার নিরাসন হয়েছে। চাওয়ার বাঁধ ভেঙেছে। আসক্তির উত্তরটা তো এখনও খুঁজে পাইনি। হুজুগের বসে সব কিছু কেমন হয়ে গেল।

পিল খাইনি....কিছু হবেনা তো আবার? তিমিরের বোঝা এই মুহূর্তের বাইরে সারাজীবন ধরে বয়ে বেড়াতে পারব না আর।

ভাবতে ভাবতে বাড়ি এলাম। সেই ছোটোবেলা থেকে নিজের চাওয়ার এক মুহূর্তের অঙ্গীকার। দ্বিতীয় একটা স্ফুরণ। কিংবা হয়ত প্রথম। কিংবা হয়ত তাও নয়। এখনও বাকি রয়ে গেছে।

তাইত তোমার ডাকে সারা দিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম। পাওয়াটা যদি পূর্ণতা লাভ করে, তবে কী কেউ অর্নির্দিষ্টের পেছনে ছোটে?

তিমির আমার দিকে তাকিয়ে বললওকী হল রে? মুসরে পড়লি মনে হচ্ছে? আমি তো তোকে জোর করে কিছু করিনিঃ

ওনাঃ....আমি তো নিজে থেকেই এসেছিঃ শাড়ির পাটটা ঠিক করতে করতে বলেছিলাম মনে আছে।

হয়ত মনের অজান্তে ক্ষণস্থায়ী আর চিরস্থায়ী অনুভূতির দোটানার আবর্তে ঘুরছিলাম তখনও। আর সেই আবর্তের এডির মধ্যে যেন ভারসাম্যটা মুহূর্তের জন্য হলেও হারিয়ে ফেলেছিলাম ঠিক সেই মুহূর্তে। প্রত্যেক সম্পর্কের একটা পরিধি আছে। ভুত বর্তমান ভবিষ্যৎ। তিমিরকে কোন পরিধিতে ফেলব, নিজেই বুঝে উঠতে পারনি তখন। হয়ত শুধুই বর্তমানের মুহূর্তটুকু। আকাঙ্খা আর চাওয়ার তো কোনো শেষ নেই। চাওয়াটাকে সময়ের ব্যাপ্তিতে বাড়তে দিলেই যত মুশকিল। ওটা অধিকার হয়ে দাঁড়ায় ভবিষ্যতের আলোয়। হয়ত বা প্রবেশ করে অনধিকারের কালোয়। আমি তো বদ্ধতা থেকে মুক্তি খুঁজতে এসেছি। তবে কেনই বা আবার ফিরে যাব সেই বদ্ধতার আবদ্ধে?

রাতে শুয়ে অনেক ভেবেছি। তিমিরকে কি আমি সত্যি সত্যি ভালোবাসি? ভালোবাসলে তো আমেরিকার স্বপ্ন টাকে শিকেয় তুলে রেখে ওর গলায় মালা পড়িয়ে দিতাম অনেকদিন আগে। মন সায় দেয়েনি। দেহ তো মুহূর্তের খেলা। মন তো সুদূরের না-ছোঁয়া ভেসে বেড়াবার ভেলা। বর্তমানের সম্ভোগের সঙ্গে তাকে আত্মার বন্ধনে বাঁধব কী করে?

শুধু ভেতরের উত্তপ্ত একটা অবচেতন চেতনা, বিগ্রহ নয়, জাগ্রত নির্ঝর খুঁজছিল। জলপ্রপাতের ঝর্ণার বাঁধ যখন ভেঙেছে, আর প্রয়োজন কীসের তিমিরের সঙ্গে আমার এ সংসর্গে?

তিমির ফোন করেছিল বেশ কয়েকবার।

ওনা রে..২ একটা কথাই বারবার বলেছিলাম তাকে।

ওকেন২ তিমির ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলনা আমাকে। বোঝবার কোনো কারণও নেই এমনি হঠাৎ করে। ওর চাওয়াটা তো ওখানেই আটকে পরে গেছে। সেই গোলকধাঁধার সীমাবদ্ধে। চাওয়ার মধ্যে ক্ষণিকের পাওয়াটাই যেন পূর্ণতা।

বুঝবে কী করে, মন কোন সময় কোন কথা বলে?

ওসব প্রশ্নের জবাব হয়না। মুহূর্তটাকে নয় মুহূর্তের মধ্যেই রেখে দিলি। আর তার সঙ্গে আমায় মুক্তি দিলি২

সেইওনা২ আরওহ্যাঁ২ তে পরিবর্তিত হয়নি কোনোদিন। তিমির হারিয়ে গেছে, সেই একদিনের বাসনার জ্যোৎস্নার আঁধারের তিমিরে। আমি পড়ে থেকেছি আমার অন্ধকার তিমিরের অবগুণ্ঠনে ঢাকা, সেই একাকী নিঃসঙ্গতাকে প্রত্যহ সঙ্গি করে। দেহের আবেগে মন নেই। যেখানে মন নেই, সেখানে তো আমিও নেই। দেহের চাহিদা তো রোজকার খাওয়া, পড়া, আচ্ছাদনের মতন আরেকটা জৈবিক ব্যাপার। মন তো ভেসে বেড়ানো বলাকার মতন, উড়ে বেড়াচ্ছে চারিধার।

হঠাৎ কাজের ফাঁকে, যেন ধুমকেতুর মতন, কেন জানিনা একদিন, সৈকতের নিভে যাওয়া বাসরে, আবার প্রদীপ জ্বালাবার ইচ্ছে হল। এই ক্ষণিকের প্রদীপের মধ্যেই পিঙ্কুর জন্মের ভ্রূণ ফুটল। আমার পৃথিবীটা হারিয়ে গেল সৈকত থেকে দূরে পিঙ্কুর মধ্যে। ছোট্ট পিঙ্কুকে দেখাশোনা করার মধ্যে ভুলে গেলাম আমাকে....আমার মনকে....আমার চাওয়াটাকে। আমার আমিটা চাপা পড়ে গেল দৈনন্দিন গতানুগতিকার আবর্তে। মন হারিয়ে গেল সাংসারিক গোলকধাঁধার চোরাবালির অলিখিত শর্তে।

তাই তুমি যখন বললেওচলোনা কোথাও বেড়িয়ে আসি২ মনটা যেন আবার ভেসে বেড়াতে চাইল ডানামেলা মুক্ত বিহঙ্গের মতন। কোথাও....কোনো দূর পরবাসে। অন্তত বহুদিন পরে মুক্ত বিহঙ্গের মতন আবার খুঁজে পাওয়া মনটাকে সুপ্ত আকাঙ্খার নিভৃত আকাশে।

সুদূরের পথের প্রান্তে পথ চলা। এবার আর নই আমি একা। তোমাকে নিয়ে আবার নতুন করে দেখা, নতুন কথা বলা। নতুন কোনো খেলা।

ওবেশ মজা লাগছে। হিসেবের অঙ্কের বাইরে জীবনকে খুঁজে বেড়ানো নতুন করে এই পৃথিবীটাকে২ তোমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম।

তোমার কি মনে আছে?

ওতাই বুঝি তুমি চাইছিলে এতদিনঃ তুমি যেন আমায় কষ্ঠিপাথরের দাঁড়িপাল্লায় ফেলে কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলে সেদিন।

ওহয়ত তাই। বুঝিনি তো কোনোদিন আগে। তবে ভালো লাগছে এটা বলতে তো কোনো বাধা নেই....তোমাকে..ঽ

ওতবে চলো তোমাকে নিয়ে যাই মাটি আর স্বর্গের মায়াপুরীতেে তুমি তোমার মিষ্টি হাসিটা ছুড়ে দিয়েছিলে আমার দিকে।

ওকোথায়ঃ আর পাঁচটা মানুষের মতন প্রশ্ন জেগেছিল মনে।

একটু হেসে তুমি বলেছিলেওপ্রথম দিনেই একটা শর্ত হয়েছিল। তোমার কী মনে আছেঃ

ওকীঃ চোখ তুলে চেয়েছিলাম তোমার দিকে।

ওএখানে কোনো প্রশ্ন নয়। শুধু একটু অনুভূতিে চুপ করে গেছিলাম সেই মুহূর্তে।

ওক্ষিদে পেয়েছে সেটা বলার অধিকার কি আছেঃ

ওঅবশ্যইে তোমার শান্তিনিকেতনি ঝোলা থেকে উজ্জ্বালার চানাচুড় বার করে বললে আমাকেওএই টুকুই আছে। আপাতত খেয়ে দেখতে পারো। ব্রেকফাষ্ট না-আসা পর্যন্তে

হঠাৎ তোমার মোবাইলটা বেজে উঠল।

ওহ্যলো....না....ট্রেনে আছি....বলতে পারছি না..ঽ ওপাশ থেকে কে কথা বলছে বোঝা যাচ্ছে না। স্বাভাবিক নারীসুলভ কৌতুহলে উজ্জ্বালার চানাচুড় খেতে খেতে শুনছিলাম তোমার কথোপকথন। প্রশ্ন করা যাবে না। আঁচ করার চেষ্টা করছিলাম কথা বলছে কার সঙ্গে। ওপাশের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে না। বুঝলামও না, ওপাশে কে?

তবুও একটা চাপা কৌতূহল। ভেতরে যেন অন্তঃসলিল তরঙ্গের মতন আছড়ে পরছে বারবার। তাকে সংবরণ করছি অলখ্যে আবার।

কে তুমি? আমি তো চিনিনা তোমাকে। তুমি কী আমার স্বপ্নের দেখা রাজকুমার? না কি, আরেকটা স্বপ্ন ভাঙার মুহূর্তের আলোড়ন? আমার ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা বহ্নি শিখার একটুবা আরেক নৈতিক স্খলন? দোটানায় ছ্যঁৎ করে উঠল বুকটা।

এ কোন্ পথে পা বাড়িয়েছি আমি?

সেই মুহূর্তে ফোনের লাল বোতামটা টিপে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললে ওকই দিলে না তো আমাকে? একাই খাবেঃ

পাপড়ির টুকরগুলো তোমার দিকে এগিয়ে বললামওনাওঃ

চানাচুড়ের মচমচে কামড়ের আওয়াজ আর বাইরের ট্রেনের একটা উদাসীন কম্পন, যেন নিস্তরঙ্গ সমূদ্রের জলে মৃদুমন্দ ঢেউ খেলিয়ে যাচ্ছে। ওটা শুধু বাইরেই নয়। আমার ভেতরেও। হয়ত বা তোমারও। ভয়টা কী আমার মধ্যবিত্ত মানসিকতার নাগপাশে জড়ানো মানুষটার? না কি, অজানার নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দেওয়ার?

বুঝবার আগেই ব্রেকফাষ্ট। চানাচুড়ের বদলে টোষ্ট-অমলেট। চিন্তার ইতি। এখন পেটের সদগতি।

কত সহজেই না আমাদের দৈনন্দিন স্বপ্নকে রুদ্ধ করে টেনে আনে একটা চেনা বৃত্তের মধ্যে। বৃত্তের মধ্যেই সব খেলার সীমা। সব কীর্তির অবসান। মোহ নিয়ে তাকে না দেখাই তো ভালো।

নয়কি?

তোমার চোখ এড়ায়নি। তাকিয়ে বললেওকি ভাবছিলে?

ওকিচ্ছু নাঃ শাড়ি থেকে চানাচুড়ের টুকরোগুলো ঝাড়তে ঝাড়তে, খাবার প্লেটটা এগিয়ে নিলাম। প্লাষ্টিকের ক্লিঙ্গফিল্মটা খুলতে যাব, তুমি হঠাৎ বলে উঠলেওআমি বলবঃ

ওকীঃ তোমার দিকে উত্তরের আশায় তাকিয়েছিলাম আমি।

ওভাবছিলে কাজটা ঠিক করছ কিনা। তাই নয় কিঃ

তোমার কথার তীরটা বিঁধল গিয়ে আমার বুকে। তুমি কি আমার মনটাকেও পড়তে পারো নাকি, চোখের চাওনির আলোকে?

তোমার কথাটা নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য একটু বা ব্যঙ্গ করেই বললামওধূস্। আমি অতটা কমজোর নই। জেনেশুনেই তো তোমার সঙ্গে এসেছি। ভয় পাব কেন? আমার তো আর কোনো পিছুটান নেইঃ

তুমি চুপ করে চেয়ে রইলে জানলার বাইরে। তবে কি আমি ধরা পড়ে গেলাম সেই মুহূর্তে তোমার কাছে? খেলছিলাম তো সেই ছোটোবেলার খেলা।ওকানামাছি ভোঁ ভোঁ....যাকে পাবি তাকে ছো..ঃ সেই কানামাছি খেলার চোখের রুমালটা কী সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে?

মনে হল খেলাটা বোধহয় ঠিক গুছিয়ে খেলতে পারছি না। তোমার মুখ যেন বলে দিচ্ছে তুমি ধরে ফেলেছ আমাকে। যদিও মুখে কিছু বললে না।

তোমার দিকে তাকিয়ে বললামওআমরা যদি বেনারসে নামিঃ

ওআর একটু দূরে গেলে ভালো হয় নাকিঃ

সৈকতের সঙ্গে দূরে কোথাও গেছি কিনা মনে পড়েনা। সৈকতের সে সময় হয়নি কখনও। জানলার বাইরে খোলা আকাশটাকে নিজের করে দেখার অবসরও নয়।

বাবার তখনও চাকরি আছে। প্রতি বছর নিয়ম করে পূজোর সময় বেড়াতে যেতাম। বাবা এল.টি.সি তে বেড়ানোর টাকা পেত। কখনও পুরী। কখনও ভুটান। কখনও জলদাপাড়া।জয়ন্তীর পাড়ে হাতির সারির দিকে চেয়ে থাকতাম। আহা রে! আমার যদি একটা ক্যামেরা থাকত!

তবু যেন বুক ভরে একটু শ্বাস নিতাম। শরতের মিঠে ঠান্ডার আমেজে জয়ন্তী থেকে হাতিপোতা যাওয়ার রাস্তায় বাঁ দিকের ভাঙা ব্রিজটার দিকে এক পলক তাকিয়ে, জঙ্গলের পথে পা বাড়িয়ে, বুকটা কেপে উঠত এক অজানা ভয়ে। বাঘ নেই তো এখানে?

ড্রাইভার বলছিলওদিদিমণি, সেদিনের কথা এখনও ভুলব না। একদল শুটিং পার্টি এসেছিল। ওই যে আপনাদেরওসেদিন অরণ্যে ছবিটার স্যুটিং এর জন্য। ওদের কাজ করছিলাম। হঠাৎ রাত্রিবেলা কিছুটা নেশাগ্রস্ত অবস্হায় আপনাদের বাংলা সিনেমার নায়িকা শরণ্যা গাঙ্গুলি বলল উনি জঙ্গলে ড্রাইভ করবেন। বললামওদিদিমণি, এত রাতে বেরনো ঠিক নয় আমার দিকে তাকিয়ে উনি ঝাঁঝিয়ে উঠলেনওআরে, কত জঙ্গল চসে বেড়িয়েছি। অত ভয়ের কী আছে? জঙ্গলের নাড়ী-নক্ষত্র আমার চেনা। এই এখানে ট্যভেরা গাড়িটা দাড় করিয়ে উনি আর ওনার হেয়ার ড্রেসার বনেটের ওপর বসে সিগারেট খাচ্ছিলেন। আমি পেছনের সীটে চুপ করে বসে ছিলাম। কিছুক্ষণ পরেই নাকে এল আতপ চালের গন্ধ

আমি একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করেছিলামওআতপ চাল

ড্রাইভার আমার দিকে ফিরে বলেছিলওহ্যাঁ গো দিদিমণি। আতপ চাল মানে, ধারে কাছে কোথাও বাঘ আছে

একটু অবাক হয়ে বলেছিলামওআতপ চালের সঙ্গে বাঘের কী সম্পর্ক

ওজানিনা। কিন্তু আজ তিরিশ বছর হয়ে গেল এ তল্লাটে ড্রাইভারি করছি। যখনই আতপ চালের গন্ধ শুঁকতে পাই, দেখেছি ধারে কাছে কোথাও বাঘ আছে একটু থেমে হরিনারায়ণ বলে চললওআতপ চালের গন্ধ শুকতে পেয়ে বললাম ওদিদিমণিরা তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে আসুন হেয়ার-ড্রেসার শুনল। শরণ্যা গাঙ্গুলি শুনলেন না। শেষমেষ হেয়ার-ড্রেসারের পিড়াপিড়িতে যেই না ড্রাইভারের সীটে

বসেছেন, ওমনি দুটো বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ল বনেটে। আর কয়েক সেকেন্ড হলেই আপনাদের ওই সুন্দরী হিরোইন চলে যেতেন বাঘের মুখেঃ

গল্প শুনতে বেশ ভালো লাগছে। হরিনারায়ণের দিকে তাকিয়ে বললাম ঙতারপরঃ

হরিনারায়ণ ষ্টিয়ারিং হুইলটা একটু ডান দিকে কাটাতে কাটাতে বললঙসাপ। মারিনি। ওই দেখুন চলে যাচ্ছেঃ

বাঁ দিকে তাকিয়ে সাপের ল্যাজটা জঙ্গলে মিলিয়ে যেতে দেখলাম। ভাগ্যিস্ হরিনারায়ণ সাপের ল্যজে গাড়ি ফেলেনি।

ঙতারপর আর কি? ভয় ঠকঠক করে কাঁপছে আপনাদের শরণ্যা গাঙ্গুলি। ড্রাইভিং আর করবে কিঃ

হরিনারায়ণ সাপ মারেনি।

কিন্তূ আমি কী সাপের পায়ে পা দিয়েছি? গোলাপের সুবাসটা যেন অন্তরের দোটানায় মিশে যাচ্ছে। মুহূর্তের জন্য ব্রেকফাষ্টটা কিরকম বিস্বাদ ঠেকল। অমলেটটা বোধহয় ঠিকভাবে ভাজা হয়নি। কাঁচা তেলের গন্ধ পাচ্ছি। সব কিছুতেই তেলটা গরম হওয়ার আগেই রান্না বসিয়ে দেওয়ার মতন। স্বাদটা কেমন বিস্বাদে পরিণত হচ্ছে। তবুও খাওয়া চাই। শোয়া চাই। মনের আঁশকে মেটানো চাই। বাধা ভেঙে....এখুনি সব চাই! জীবনটা যেন হারিয়ে যাচ্ছে ঝ্যক্-ঝ্যক্ করা ট্রেনের শব্দে।

ঙক চামচ চিনি দেবঃ

বিস্বাদ অমলেটের টুকরোটা মুখে পুরে তোমার দিকে তাকিয়ে বললামঙএকঃ

চিনি খেলে ভুড়ি বাড়বে। ভুড়ি হলেই সৌন্দর্য রসাতলে যাবে। কে যে যুগের দিব্যি দিয়েছিল, কে জানে? কেন রুবেন্স-এরঙথ্রী গ্রেসেসঃ এর মধ্যে কী কম সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে?

তবুও....আমি আর আমার মতন সবাই-ই তো হাঁটছে চারশো বছরকে পেছনে ফেলে। মুখে বলছি স্বাধীন। কিন্তূ আসলে ভীষণভাবে ইতিহাসের কাছে পরাধীন। সংজ্ঞাটা যুগ-যুগান্তর ধরে আমাদের হাড়ে-মাসে জড়িয়ে আছে। যুগ পাল্টাতে পারে। তিমিরের সঙ্গে নির্দ্বিধায় বিবস্ত্র হয়ে জলপ্রপাতের জলতরঙ্গে বাসনার আগুনটাকেও নিস্তজ করে দিতে পারি বর্তমান মুহূর্তে। আমরা মনের কল্পনালোকে সব কিছুই পারি। আবার হয়ত বাস্তবের দিবালোকে অনেক কিছুই পারিনা। সেটা অপূর্ণতা হয়ে পড়ে থাকে আমাদের নিজেদের কাছে।

সাপটা কে? বোঝার আগেই সাপের ভয়।

কোনটা সাপ কোনটা বিশ্রাপ সব যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে একটা অজানা দোটানায়। আলেয়াটা ধরা দিয়েও যেন আবার মিলিয়ে যাচ্ছে অধরায়। তুমি ধরা দিয়েও কেমন রয়ে গেছ অধরা। আশাটা কাছে এসেও মিশে যাচ্ছে ছলনায়। যাচ্ছে না তাকে ধরা। মায়াবীর আরেক নাম বুঝি মুহূর্তের পাওয়া। তবুও কেন এই মুহূর্তের জন্য বুক ভরে এতই বা চাওয়া?

তুমি আমার দিকে তাকিয়ে বললে—চা টা খেয়ে নাও। ভেবে কী হবে? যখন ঝাঁপ দিয়েছ জলে, ভাসলেই না-হয় অজানা স্রোতের অতলে।

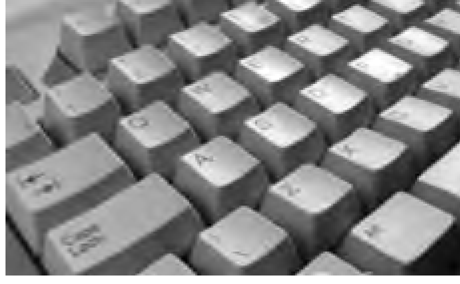
কি অদ্ভূত দেখ দেখি। কী করে যে তুমি মনের কথাগুলো অকপটে ধরে ফেলেছিলে সেদিন। যেন আমার সুসজ্জিত আভরণকে ভেদ করে পৌছে যাচ্ছিলে আমার অন্তরের ফল্গুধারার গভীর গহ্বরে....

বুকটা কেঁপে উঠল আমার!

এভাবে যদি কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে আমায় ব্যবচ্ছেদ করে যাও তুমি। কোথায় গিয়ে থামব বলত আমি?

তোমাকে

কস্তূরী



পঞ্চম চিঠি

কস্তূরী

থামতে তো আমরা বেরোইনি!

আমরা বেড়িয়েছি এক বাউন্ডুলে পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ, ছন্দকে নিঙড়ে নিতে। নিজের মতন করে পেতে। নতুন সুরে, নতুন তালে, নতুন ছন্দে। আমার বেড়িয়েছি আমাদের মনের অবগুণ্ঠণকে উন্মোচন করতে সপ্তর্ষির আলোকের দিশায়। আমাদের না-পাওয়া জীবনের আরেক রশ্মির আশায়। আবার নতুন সম্ভারে সাজাতে তাকে নতুন ছন্দের আবরণে। নতুন তারার না-দেখা আলোকে নব বেশ খুঁজতে। হয়ত বা না-পাওয়ার বেদনার রসপূর্ণ বেহাগের ঝালা মেঘমল্লার রূপে শুনতে। অপ্রাপ্তির মধ্যে যেটুকু পাওয়া, তাকে বরণ করে নিতে, নিজেদের না-শোনা ছন্দ মুখরিত তানে। এক দ্বিখন্ডিত দোদুল্যমান পৃথিবীর ঝংকারের উদ্বেল লহরার মধ্যে জীবনের আসল সুর খুঁজতে। তাকে নতুন করে পেতে। না-জানাকে আবার নব সাজে নব রূপে সাজাতে। তারাদের মধ্যে খুঁজতে বেরিয়েছি মনের দোসরকে। তাদের দিক দিগন্ত কে নিজেদের ঝুলনের খেলায় সাজাতে। সাজাতে তাকে, রাত শেষের নতুন রাগের শেষ প্রহরের, ভোরের আলোয় ভৈরবীতে রাগে সাজাতে।

মাঝখানে আর থামা হলনা। ট্রেন গিয়ে থামল দিল্লির দোরগোড়ায়। ষ্টেশন থেকে বেরতে বেরতে কুলিটার স্যুটকেশ বওয়ার দিকে তাকিয়ে তুমি প্রশ্ন ছুরে দিলে আমাকেঃকোথায় যাচ্ছি আমরাঃ

ওজানিনা। দেখি কোথায়....যেখানে মন চায়ঃ

সত্যিই তো তুমি জাননা। কিন্তূ আমি তো জানি। আমরা তো শুধুই ঘুরতে আসিনি। রিসর্ট নিয়ে একটা ফীচার লেখার জন্যই তো আমার এতদূর আসা। তাইত র্ফাষ্ট ক্লাসে শুয়ে সুখনিদ্রায় ভাসা। সেই অছিলায় তোমার সঙ্গে কাটিয়ে নেব কিছুটা সময়। হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসাকে আবার গাঁথব নতুন কাব্যমালায়। নাইবা রইল আলাতা-রাঙা বরণের ডালি। তোমার সঙ্গে কাটিয়ে তাকে চিনব আবার, ঘুচবে আমাদের না-পাওয়ার কালি।

জানি কি জানিনা, সেটা তো বড় কথা নয়। বুঝি কি বুঝিনা, জেনেই বা কী লাভ? পেয়েছি কি পাইনি, সেটুকুতেই খুঁজে ফিরি আমাদের সম্পূর্ণতার আলো। ধোঁয়াশার পৃথীবীতে নয় পড়ে রইল আমার অতৃপ্ত পান্ডুলিপি। এবার সময় হয়েছে তোমার সঙ্গে লিখব নতুন স্বরলিপি। সেই হালখাতা ছেড়ে পেখম মেলার কাব্যগীতি। ময়ূরপঙ্খিতে সওয়ার হয়ে সময়ের হাত ধরে উড়ে বেড়ানো মরীচিকা হলেও দিগন্তের বিস্তৃতির ওপারে।

তুমি একটু অবাক হয়ে তাকালে আমার দিকে। হয়ত বা ভাবছিলেওএ আবার কোন পাগলের পাল্লায় পড়লাম রেঃ

বুঝতে এতটুকুও ভুল হয়নি আমার। তোমার গাঢ়-নীল সালোয়ার আর সাদা চুড়িদার পড়া, প্রলেপহীন মুখের কাজলকালো চোখের দিকে তাকিয়ে, তোমার এই দোটানাকে হাল্কা করে দিতে বললামওবিশ্বাস কর আমাকেঃ

আমার দিকে তাকিয়ে স্বতস্ফূর্তভাবে মৃদু হেসে বললেওকেন করব না? করেছি বলেই তো এসেছি তোমার সঙ্গেঃ

ওবেশ তো। তাহলে বাকিটা ছেড়ে দাও আমার ওপর। শুধু মুহূর্তটাকে মনে রাখার ভার দিলাম তোমাকে..ঃ

ওনিলাম। কিন্তূ এবার কোথায় কদ্দূরঃ

মুচকি হেসে বললামঙযতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি আমার থেকে বিরক্ত হয়ে পালিয়ে যাবেঃ

ঙপালিয়ে যেতে তো আসিনি আমি। তোমার সঙ্গে সময় কাটাব বলেই তো হঠাৎ বেড়িয়ে পরেছিঃ

ঙবেশ তবে চল যেখানে আমি বলিঃ

তুমি অপেক্ষায় ছিলে কোন দিকে হাঁটব এবার। আমি তোমাকে থামিয়ে দিলাম যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলে সেখানেইঙদাঁড়াও একটু। আমি আসছিঃ

আর কোনো কথা না বলে তোমাকে মাল সামলাতে দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। তুমি একটু উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেঙযাচ্ছটা কোথায়ঃ

ঙআসছি। একটু অপেক্ষা করঃ মনে মনে ঠিকই করেছিলাম তোমাকে জানাব না কোথায় যাচ্ছি। প্রতি ক্ষণে প্রতি পলে, তোমায় অর্নির্দিষ্টের ছোঁয়া দেব আমি। এই লুকোচুরির মধ্যেই ভরে যাবে আমাদের না-বলা পরিচয়ের ডালি। সেটাই ভালোবাসার সঙ্গি, গাঁথবে নতুন ফুলের মালা।

রথ দেখা কলা বেচা হয়ে যাবে এক-ই সঙ্গে। জন্মাষ্টমী না হলেও রাধাকে নিয়ে খেলব নতুন রঙ্গে। আমি তো শুধু তোমার সঙ্গে ঘুরতেই আসিনি। সঙ্গে একটা কাজও নিয়ে এসেছি। দেখা যাক না কেন....তোমাকে না জানিয়ে সেই কাজটা সেরে ফেলতে পারি কিনা। এও তো এক ধরনের নতুন এক খেলা। তোমাকে নিয়ে নয় ভিড়লাম সেই রথের মেলায়।

টিকিট কাউন্টারে গিয়ে শুনলাম রানিখেত এক্সপ্রেস ছাড়বে রাত দশটা কুড়ি মিনিটে। কাঠগুদাম পৌঁছবে ভোর পাঁচটা কুড়িতে। টিকিট কাটতে-কাটতে মনে হল, এখনও তো সারাদিন পড়ে আছে দিল্লিতে। কোথায় যাই তোমার সঙ্গে?

ফিরে এসে বললামঙচলো আমার সঙ্গেঃ

ঙকোথায়ঃ

ওবলেছি না, প্রশ্ন করবে না আমাকেৎ

কুলি সহ মাল নিয়ে সোজা রিটায়ারিং রুমে। একটা ঘর বুক করে মালগুলো রাখতে রাখতে বললামওমুখ হাত ধুয়ে স্নান করে নাওৎ

তুমি যখন স্যুটকেস থেকে নতুন পোশাক বার করছিলে। তুমি হয়ত লক্ষ্য করনি, আমি নিবিষ্ট হয়ে চেয়েছিলাম তোমার পোশাকের দিকে। দেখছিলাম তোমাকে....

খয়রি বুটিকের কাজ করা ক্রীম রং-এর কামিজ। খয়রি চুড়িদার। তারপর যেন কি হাতড়ে বেড়াচ্ছিলে তোমার স্যমসোনাইটের চাকাওয়ালা স্যুটকেসে। বেশ মজা লাগছিল ঠোঁটের ওপর জিভ বোলানো মগ্ন হওয়া দেখতে তোমাকে। কী খুজছিলে বলত অমন করে নিবিষ্ট মনে? বরাবরই আমার কিন্তূ বেশ মজা লাগে মেয়েদের এই ধরনের দ্বন্দ দেখতে। তুমি হয়ত সেটা লক্ষ্য করনি। কিন্তূ শেষ পর্যন্ত যেটা নিয়ে এত দ্বন্দ , সেটা সামনে বেরিয়ে আসতেই ভীষণ হাসি পেয়েছিল আমার।

ইশ!

খয়রি প্যন্টি আর ব্রা। এটা নিয়েও ভাবতে এত সময় লাগে না কি? বাইরের পোষাকের সঙ্গে ম্যচ করে ভেতরের পোশাক যে কেউ পরতে পারে, এর আগে তো জানা ছিলনা আমার! মনে হল, অবন্তিকা কে তো সাজতে দেখিনি বহুদিন। হয়ত কৌতুহলটা তাই হারিয়ে গেছিল সময়ের অলখ্যে। সংসারের চক্র ব্যূহ ম্লান করে দিয়েছিল, একে অপরকে নিবিড় করে জানতে।

যেমন অনেক কিছুই জানিনা এ পৃথীবীতে। শুধু শিখেছি দৈনন্দিন নিয়মের অঙ্কে চলতে। এবার তো সেই নিয়ম ভেঙে মুহূর্তটাকে দেখার সময় হয়েছে আবার। অজানার ময়ূরপঙ্খি সাজিয়ে, সপ্তর্ষির ঠিকানা চিনতে, খুঁজতে তাকে বারবার।

তোমার সঙ্গে কলকাতার বাইরে নিজের মনে একলা পথে নিজেদের ছন্দে চলা....নিরালায় নিভৃতে দুটো মনের কথা বলা। হয়ত বাসরের ছন্দ ফুটে উঠবে সেই চলার ছন্দে। হারিয়ে যাওয়া বাসরকে আবার খুঁজে পাব তোমার হৃদয়ের আনন্দে। সেখানে থাকবে না কোনো বন্ধনের চক্র । শুধুই থাকবে পড়ে আত্মার পরিতৃপ্তি, থাকবে মহাবিশ্বের জ্বলা না-জ্বলা অনেক নক্ষত্র।

অবন্তিকা তো আমার জীবনের দৈনন্দিন বিন্। তুমি আমার না-পাওয়া হৃদয়ের স্বপ্ন অন্তহীন তাকে নিয়ে পড়ে থাকা মনের স্বপ্ন বৃথাই এতদিন ধরে আঁকা। বাস্তব জীবনটার সেখানেই গড়মিল অন্ধকারে ঢাকা। ভালোবাসা যেন একটা মনের বর্ণহীন ক্যানভাস না-আঁকা ছবি। বৃথাই তাকে খোঁজা শুধু ওই বৃত্তের মধ্যে, এতকাল ভুলে গিয়ে গোলকের বাইরের পরিধি।

আচ্ছা বাইরের পোশাক ভেদ করে কি কেউ ভেতরের পোশাক দেখতে পারে? তবে কেনই বা এইওপিক এন্ড চুজ্ করছিলে এতক্ষণ ধরে? বুঝতে পারিনি সেদিন। আজও এই মানসিকতার কারণ আমার কাছে অজানা, কৌতূহলের রঙে রঙিন!

সাজ সরঞ্জাম নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেলে তুমি। পোশাক পালটাবার জন্য স্যুটকেস খুললাম আমি। দিনের আলোয়ে চোখ বুঝলাম একবার। মনের অবচেতনে কল্পনা করার চেষ্টা করছিলাম তুমি বাথরুমে কী কী করছ এই সময় আবার?

বোজা চোখের কল্পনায় খেলে যাচ্ছিল, তোমার আভরণহীন সুঠাম দেহের মনের ক্যানভাস দেখা কল্পনার ছবি। রিটায়ারিং রুমের বাইরের দৃশ্যটা চোখের আড়াল থেকে সরিয়ে দিলে ক্যনভাসটা আর ধূসর লাগছে না এখন। আমার স্বপ্নের তুলিতে আঁকা হয়ে গেছে, তোমার সুতিহীন শ্যামলা দেহের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের কায়া। সেখানে বাস্তবের সুসজ্জিত অবয়ব ফেলবে না কোনো ছায়া। মুহূর্তটাকে সঙ্গি করে ভাসব কায়াহীন সৌন্দর্যের খোঁজে। বয়েই গেল আমার,

তুমি লজ্জায় তোয়ালে দিয়ে নিজেকে ঢাকলে কী না-ঢাকলে আলতা রাঙা লাজে।

ভালোবাসাকে পেতে হয়ত অনেক দ্বিধা। স্বপ্ন দেখতে নেই তো কোনো বাধা। তাইতো রুবেন্স, রেনোয়ার, ম্যাটিসে ছবি এঁকে গেছে শতাব্দী প্রাচীন আগে। ওদের কায়া হারিয়ে গেছে, তবু আজও ভুলিনি আমরা ওদের স্বপ্নের তুলিপটকে।

তোমার প্রসাধন শেষে বেড়িয়ে পড়লাম দুজনে। অটোতে চেপে সওয়ারি হলাম হৃদয়ের শব্দের কুজনে। কালকে হয়ত হারিয়ে যাবে এই মুহূর্ত, এই সময়, এই ক্ষণ। তবুও স্মৃতি হয়ে থেকে যাবে, তোমাকে চাওয়ার উত্তপ্ত মন।

ওআচ্ছা কোথায় চলেছি বলতঽ

তোমার ঠোটে আমার আঙুলটা আলতো করে চেপে বললামওকোনো প্রশ্ন নয়। আজ শুধু আমরা ঘুরব উদ্দশ্যহীনভাবে দিল্লির পথে পথে। তোমার সঙ্গে কিছু আকাঙ্খিত সময় কাটাতেঽ

ওবেশ তো। আমি তো আছিই তোমার সঙ্গে। যেখানে নিয়ে যাবে চলো। প্রশ্ন করব না তোমাকে..ঽ

অটোতে যেতে যেতে হঠাৎ তোমার মোবাইলটা বেজে উঠল। আমার পাশে বসে হাতটা মুখের কাছে নিয়ে তুমি ফিসফিস করে কিছু বলছিলে। আমি বোঝবার চেষ্টা করছিলাম....কী?

কয়েকটা মাত্র শব্দওতুমি ঠিক আছ?....হ্যা....আমি ঠিক আছিঽ

কে? জানতে বড় ইচ্ছে করছিল....জানো? কিন্তু কোনো প্রশ্ন করা যাবেনা তোমাকে সেটাও অলিখিত তা তো মানো। প্রশ্নের বন্যা ছড়াতে গেলে ভালোবাসা যাবে মরে। তুমি হয়ে যাবে আরেক অবন্তিকা থাকবে ঘরের নীরব কোনে।

যেমন প্রশ্ন করা যায়নি অনেক কিছু আগে। আমার এই নগণ্য অস্তিত্বটা আজও অজানা রয়ে গেছে তোমার কাছে। আমার নিজের একটা পৃথিবী,

তোমাকে ছাড়াও তো আছে। আমার সংসারের দ্বীপশিখা ঘরের লক্ষ্মী অবন্তিকা। সেখানে সুপ্ত আমার পাওয়া-না-পাওয়ার অন্য একটা পৃথিবী। হয়ত বা শেষমেষ আমি সেই বৃত্ত ছেড়ে তাকেই খুঁজতে বেরিয়েছি....আমার আমিকে একলা সাথে করে তোমার হাতে হাত ধরে। আমার না-পাওয়াকে রূপ দিতে, স্বপ্ন ছেড়ে কায়ার অন্য কোনো এক বাসরে।

প্রশ্ন করার অধিকার তো আমাদের কারও নেই। তবুও ভেতরের কৌতূহল অজান্তে নীরবে কথা কয়। উত্তর খুঁজি কান পেতে, চোখ খুলে, বুদ্ধি দিয়ে.... সেই চেনা নিয়মের গতে। আমাদের জীবনের সব পাওয়া-হারানোর মাধুরীকে সাজাতে চাই, আমাদের মনের চেনা জানা অঙ্কের গোলকের বাইরে। আমাদের চেনা গন্ডির পরিব্যাপ্তির সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে। অজান্তে সুদুর নীলিমার আঁকাবাঁকা অন্তহীন পথ ধরে স্বপ্নের অচিনপুরীর মায়ার রাজপ্রাসাদে।

কে চেনা? জানিনা। কেই বা অচেনা? তাও তো বুঝিনা। তবুও সেই চেনা-অচেনার অঙ্কের না-জানা উত্তর বৃথাই নিয়মিত কষে বেড়াই রোজ....একটা অলিখিত বলয়ের মধ্যে, জীবনকে বাঁধবার ব্যর্থ প্রচেষ্টায়। না-জানা পরিভাষার সরল লক্ষ্মণরেখার মধ্যে গন্তব্যহীন হাঁটার নেশায়।

আসলে প্রশ্নটা কিন্তূ সেই একটাই। আমি কী চাই?

এখন মনে হচ্ছে শুধু আমি নই একা। তুমিও কি চাও সেটাও তো বুঝতে হবে আমাকে সর্বদা। এক হাতে তো তালি বাজেনা। একে অপরকে না-জানলে তো ভালোবাসা পাখনা মেলেনা। মনের কল্পনা জীবনের স্রোতে ভাসেনা। সেই ময়ূরপঙ্খি নাও সাজিয়ে আমরা ছুটলাম অটোতে করে রাজীব গান্ধী চৌকে।

রাজীব গান্ধী চৌকে এসে তুমি বললেওকোথায় যাচ্ছি তা তো জানিনা। কিন্তূ সত্যি কথা বলব? বড্ড ক্ষিদে পেয়ে গেছে

ওএখানে নয়। আমরা পালিকা বাজার যাব। সেখানেই বসে আমরা লাঞ্চ খাব

তুমি বোধহয় আমার পাগলামো দেখে হাসছিলে মনে মনে। দিল্লিতে এসে হোটেল ভাড়া না করে....কেনই বা ঘুরতে বেড়িয়েছি রিটায়ারিং রুমে মাল ডাম্প করে? তুমি বোধহয় ভাবছিলে, যদি পালিকা বাজারেই খাব, রাজীব গান্ধী চক-এ যাচ্ছিই বা কেন?

তোমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললাম রাজীব গান্ধি চক না ঘুরলে দিল্লি কি ঘোরা হল? তাই একবার চক্কর মেরে নয় ওখান থেকেই শুরু করলাম। এখান থেকেই তো দিল্লির ডাইভারজেন্সটার শুরু

তুমি নিঃশব্দে বসে রইলে। হয়ত বা ভাবছিলে কোথায় যে কীসের শুরু আর কোথায় যে তার শেষ, কেউ কি তা জানে? জানা-অজানার পৃথীবীতে এখনও তো অনেকটাই অজানা রয়ে গেছে। সেই অদেখাকে দেখা, অজানাকে জানা, না-পাওয়াকে পাওয়া, এই নিয়েই তো আমাদের অভিযান। সময় বলে দেবে শুরু আর শেষের অন্তিম সন্ধিক্ষণ।

সৌম্যদার বিয়েতে হাতে তুলে নেওয়া গোলাপ থেকেই তো আমাদের অনুভূতির শুরু । শেষের কথা কি কেউ বলতে পারে?

তুমি না আমি?

পালিকা বাজার থেকে বেরিয়ে রিগ্যল সিনেমার পাশে একটা রেষ্টুরেন্ট দেখলাম। স্ট্যন্ডার্ড রেষ্টুরেন্ট। দেখলাম দোকানটায় অনেক ভিড়। নিশ্চয়ই সাবেকি। এতদিনে শিখে গেছি ঘুরতে ঘুরতে। হোটেলে ভিড় দেখলে ওখানেই আগে ঢুকে পড়ো....ওটাই হয়ত সব থেকে বেশি চলে। মূল্যায়নের সমীক্ষার সহজ সরল সমাধান।

তোমাকে বললাম বলছিলে না ক্ষিদে পেয়েছে? চলো....এখানে বসে কিছু খেয়ে নিই

খাওয়া শেষ। খালি হেটে হেটে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম আমরা দুজনে রাস্তা য়- রাস্তা য় পথে-পথে। উইন্ডো শপিং করে বেশ সময়টা কেটে

যাচ্ছিল। কোথাও একটু দাঁড়িয়ে মাঝেমধ্যে ফেরিওয়ালার সঙ্গে দর-দামাদামি করে সময় কাটানো।

ওকিতনাঃ তুমি প্রশ্ন করেছিলে ওকে।

ওদো শো রূপয়ে মেমসাবঃ

ওএক শো মে হোয়েগাঃ

আমি ঝট করে বাধা দিয়ে বললামওএকশো নেহী....দশঃ

তুমি অবাক হয়ে তাকালে আমার দিকে। ফেরিওয়ালা আমার দিকে তাকিয়ে বললওঠিক হ্যয়....বিশ মে লে যাইয়েঃ

একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেওএরকমভাবে দরাদরি করতে হয়! জানতাম না তো আগেঃ

যশ্মিন দেশে যদাচারঃ বললাম তোমাকে।

এবার তুমি হারিয়ে গেলে ফেরিওয়ালার স্রোতে। তুমি হারিয়ে গেলে দৈনন্দিন জীবনের সময় অপচয় কারার পরিপ্রেক্ষিতে। সেই মুহূর্তে অনুভব করছিলাম তোমার সঙ্গটা যেমন মধুর। তোমাকে কাছে পাওয়াটাও আমার ভিজে ঘাসের গালিচায় শুয়ে, তারার দিকে তাকিয়ে থাকার মতন ততই স্বপ্ন সমূদ্দূর। তোমাকে নিয়ে নিত্য-নৈমিত্তিকতার বাইরে যাওয়াটাও....বলয়ের থেকে বেড়িয়ে অন্য কিছু দেখা। সেখানেই অর্থহীন জীবনের রোশনাই জ্বলে, নতুন করে শেখা। তুমি কী করছ সেদিকে দেখার হুঁশ ছিলনা আমার। শুধু তোমাকে হাজার লোকের ভিড়ের বাইরে দেখার লোভটা আকৃষ্ট করছিল আমাকে বারবার। আমার নীরব চোখের চাওনিতে নিঃশব্দে একা একা তোলপাড় করছিল....তোমাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে কাছ থেকে দেখা।

আবার অটোতে চেপে বললামওলোটাস টেম্পল যানা হ্যয়। মালুম হ্যয় কাঁহাঃ

ওনাম তো শুনা হ্যয়ঃ অটোওয়ালা ইতস্তত করছিল।

‘কালকাজি মে। মন্দির মার্গ পর হ্যায়’

এবার বুঝে গেছে অটোওয়ালা ‘আপলোগ আরাম সে বৈঠিয়ে। মৈ ওঁহা লে যা রহা হুঁ’

তোমার চোখের বিস্ময় আমাকে বুঝিয়ে দিল ওই উদ্দেশ্যহীন ঘোরা থেকে হয়ত তোমায় বার করে এনে কোনো ভুল করিনি আমি। তুমি বোধহয় এই উদ্দেশ্যহীন গোলকধাঁধা থেকে মুক্তি চাইছিলে। জীবনের মতন-ই।

এটা কি মন্দির?

এক আধফোটা সাদা পদ্ম যেন পাপড়ি মেলে ধরেছে আমাদের সামনে। চারিদিকে সবুজ ঘাসের মখমলে নরম গালিচার মধ্যে লাইন দিয়ে সাজানো সবুজ ছোটো ছোটো বাহারি গাছের সারি। লম্বালম্বি ভাবে সরলরেখার মতন চলে গেছে মন্দিরের দিকে। অনেকটা আমাদের ইহজগতের গন্তব্যের মতন। তার মধ্যেখানের রাস্তা ধরে আমরা এগিয়ে চললাম মন্দিরের দিকে।

বারবার ছবিতে দেখা সিডনির অপেরা হাউস-এর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। চলতি ভাষায় ‘লোটাস টেম্পল’ বলা হলেও আসল নাম ‘বাহাই মন্দির’। পদ্ম যেন অর্ধ প্রস্ফুটিত আকারে শান্তি ও পবিত্রতার বাণী শোনাচ্ছে। পাঁকের জলাশয়ের মধ্যে ফুটে ওঠা পদ্ম যেন অন্য এক মন্ত্রোচ্চারণ করছে। পার্থিব বলয়ের বাইরে থেকে বেরিয়ে আত্মার শুদ্ধির মন্ত্র ।

তোমার বিস্ময়ে প্রস্ফুটন হল তোমার অভিব্যক্তিতে ‘বাহঃ! এর আগে তো এর কথা জানতাম না’

‘আজ জানলে। আমাদের জীবনের গোলকধাঁধার বাইরেও তো একটা পৃথিবী আছে’

লোটাস টেম্পল আমাকে আরেকবার মনে করিয়ে দিল পুরাণে কথিত আছে পিতামহ ব্রহ্মা, যখন তিনি গভীর ধ্যাণে মগ্ন বিষ্ণুর নাভি থেকে পদ্মের আকারে আর্বির্ভূত হয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্মে সাধারণের মধ্যে কথিত আছে বোধিসত্ব

অবলোকিতেশ্বরও ওই পদ্মের কোলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পড়েছিলাম গৌতম বুদ্ধ এক হাজার পাপড়ির পদ্মের ওপর শ্রাবস্তীতে বসে ধর্ম প্রচারের কথা। গৌতম বুদ্ধ বলতেন‘তোমাকে পদ্মের মতন বিকশিত হতে হবে পাঁকের পাকস্হলীতে । কিন্তূ ওই পাঁক যাতে তোমার অন্তরের সৌন্দর্যকে মলিন না করতে পারে’। বুদ্ধিষ্টরা তাই ওঁর বন্দনা স্তোত্র শোনায়‘ওঁ মণি পদ্মে হোম’

হয়ত সব ধর্মই একই সূত্রে গাঁথা। একই ছন্দে, একই উপমায়। একই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নজরে এল পদ্মের তিনটে স্তরে সাজানো বারোখানা পাপড়ি যেন অর্ধ-উন্মোচিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝিয়ে দিচ্ছে মানুষের চেতনার অর্ধ উন্মোচনের স্হান এখানেই! বাকিটা হয়ত গিয়ে মিশেছে বাণ প্রস্হে অথবা নির্বাণের অষ্টমাঙ্গিক মার্গে।

তুমি কিন্তূ পলকহীন ভাবে তাকিয়ে ছিলে ওই সবুজ ঘাসের গালিচায় মোড়া আধ-ফোটা পদ্মের মন্দিরের দিকে। আমার দিকে ঘুরে বললে‘ভেতরে ঢোকার আগে একবার বাইরেটা ঘুরে নিই’

গাইডও একটা জোগাড় হয়ে গেল। মন্দিরটা প্রদক্ষিণ করতে করতে মনে হচ্ছিল, তুমি আর আমি কোনো হোম যজ্ঞের অগ্নি ছাড়াই, নিজের চেতনার পাওয়ার মধ্যে কী সাত পাক ঘুরছি এই ভিন্ ধর্মের পবিত্র তীর্থভূমিতে?

গাইড টেপ-রেকর্ডারের মতন বলে চলেছে এই মন্দিরের ইতিহাস‘ইয়ে মন্দির বাহাউল্লাকে কা নাম পর হুয়া। এক ক্যানাডিয়ান আর্কিটেক্ট ফারিবোঝ সাহাবা আঠশো লোগ লেকে ইয়ে মন্দির নির্মাণ কিয়া। উনহে দশ বরশ লগা থা ইয়ে করনে মেঁ। উনিশ সো ছিয়াসি মৈঁ ইয়ে মন্দির খুলা। ইয়ে সিমেন্ট, মার্বেল, বালু, ডলোমাইট ঔর গ্যলভানাইহড্ ষ্টীল সে বনা হুয়া হ্যয়। ছব্বিস একর জমীন ইয়ে পুরা মন্দির কা আওতে মেঁ হ্যয়। ইয়ে মন্দির কা সাতাইশ পাপড়িয়া নে পর পর তিন স্তর মেঁ বিছরে হুয়ে হ্যয়। দো অন্দর কে তরফ মুড়া হুয়া হ্যয় ঔর এক বাহর’

একটু থেমে বললওইসকে চারও তরফ নও পুল হ্যয়। চলিয়ে আপলোগকো দিখাতা হুঁ২

তুমি একটু নীচু স্বরে বললেওতুমি বাহা ধর্ম সম্বন্ধে কিছু জানো২

ওনা২ নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করে নিলাম। শুনেছিলাম আর্কিটেকচারাল দিক দিয়ে এটা দিল্লির একটা দ্রষ্টব্য স্হান। তাই আসা। আগে তো কখনও আসিনি। ভাবলাম দেখেই যাই না কেন একবার।

সারাদিনের ঘোরার পর হয়ত তোমার পা দুটো ক্লান্তিতে ভরে গেছিলওআর ঘুরতে ভালো লাগছে না। চলো ভেতরে গিয়ে বসি২

সারা রাতের ট্রেন জার্নিতে ঘুম হলেও ঠিক মতন তো হয়নি। তারপর রিটায়ারিং রূমে লাগেজ রেখে সারা দিল্লি টো টো করে ঘুরে বেড়ানো। দুপুরে পালিকা বাজারে খাওয়ার পর সে রকমভাবে বিশ্রামও হয়নি। দুজনেরই বিধ্বস্ত অবস্হা। মনে হল মন্দিরের ভেতরে ঢুকে একটু বিশ্রাম নিই।

গাইড তখনও বলে চলেছেওইয়ে পদ্ম মেঁ ঈশ্বরকে বিকাশ হোতা..২

আমাদের আর শোনার ইচ্ছে নেই। মন্দিরের ন২টি দরজার একটি দিয়ে ঢুকে পড়লাম সেন্ট্রাল হলে। সারা হলটি সাদা মার্বেলে ঢাকা। অনেক লোক বসে আছে। কিন্তূ চারিদিকে একটা নিস্তব্ধ শান্তির আবহাওয়া। যেন মৌনতার বানী শোনাচ্ছে সর্বত্রই। হলঘর থেকে পাশের ধ্যানকক্ষে যেতে দেখলাম সেখানে কোনো মূর্তি নেই!

অনেকেই বসে ধ্যান করছে। আমি আবার ধ্যানের কিছু বুঝিনা। জানিনা তুমি কতদূর বোঝ। কিন্তূ এই মুর্তিহীন শান্তির দেবালোকে একটা নীরব বিশ্রামের বাতাবরণ ছড়িয়ে আছে, যা এই মুহূর্তে আমরা দুজনেই খুঁজছিলাম। এক কোণে বসে দেওয়ালে হেলান দিয়ে কিছুটা ঝিমুনি এসে গেছিল সারাদিনের ক্লান্তিতে।

হঠাৎ হই-হট্টোগোলের আওয়াজে আধো তন্দ্রার রেশটা কেটে গেল। চোখ খুলতেই দেখলাম কতগুলো ছোকরা ছেলে উচ্চস্বরে ইংরেজী ভাষায় নিজেদের

মধ্যে কথা বলছে। ধ্যান না করলেও এদের উচ্চমার্গে কথা বলাটা তন্দ্রার আমেজটাকে নষ্ট করে দিল বলেই বিরক্ত লাগল।

এরা কি এটাকে কোনো নাইট ক্লাবের মজলিস্ ভাবে নাকি?

কী যে হল! হুট করে উঠে গিয়ে ওদের বললামওহোয়াট দ্য হেল আর ইউ ডুইংঃ্

ওযাষ্ট টকিংঙ্

ওওয়েল ইফ ইউ ওয়ান্ট ট্যু ডু সো, দেয়ার আর প্লেন্টি অফ প্লেসেস ইন দ্য গ্রাউন্ডস্থ্

ওদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠলওহোয়াট ড্যস দ্যট ম্যাটার ট্যু ইউ? আর ইউ দ্য কেয়ারটেকার অফ দিস টেম্পলঃ্

ওদের কথা শুনে মাথায় রক্ত চড়ে গেল। তবুও নিজেকে শান্ত রেখে বললাম ওনো। আই এ্যম যাষ্ট এ ভিসিটর লাইক ইউ্

ওদেন ইউ হ্যভ নো বিজনেস ট্যু ইন্টারফিয়ার্ব আরেকটি ছেলে দৃঢ়ভাবে বলে উঠল।

শুনে ভেতরে ভেতরে জ্বলছি এদের স্পর্ধা দেখে। তৃতীয় ছেলেটি একটু ব্যঙ্গ করেই বললওআর ইউ এ মুসলিমঃ্

ওফরগেট হোয়াট রিলিজন আই এ্যম। আই এ্যম যাষ্ট এ অর্ডিনারি হিউম্যন বিইঙ্গ। এট লীষ্ট ট্রাই ট্যু মেনটেন দ্য স্যনকটিটি অফ দ্য প্লেস্থ্

ওদ্যট ইজ নন অফ ইওর কনর্সাণ্ব্ ওরা যেন এই সম্রাজ্যের বিধাতা।

এবার একটু দৃঢ় ভাবেই বললামওদিস ইজ দ্য প্রবলেম উইথ ইউ। ইউ হ্যভ নো রেসপেক্ট ফর এনি রিলিজন। দিস ইস ওয়ান অফ দ্য ব্যড আসপেক্টস্ অফ ইওর জেনারেশন। অর শ্যূড আই সে গ্লোবালাইজেশন? আওয়ার কনট্রি ইস বিল্ট অন এ রীচ হেরিটেজ। ফর হেভেনস্ সেক, ট্রাই ট্যু আন্ডারষ্ট্যন্ড দ্যট হেরিটেজ। উই

রেসপেক্ট অল রিলিজন ইরেস্পেক্টিভ অফ রেস, কালচার, ক্রীড, টাইম অর সিভিলাইজেশন”

ওদের মধ্যে প্রথম ছেলেটি কিছু বলতে যাচ্ছিল। অন্য একজন ওকে থামিয়ে বলল “আরে চল্ চল্ কেঁও ইস আদমি কে সাথ বকওয়াস করতে হ্যয়। চল্ বাহার হাওয়া মেঁ যা কর দিল খুল কর বাতে করেঙ্গে..”

ওরা বেরিয়ে গেল। আমি তোমার পাশে এসে বসলাম। মুখে কোনো কথা নেই। হয়ত আমাকে সময় দিচ্ছিলে নিজেকে সংযত করে ফিরিয়ে আনার। নিঃশব্দে কেটে গেল বেশ কিছুটা মুহূর্ত। ঝিমুনিটা কেটে গেছে। সঙ্গে বিশ্রামের আমেজটাও। এই ধ্যানকক্ষে বসে কোনো লাভ নেই। বেরিয়ে এলাম হলঘরে।

এবার তুমি নিস্তব্ধ চাওনির পর মুখ খুললে “হঠাৎ রেগে গেলে কেন?”

“এই ছেলেগুলো আজকের জেনারেশন। এরা কাউকে সম্মান দিতে জানেনা। এটাই হচ্ছে দু-পাতা ইংরেজী পরে দ্বিগজ হয়ে যাওয়ার লক্ষণ।”

হলঘরের এক কোণায় বসে পড়লাম ধপাস করে। আমাকে আচমকা বসতে দেখে তুমিও বসে পড়লে আমার পাশে। হয়ত বিশ্রামের ক্ষয়ে যাওয়া তন্দ্রাটাকে, দেহ ছেড়ে একটু জুড়িয়ে নিতে।

ঠিক কতক্ষণ এভাবে বসে ছিলাম জানিনা।

“কসরৎ মেঁ ওহেদত”

চোখ তুলে দেখলাম আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক আপাত বৃদ্ধ সাদা দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক। মাথায় টাক। পরনে সাদা পাজামা পাঞ্জাবি। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন “আপ লোগ কি বড়হি মেহেরবানী। মেরা নাম হ্যয় গোলাম মর্তূজা। ইস মন্দিরকে রখপাল হুঁ”

আমি স্বসম্মানে মাথা নাড়লাম। তারপর ওনার দিকে তাকিয়ে বিনম্র ভাবে বললাম “আপ অভি উরদু মেঁ কেয়া কহা?”

“ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি। আপলোগ কা বড়হি কৃপা। ইস্ পবিত্র স্হান কা মাহাত্ম কো আপনে রকশা কিয়া।”

আমি এবার ওনার দিকে তাকিয়ে বললাম, “হামলোগ ঘুমনে আয়ে থে। মন্দির কে বারে মেঁ বহোৎ শুনা। লেকিন বাহা কে বারে মেঁ কুছ নেহী জানতা।”

“হম সব বাহা ধরম কে বাহক হ্যয়। বাহাউল্লা জী কে শিষ্য। উপরওয়ালা উনহে ১৮১৭ মেঁ ইস ধরতি পর ভেজা থা এক নয়া মন্ত্র দেনে মেঁ। আপলোগ এব্রাহাম, মোসেস, বুদ্ধ, কৃষ্ণ , জোরোষ্টার, যীশু ঔর মহম্মদ কে নাম তো শুনে হোঙ্গে? ইস মহাপুরুষও কা বাদ বাহাউল্লা আল্লাকে নয়া অবতার মানা যাতা হ্যয়। ওহ্ ইরাণ মেঁ জনম লিয়া থা। ফির বাগদাদ সে বহোৎ জগহ ঘুম কর হাইফা মেঁ ১৮৯২ মেঁ গুজর গয়ে।”

তুমি এবার উৎসুক ভাবে মর্তূজা সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললে, “উনহে হমে কেয়া শিখায়ে?”

“হামারে কোই ধরম নেহী হ্যয়....হামারে কোই দেশ নেহী হ্যয়....সারে সংসার এক হ্যয়। এক ধরম, এক দেশ, এক ভাবনা। সব ধরম কা এক হী মমতর হ্যয়....সব এক হো কর ইয়ে ধরতী পে পেয়ার-মহব্বৎ কে সাথ জীনা....ইউনিটি ইন ডাইর্ভাসিটি। সারে দুনিয়া এক হী সাধনা কা মন্দির বোলিয়ে, ইয়া মসজিদ বোলিয়ে, ইয়া চার্চ বোলিয়ে....আপনে দিল কে আরাধনা কে জগহ ইয়েহী হ্যয়।”

তুমি ওনার দিকে তাকিয়ে বললে, “মুঝে মালুম নেহী থা। আজ নয়া বাত শিখা। বড়ি গহরাই বাত হ্যয়।”

মর্তূজা সাহেব আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “ইয়ে জগহ্ শান্তিকে কে লিয়ে। আপলোগ ইয়ে শান্তি রক্সা কিয়া....বড়হি মেহেরবানী হ্যয় আপলোগ সে।”

আমরা মাথা নীচু করে ওনাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বেরিয়ে যেতে গিয়ে বললাম, “ওহি শান্তি উনলোগ ভঙ্গ কিয়া ইসলিয়ে মেরা দিল বেচহন হো গয়ে।”

ওফির কভি জী চাহে তো ইঁহা আইয়ে। আপলোগকো বাহা ধর্ম কে বারে মেঁ বাতাউঙ্গা। পেয়ার মহব্বৎ ঔর শান্তি সে রহিয়েঃ

বেরিয়ে আসতে আসতে মনে হল কী দেখতে এসেছিলাম আর কী জেনে গেলাম? এও তো এক অদেখাকে দেখা, অজানাকে জানা। এও তো অতৃপ্ত আত্মার আরেক শুদ্ধি! এই আত্মার শুদ্ধির মধ্যেই আমাদের পরিতৃপ্তি।

তোমার দিকে তাকিয়ে বললামওস্বামীনারায়ণ মন্দিরে যাবেঃ

ওআর শরীরে দিচ্ছে না। চলো স্টেশনে ফেরত যাইঃ বলেই তোমার খেয়াল হল, তুমি তো নিজেই জাননা কোথায় যাচ্ছ?

আমার দিকে ফিরে বললেওআচ্ছা কোথায় যাচ্ছি বলত? আমাকে রিটায়ারিং রুমে গ্যারেজ করলে....তুমি কি দিল্লিতে থাকবে নাঃ

ওআমরা রাত দশটায় রানিখেত এক্সপ্রেস ধরবঃ

ওআবার ট্রেন? কোথায় যাব?

ওতোমার জেনে কী হবেঃ আমি ধোঁয়াশায় রেখে দিলাম তোমায়।

ওতাহলে চলো রিটায়ারিং রুমে গিয়ে বিশ্রাম নিইঃ

ওজো হুকুম ম্যাডামঃ

বুঝতে পারছিলাম তোমার দেহের ক্লান্তি , মর্তূজা সাহেবের কথায়, একটু নীরবতা খুঁজছে। নিজের শয়ন কক্ষে। নিঝুম অন্ধকারে একাকী। আমি ভাবছিলাম মর্তূজা সাহেবের কথা যদি সত্যি হয়, তোমাকে ভালোবেসে তো কোনো অন্যায় করিনি।

তোমাকে তোমার মতন থাকতে দেওয়ার মধ্যেই আমার ভালোবাসার সার্থকতা!

ট্রেন যখন ছাড়ল তখন সারাদিনের ধকলে শরীরে আর কিছু নেই। খালি কেবিনের বার্থ ঠিক করাটুকু বাকি। বাথরুমের পাশে ট্যু-বার্থ কেবিন।

আমি বার্থটা তুলতে তুলতে বললামঃতুমি কোথায় শোবেঃ

ওনীচেং

আমার বরাবরই ওপরে শুতে ভালো লাগে। মনে মনে ভাবছিলাম প্যান্ট ছেড়ে পাজামা-পাঞ্জাবিটা কি এখানে ছাড়ব না বাথরুমে গিয়ে। ধূস্....এত রাতে ওই পাবলিক বাথরুমে গিয়ে জামাকাপড় ছাড়া পোষায় না। তুমি কি করছিলে সেদিকে তাকাইনি। বোধহয় স্যুটকেশ থেকে নাইট-ড্রেসটা পেছন ফিরে খুঁজে বার করার চেষ্টা করছিলে। সেই ফাঁকে প্যান্টটা খুলে স্যুটকেসে ভাঁজ করে রেখে পায়জামাটা পড়ে নিলাম। তারপর সার্টটা খুলে ভাঁজ করে স্যুটকেসে ঢোকাতে গিয়ে গেঞ্জী পরা অবস্হায় যখন পাঞ্জাবিটাতে হাত দিয়েছি, তুমি পেছন ফিরে তাকালে আমার সুপুরুষ্ঠ পেশীগুলোর দিকে।

ওবেশ তো। আমি নাইটিটা খুঁজছিলাম। সেই ফাঁকে তুমি ঠিক জামা পালটে নিলে। এবার আমি পাল্টাব কেমন করেঃ

ওআমি বাঙ্কে উঠে যাচ্ছি। কথা দিচ্ছি মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে বই পড়ব, তাকাব না তোমার দিকেং বলে বাঙ্কের শেকল ধরে ওপরে উঠে গেলাম তরতর করে।

তুমি হয়ত কিছুটা দোটানায় ছিলে। এখানে জামা পালটাবে না বাথরুমে ? তোমার দিকে না তাকিয়েও আমি অনুমান করছিলাম, তুমি কি ভাবছিলে মনে। যতই অগ্রসীল মধ্যবিত্ত নারী হোক না কেন, পরপুরুষের সামনে জামাকাপড় চেঞ্জ করতে, কোথায় যেন এখনও একটা সংস্কার কাজ করে অবচেতনে। না দেখলেও বুঝতে পারছিলাম কী চলছে তোমার মনে।

এক সময় তোমার কামিজটা দুহাত দিয়ে ফেলে ওপরে টেনে খুলে ফেললে। আমি আড় চোখে সেই স্বল্প নীল আলোয় দেখলাম তোমার সকালে খোঁজা খয়রি ব্রায়ের এক ঝলক। তখনও তোমার স্তনের দিকে চোখ পড়েনি আমার। শুধুমাত্র ব্রায়ের রংটা চোখে পড়েছিল পলকটুকু না সরিয়ে। সেটাই যথেষ্ট। আমার ভেতরের সুপ্ত গভীর বাসনাকে ভাসাতে সাকার। আমি দেখছিনা, এই ভেবে, তুমি

আরেকটু নিজস্ব হলে। সালোয়ারটা খুলে সযত্নে গুছিয়ে রাখলে স্যুটকেসের এক কোনে। আমি ওপরের বাঙ্কে শুয়ে ঘুমের ভান করে চেয়ে দেখছিলাম তোমার ব্রা-প্যন্টি পড়া অবয়বের দিকে। তুমি হয়ত লক্ষ্য করনি আমার সে চাওনি। নিভৃতে আড়ালে তোমার দেহের সৌন্দর্যের অবগাহনে ডুব দেওয়ার মাদকতা অন্য।

সব কি স্পর্শ করতে হয়? দর্শন কি যথেষ্ট নয়?

অবন্তিকা ছাড়া আর কোনো মহিলাকে তো আমি বিবস্ত্র অবস্হায় দেখিনি কখনও। অবন্তিকাই প্রথম। অবন্তিকাই শেষ। মনের অসম্পূর্ণ বাসনাটাকে আবার নতুন করে জাগাচ্ছিলে তুমি। তোমার স্বপ্নের ভাসা মায়াবী কায়াকে পাওয়ার নতুন এক রেশ। নাইটিটা ওপর থেকে গলিয়ে তুমি আর এরকবার তাকালে ওপরের বাঙ্কের দিকে। হয়ত পরখ করে নিচ্ছিলে, আমি সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছি কিনা, না কি, ভান করছি অজান্তে ।

ওতুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছঽ জেগে থেকেও নিঃশব্দ রইলাম আমি। লাইটটা নিভিয়ে নীচের গদিতে শোবার তোড়জোড় শুরু করলে তুমি।

সময় তো বয়ে যাওয়া অনন্ত কোনো প্রবাহ নয়। সময় এক নিঃশব্দ মুহূর্ত, তাকে ধরে রাখতে হয় মুহূর্তের মধ্যে। সময় কোনো ঘড়ির টিকটিক আওয়াজের মধ্যে বলয়ের গন্ডির সীমারেখা নয়। সময় ছুটে চলে তার আপন স্রোতে আজ থেকে কালকে। সেই সময়কে ধরে আমরা চলেছি রানিখেতের পথে। কালকে ভোর না-হওয়া পর্যন্ত পৌছব না কাঠগুদামে।

মন চাইছিল তোমার পাশে গিয়ে শুতে। তোমাকে আদর করে একটু চুমু খেতে। মন চাইছিল তোমার নরম পায়ারার মতন বুকে আলতো করে চাপ দিতে। যদি মনের বাসনাকে বাস্তবে এনে ফেলতাম। তোমার অবাক বাক্যালাপ হয়ত কান পেতে শুনতাম। তুমি হয়ত আমার দিকে না তাকিয়ে ফিসফিস করে বলছেওআহঃ কি করছ না....ছাড়ো তো..ঽ

ওতোমার খারাপ লাগছেঽ

আমি অনুভব করতে পারি সেই মুহূর্তে কোনো উত্তর পেতাম না তোমার থেকে। কিছুটা বিষণ্ণ হয়েই হাতটা সরিয়ে নিতাম তোমার বুকের ওপর থেকে। মনটা অবসাদে ভরে যেত ঠিক সেই মুহূর্তে।

তুমি ফিরে তাকাতে আমার দিকেওকী হলঃ

ওমানেঃ

ওহাতটা সরিয়ে নিলে যেঃ

ওতুমিই তো বারণ করলে্

ওএমা! আমি কি তাই বলেছি নাকিঃ

ওতাইত বললে....বারণ করলে্

তোমার স্বপ্নের শব্দগুলোর মালা কেমন মিলিয়ে গেল অন্ধকার রাত ভেদ করে ট্রেনের হুইসেলের শব্দে। অন্ধকারের বুক চিড়ে ছুটে চলেছে এক প্রবহমান গতি। আমরা দুজনেই নিঃশব্দ নিজের গদিতে শোয়া দুই সারথি। হয়ত বা আগামী প্রবহমান কালের এক মুহূর্তের আরতি। আরতিটা নয় মনে মনেই দিলাম। আমার তোমার যুগলবন্দির সুর তোমাকে না ছুঁয়েই পেলাম। প্রবাহের ছুটে চলা তরঙ্গে খুঁজে পাওয়া দুটি হৃদয়। আমার স্বপ্নের আঁধারের বুকেই হয়ত লুকিয়ে আছে তোমার না-পাওয়া নরম তুলতুলে স্তন ।

অবন্তিকা বোধহয় মূর্চ্ছা যেত এই মুহূর্তের কথাটা জানলে। তোমার-আমার এই মুহূর্তের নিঃশব্দ অভিসার নির্বিবাদে শুনলে। চেনা-জানা জীবনের সীমা রেখা ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যতের মধ্যে বাঁধা। তার বাইরে তো ভাবাই যায়না সংসারি মনে অন্য কোনো কথা। জার্নালিজম্ মানে কোনো সাবেকি চেতনা নয়। এবার সময় হয়েছে নিজেকে উন্মুক্ত করে পাখনা মেলে ওড়ার। এ তো শুধু নিছক রিসর্টের ছন্দহীন বর্ণনা নয়। এও তো হতে পারে, নতুন তারে গাঁথা নিজের কাব্যে আঁকা, কোনো নতুন সুর-গীতি কাব্যময়।

বিকেলে একবার ফোন করেছিল অবন্তিকা তোমার অজান্তেওকোথায় আছঃ

ওদিল্লিতেঃ

ওকোথায় যাবেঃ

ও উত্তারাখন্ডে। রিসর্টগুলো নিয়ে একটা কভার স্টোরি করতে হবেঃ

ওকবে ফিরবেঃ

ওবলতে পারছিনা। সময় মতন জানিয়ে দেবঃ

ফোনটা কেটে দিয়েছিল অবন্তিকা । তুমি লক্ষ্য করনি, কেননা ঠিক সেই মুহূর্তে তুমি অকসরধাম স্বামীনারায়ণ মন্দিরের মিউসিক্যল ফাউন্টেন শো এর খোঁজ-খবর নিতে গেছিলে। ফোনটা কেটে দিয়েই মনে হয়েছিল, আমি কি কোনো সংবিধান ভাঙ্গছি? বিবাহিত স্ত্রী কে না জানিয়ে চুপিসারে কিছু কি খেলছি? মনের চাওয়াটা কি বাঁধা পড়ে থাকবে জীবনের পাঠিগণিতের অঙ্কে? তাকে তো কোথাও মেলে দিতে হবে মনের সত্যের সম্মুখে।

ফিরে এসে বলল্রেওছঃটা পয়তাল্লিশে আরম্ভ। শেষ পর্যন্ত দেখে স্টেশনে পৌছতে পারব না। তাই যা ঠিক করেছিলাম তাই-ই করবঃ

ওকীঃ

ওলোটাস টেম্পল থেকে সোজা স্টেশনে যাব। আর পারছিনা ছুটতে। এবার রিটায়ারিং রুমে গিয়ে স্নান সারতে হবে। মাঝে কোথাও খেতে হবে তোঃ

ওও নিয়ে একটুও ভেবোনা। দিল্লি স্টেশনের পাশে অনেক খাবার জায়গা আছেঃ

সেই ফাঁকে অবন্তিকার সঙ্গে সংযোগ। পুরাতনকে বিচ্ছিন্ন রেখে তোমার হাত ধরে নতুন পথের দিশায় ঘোরা উন্মত্ত এক মন। মায়াজালে কি শুধু মন ভরে? তাকে উপভোগ না করলে বন্ধন কি কখনও ছাড়ে?

ওনাঃ....আর ইচ্ছে করছে না কোথাও ঘুরতেঃ

ওবেশ তো। তাই করি না কেন....তোমার মন যা চায়ঃ

মনে মনে ভাবছিলাম এর আগে কি দিল্লি কখনও আসনি? ক্লান্তি সত্বেও তোমার আগ্রহ কেন সেটা কি আমি জানি? তোমাকে সে প্রশ্ন করা যাবেনা কখনই। তাই অলেখা থেকে যাবে তোমার অনেক কথা। জীবনে এরকম অনেক কিছু আছে যার উত্তর খোঁজা ভুল। তবুও আমরা কেন যে বোকার মতন খুঁজি তাকে, পাইনা তার মূল। থাকনা অনেক প্রশ্ন আমাদের নিভৃত বাসরে। শুধু এই মুহূর্তে তুমি যা চাও, তাই নিয়ে না-হয় থাকলে আমার একান্ত নিভৃত অন্তরে ।

ট্রেনের ঘ্যসঘ্যস শব্দ কোনো না-শোনা মেঘমল্লার। আলোড়ন তুলছে মনে তার একঘেয়ে স্বরব ঝংকার। এ তো আর অনন্ত পৃথিবীর ডাক নয়। এ তো মুহূর্তকে ধরে নিজেকে হারিয়ে ফেলার কোনো এক গভীর সময়। অন্ধকারের পথে আমরা দুটি যাত্রী। নতুন আলোর ঠিকানায় নিজেদের খুঁজছি অহরহ দিনরাত্রি।

আমি শুয়ে ছিলাম, তোমার স্বপ্ন নিয়ে জেগে। তুমিও কি তাই ভাবছিলে আমার কথা, রাতের ক্লান্ত নিদ্রার নাইট ল্যম্পের আলোকে? তোমার গভীর শ্বাস বুঝিয়ে দিল ভাবনার মায়া ছেড়ে দিয়েছ তুমি। হারিয়ে গেছ তন্দ্রা -বিজড়িত শান্তির কোলে....তখনও জেগে আমি!

তোমাকে

কৌস্তভ



ষষ্ঠ চিঠি

কৌস্তভ

তোমাকে কতবার দেখব খরাতপ্ত রাত্রির দীর্ঘশ্বাস বুকে ভরে।

রাতের না-পাওয়াকে দিনের আলোকে আমার একাকী ব্যথার নিভৃত অন্ধকারে। সেখানে তুমি আছো আর কেউ নয়। আমার নিজস্ব পৃথিবী তো সংসারের নিয়মে চলা নিত্যনৈমিত্তিক এক নিচ্ছিদ্র চেনা বলয়। সেই চেনা অঙ্ক তো কারও অজানা নয়। সেখানে তো হিসেবের হালখাতার দুরন্ত খেলা আর পাঁচটা সবার মতন জাগতিক নিয়মের সাজে। পিঙ্কুকে নিয়ে আমার জীবন চলে সৈকতের জাগতিক সংস্কারের আচ্ছাদনে। রাত্রি তো আমার নিশীথের একাকী অন্ধকার। সেখানে যেন বারবার শুনতে পাই জীবনের আর এক কুহকের ডাক। কখন যেন মালকোষ মিশে গেছে ভৈরবীর তানে। ভোরের স্বপ্ন দেখেছি প্রাতের আজানের মিঠে সুরে।

এখানে তো ট্রেনের এসি কম্পার্টমেন্টে নেই সেই আজানের সুর!

হঠাৎ দুম করে ট্রেনটা থামতে, ট্রেনের ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দের অবসানে তন্দ্রাটা ভেঙে গেল। এমনিতেই নিজের খাট ছাড়া রাতে ঠিক করে ঘুম আসেনা। তাও

আবার বিদেশ বিভূয়ে অচেনা রেক্সিনের ওপর শোয়া। জানলার ফাঁক দিয়ে সেই আধো-অন্ধকার আধ-ফোটা আলোয় দেখলাম ট্রেনটা একটা স্টেশনে থেমেছে।

কাঠগুদাম।

তুমিই তো কাল বলেছ আমরা নামব ওখানে।

কালকের সালোয়ার কামিজটা কোনো রকমে গলিয়ে নাইটিটা স্যুটকেসে ঢোকাতে ঘড়িটার দিকে তাকালাম। ভোর পাঁচটা কুড়ি মিনিট। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তুমি তখনও দিব্যি ঘুমোচ্ছ। এত নির্বিকারও মানুষ হতে পারে? ভোরে নামবার কথা জেনেও আর্লাম না দিয়ে শুতে পারে?

ওএই ওঠো....আমরা কাঠগুদামে পৌঁছে গেছি। এখানে নামবে বলেছিলে নাঽ

ঘুম জড়ানো চোখে চোখ কচলাতে কচলাতে উঠতে গিয়ে, তোমার মাথাটা ধাক্কা খেল কিউবিক্যলের সিলিং এ।

ওএসে গেছিঽ ধড়মড়িয়ে উঠে পরলে তুমি।

ওতাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও। নামতে হবে যে..ঽ

ওরেডি হওয়ার আবার কী আছে? এই পাঞ্জাবি-পায়জামা পড়েই নেমে পড়বঽ

কোনোরকমে স্যুটকেসটার মধ্যে এলপাথারি সব জিনিস ভরে নেমে পড়লাম। আমার ভীষণ পটি পেয়ে গেছিল। পরবর্তি যাত্রা যে কোথায়, তাও তো জানিনা।

তোমার দিকে তাকিয়ে বললাম রিটায়ারিং রুমে গিয়ে হাতে মুখ ধুয়ে নিলে হয়নাঽ

ওআমি ভাবছিলাম একেবারে হোটেলে গিয়ে চেঞ্জ করবঽ

ওযাচ্ছিটা কোথায় বলতে পারোঽ

ওভীমতালঽ

এবার আর কোনো ভনিতা না করে অকপটে স্বীকার করলামওআমার পটি পেয়ে গেছে

ওতাহলে চলো যাই রিটয়ারিং রুমে

পুরোনো একটা কথা মনে হতেই নিম্নভাগের চাপটার মধ্যেও নিজের মনেই হাসি পেয়ে গেলওউইমেন ডিফিকেট ওয়ান্স আ উইক। মেনস্ট্রুরেট ওয়ান্স এ মান্থ। পারটুরেট ওয়ান্স এ ইয়ার। অতএব বেগটা যখন এসেছে তাকে থামিয়ে রাখা বাতুলতা মাত্র।

ওয়েটিং রুমে লাগেজগুলো তোমার হেফাজতে ডাম্প করে সোজা ছুটলাম বাথরুমের দিকে। তুমি মনে মনে কী ভাবছিলে, সে ভাবার তখন সময় নেই আমার।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে বললামওইশ্! বাথরুম টা বড্ড ময়লা

ওপাহাড়ের অঞ্চলে একটু ময়লাই হয়। হয়েছে তো ঠিক মতন?

প্রশস্তির হাসি হেসে মাথা নাড়লাম আমি। বাচ্চাদের যেমন খাওয়া, ঘুম আর ন্যাপি চেঞ্জ ঠিক মতন হলে কান্না থেমে যায়, মহিলাদেরও পটি ঠিক হলে ম্যুডটা প্রসন্ন হয়ে যায়। বাথরুমের কথা ভুলে, আমি তখন নিজের স্বস্তির কথাই ভাবছি।

আসলে সংসারের কাজের জন্য একটু সকাল সকাল-ই উঠতে হয়। পিঙ্কু স্কুলে বেরোবার আগেই, মোটামুটি সকালের আধা কাজ নামিয়ে ফেলতে হয়। তাই ভোর সকালে ওঠার মতন এই অভ্যাসগুলো জীবনের অঙ্গে জুড়ে গেছে। এলার্ম না-দিয়ে ঘড়ির কাঁটাকে চিনতে।

আসলে সৈকতের এত ঘনঘন চাকরির তাগিদে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য প্রথম জীবনে থেকেই সংসারের হাল ধরতে শিখেছি। সেই সুবাদে সকালে ওঠাটা দৈনন্দিন জীবনে কিছুটা রদটিন মাফিক হয়ে গেছে। সকালে উঠে সেগুলো সেরে ফেলাটা নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের অঙ্গ। কিছুটা হয়ত হাঁফিয়েও উঠেছিলাম এই

একঘেঁয়ে জীবন থেকে। একটা ছকের বাধনে বাঁধা পড়ে একটু প্রাণ খুঁজছিলাম খোলা আকাশের নীচে।

সৌম্যদার বিয়েতে, গোলাপের থালা হাতে, তোমার কোহিনূরের পাঞ্জাবির দিকে গোলাপটা এগিয়ে দেওয়ার মুহূর্তে সেই বাধন ছিন্ন হয়ে গেল। এক নতুন অনুভূতির আলোকে! তোমার উষ্ণ শ্বাস-প্রশ্বাসের নিথর কম্পণটা যেন জাগিয়ে দিল অন্য এক চেতনা, আমার না-পাওয়া স্বপ্নের নতুন এক পুলকে। দৈনন্দিন জীবনের গোলকধাঁধাটা যেন মিশে গেলো এক সুদূর প্রসারী দিগন্তে র অসীমতার অনন্তের পানে....জীবনটাকে তো এতদিন দেখা হয়ে গেছে বহু রং-এ। এবার শেষের পূর্ণতার মহামন্ত্রটা তোমার হাত ধরে জানতে হবে কোনো এক শুভক্ষণে!

ওআমি বাবা তোমার ওই বাথরুমে যেতে পারব না আমার দিকে ফিরে বললে তুমি।

ওতোমাদের আর কি! যেখানে খুশি রাস্তায় দাঁড়িয়ে করে নিতে পারো

ওযেখানে খুশি নয়। বাকিটা হোটেলে গিয়ে হবে

ওএখান থেকে কদ্দূর?

ওদূর খুব একটা বেশি নয়। উনিশ-কুড়ি কিলোমিটার হবে। তবে রাস্তাটা ভালো নয়। যেতে ঘন্টা দেড়েক লেগে যাবে

স্টেশনের বাইরে ট্যাক্সি থেকে ভাড়ার-গাড়ির ছড়াছড়ি। দেখলাম তুমি দরাদরি করছ ওদের সাথে। শেষে তুমি একটা ইন্ডিকা ভাড়া করতে গাড়িতে উঠে বসলাম লট-বহর সমেত।

গাড়ি চলতে শুরু করেছে তার শিথিল গতিতে। লক্ষ্য করলাম এই ভাড়া গাড়ির স্পীডের একটা নিজস্ব ঢঙ আছে। যত খালি রাস্তা ই হোক না কেন চল্লিশ-পঞ্চাশ কিলোমিটারের বেশি স্পীডে যাবেনা।

হঠাৎ তোমার কি খেয়াল হতে বললেওইশ্....গাড়িতে ওঠার আগে চা টাও খাওয়া হলনা। খেয়ে নিলেই ভালো হত

ওভাগ্যিস আমি চোখ টিপলামও রাস্তায় তো আর রিটায়ারিং রুম পাওয়া যাবেনা। চলো....চলো....একেবারে পৌঁছে হোটেলে গিয়ে চা খাব

তোমার মুখ দেখে মনে হল তুমি সকালের চায়ের অভ্যসটা ছেড়ে এখনও বেরতে পারোনি। মুখের মধ্যে একটা আক্ষেপের সুর। আমার আবার চায়ের অতটা নেশা নেই।

তোমার দিকে তাকিয়ে বললামওএতই যদি ইচ্ছে ছিল স্টেশনে খেয়ে নিলে পারতে

তুমি এতক্ষণ পর ফিরে তাকালে আমার প্রসাধনহীন মুখের দিকে। চায়ের অভাব কাটাতে দৃষ্টিটা ক্রমশ নীচের দিকে নামতে একটু সচকিত হয়ে উঠলাম আমি।

ধ্যেৎ....

এতক্ষণ তো লক্ষ্যই করিনি! তাড়া হুড়োর মধ্যে কামীজটার ওপরের বোতাম দুটো লাগাতে ভুলে গেছি। তাঁর ফাঁক দিয়ে তুমি চেয়েছিলে আমার খয়রি ব্রাতে ঢাকা স্তনের দিকে। বাসি চোখের চাওনি। আমি বুঝতে পেরেছি জেনেও তবুও তুমি তা সরাওনি। হয়ত বা সেটা কালকে রাতে না-পাওয়ার একটা নিঃশব্দ প্রতিধ্বনি!

সব বুঝেও মূর্খের মতন চেয়ে রইলাম বাইরের দিকে। আমার সামনেটাকে তোমার চোখের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে। মাঝে মাঝে মূর্খ সাজলে কতই না সুবিধা! কটা লোকই বা সেকথা বোঝে? কজনই বা তা করতে পারে? অনেক সময় অনেক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি এভাবে সহজেই এড়িয়ে যাওয়া যায়।

তুমি না-হয় চেয়ে থাকলে আমার আধো অনাবৃত স্তনের দিকে। আমার চোখ ভেসে গেল সকালের সূর্য্য স্নাত রক্তিম আভায় মেশা সবুজ প্রান্তরের আঁকেবাকে।

খোলা আকাশের অনন্ত নীলিমার মাঝে। মাটিতে ছড়িয়ে আছে ছোটো ছোটো দূর্বা ঘাসের মেলা। তারই ওপর শিশিরের লুকোচুরি খেলা।

মনে আছে তখনও আমি কলেজে পড়ি।

ভোরে উঠে রোজ সকালে সাঁতার কাটতে যেতাম এন্ডারসন ক্লাবে। বরাবরই জল আমার খুব ভালো লাগে। মর্ণিং ওয়াকের মতন রোজকার সাঁতারটা শরীরটাকে যেমন ফিট রাখত, মনটাকেও ভরিয়ে দিত ভৈরবী রাগের নতুন নতুন সুরে। অনেকটা সকালে উঠে গঙ্গা স্নান করার মতন। আকাশের পবিত্র হাওয়ার নির্মলতার ঘ্রাণ নিতে। সেই সকালের সাঁতার সারাদিনের জন্য ঝরঝরে করে দিত দেহটাকে। ফ্রী স্টাইল থেকে ব্রেষ্ট ষ্ট্রোক।

তোমার, আমার স্তনের দিকে তাকানোর কথা ভেবে, বান্ধবীদের কথা মনে পড়ে যেতওবেশি করে ব্রেষ্ট ষ্ট্রোক দিয়ে সাঁতার কাটলে ব্রেষ্ট আরও বড় হয় জানিসঃ

জানতাম না। বুঝতাম তো নাই। টিউব লাইটের মতন ওরা যা বলত, সেটাই মনে হত বেদবাক্য। কী বোকাই না ছিলাম আমি! সাঁতার কেটে লেকের ধারে সবাই মিলে একসঙ্গে হাঁটতে চলে যেতাম। সকালের ফুরফুরে হাওয়ায় পায়ের চটি খুলে মখমলে দূর্ব-ঘাসের মধ্যে হাঁটার মধ্যে যে, সে কী আনন্দ! সে তোমায় বলে বোঝাতে পারব না।

মন চাইছিল এই মুহূর্তে গাড়ি থামিয়ে চটি খুলে দূর্ব-ঘাসের ওপর আবার ছেলেবেলার মতন নেচে বেড়াই। ঘাসের ওপর নেচে বেড়ানো ফড়িং-এর মতন। নিজ ছন্দে, নিজ আনন্দে, নিজের পেখম ছাড়া ময়ুরকে আবার পাখনা মেলে ধরতে।

একটা সত্যি কথা বলব। রাগ করবে না তো লক্ষীটি দোহাই। পশ্চিম বাংলার মতন এত সবুজতা কিন্তু তোমার এই উত্তরাখন্ডে নেই। না থাক সবুজতা।

তবুও....

তোমার সঙ্গে পথ চলার মধ্যেই বা কম আনন্দ কীসের? মনের মানুষ কাছে থাকলে যে কোনো জায়গায়ই মনটা ভালো হয়ে ওঠে।

ওতুমি ঠিক আছ তোঃ তোমার গলার স্বরে ফিরে তাকালাম পাশে বসা তোমার দিকে। তোমার চোখের দৃষ্টি এবার আমার স্তন থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে আমার মুখের ওপর। আচ্ছা তোমরা সব সময় ওই দিকে তাকাও কেন বলতো, যখন মুখের সৌন্দর্য অনেক বেশি মিষ্টি? অথবা চোখের দৃষ্টি! আসলে অ-দেখাকে দেখার নিভৃত আকাঙ্খাটাই কি এই নিম্নভাগে ধাওয়ার নেশা, সৌন্দর্যকে করে দেয় তার মাধূর্য থেকে অনাসৃষ্টি। ওখানে তো কোনো বৈচিত্র্য নেই। বৈচিত্র্য আছে দৃষ্টির মেদুরতায়। সেখানেই আসল মানুষটার অন্তরের প্রকাশ। সেখানেই প্রেমের সৃষ্টি।

ওহঠাৎ এ প্রশ্ন করছ কেনঃ চোখের পাতা তুলে প্রশ্ন করলাম তোমাকে।

ওমানে উদাসীনভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলে তো....তাই ভাবছিলাম কী ভাবছঃ

ওগাড়িটা একটু থামানো যায় কীঃ

ওকেনঃ তুমি একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে আমাকে।

ওথামাও না একটুঃ আমার আবদারে গাড়ি দাঁড়িয়ে পরল রাস্তার ধারে।

গাড়ি থামতেই, দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে পড়লাম। বাঁ দিকের সবুজ ঘাসের গালিচার ওপর ছুটে বেড়াতে লাগলাম উদ্দেশ্যহীনভাবে নীল আকাশের নীচে। তুমি হয়ত ভাবছিলে মনে মনে....পাগল হয়ে গেলাম নাকি? এ আবার কার সঙ্গে এলাম? এতক্ষণ দুজনে সময় কাটালাম।

আমি মনে মনে বলছিলাম, পাগল না হলে তোমার সঙ্গে এভাবে হঠাৎ বেড়িয়ে পড়ি? তুমি কী ভেবেছ আমাকে, তা কি আমি এখনও জানি? কালকে সারাদিন ধরে তোমার তালে ঘুরেছি আমি রাজীব গান্ধী চৌক থেকে পালিকা বাজার হয়ে লোটাস টেম্পলে। বিশ্রামহীন অবিরাম না-চেনা আরেক উদ্দেশ্যহীন চক্করে। আজ আমি খেলব আমার মনের বিন্। নিজের ছন্দে ভরা আনন্দে। মেলব আমার

পাখা। উড়বে আমার উদাস মনের ব্যাকুল বহ্নি শিখা। খেলব তাকে দু-হাত মেলে কাটিয়ে আকুল সাগর। পাখনা ছাড়া ছিন্ন করা স্বপ্ন সৌধ গড়বো আমরা দুজনে স্বপ্নের রং-এ বিভোর।

ভালোই লাগছিল খোলা আকাশের নীচে একমনে নেচে বেড়াতে। ওপরে আকাশ নীচে ঘাস ভোরের আকশের সোনামাখা রোদে ভাসতে। পাওয়ার আনন্দ তো বন্ধনের মধ্যে নয়, মুক্তির অনাবিল স্রোতে।

দূরের পাহাড়ের চূড়াগুলোর ফাঁক দিয়ে সকালের সুর্য্যের মৃদু আলোর কিরণ, যেন সোনার গালিচা বিছিয়ে দিয়েছে ফিকে সবুজতার ওপর। তার স্পর্শে যেন সবুজের ওপর গায়ে হলুদ বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত অবিরত। শুভরাত্রির শেষে আগামী দিনের ভাত-কাপড়ের নতুন কোনো এক শপথে। এতকাল ধরে তো শুধুই ভাত কাপড়ের শপথের রথে চড়ে বেড়িয়েছি। সত্যি করে বুঝিনি শপথের মানেটাই বা কী?

এবার হয়ত সময় হয়েছে শপথের রথকে পেছনে ফেলে ছুটে চলার। মনের ময়ূরপঙ্খিতে উড়ে বেড়িয়ে পাড়ি দিতে রূপহীন রূপের অরূপে । হৃদয়ের দুয়ার খুলে নতুন চেতনার রং ধূসর ক্যানভাস খুঁজতে। তোমাকে পাশে নিয়ে তার স্পর্শ আবার নতুন করে বুঝতে। বন্ধ জানলার কপাট খুলে খোলা আকাশের নীচে উড়তে। আমরা আবার ভাসব ওই পাখিদের মতন, অনন্ত নীলিমাকে দু-হাত বাড়িয়ে দূরের আকাশটাকে নিবিড় করে ছুঁতে। নিবিড় করে শুঁকব তার মুক্ত হাওয়ার ঘ্রাণ। হয়ত সেখানেই লুকিয়ে আছে জীবনের আসল কলতান। তার রং রূপ রস বর্ণ গন্ধ ছন্দকে ঠিক ওই হাওয়ায় ওড়া গাঙচিলের মতন বুকে ধরে কাছে টেনে নিতে।

ওআরে....আরে....করছটা কীঃ

ঘাসের গালিচায় ছুটতে-ছুটতে, আমি কথা ছুড়ে দিলাম তোমার দিকেওকেন ছুটে বেড়াচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ না?....তুমিও নেমে এসনা আমার সঙ্গেঃ

ইচ্ছে থাকলেও হয়ত বিদেশ বিভূঁয়ে অচেনা গাড়িতে লটবহর ফেলে নামতে চাইছিল না মন তোমার। তুমি খোলা দরজার বাইরে পা মেলে রইলে চেয়ে আমার দিকে। যেন বাধনছেঁড়া পাখি সোনার খাঁচা ভেঙে বেড়িয়ে পড়েছে মুক্তির আনন্দে। হয়ত বহুদিন পর প্রাণ ভরে ভোরের আকাশের মুক্ত বাতাসের প্রথম বুকভরা শ্বাস নিলাম। কলেজ জীবনের এন্ডারসন ক্লাবের মুহূর্তটাকে আবার নতুন করে পেলাম।

কেমন যেন হাঁপিয়ে উঠছিলাম জীবনের এই সাজানো মেকি বদ্ধ খাঁচার রুদ্ধ দ্বারে। সৈকত, পিঙ্কু, পঞ্চভূতের পৃথিবীটা যেন সেই চেনা ঘেরাটোপে বন্দি করে দিয়েছিল আমাকে। সেখান থেকে ছুটি নিয়ে মুক্ত ঘাসের বুকে পাহাড়ের কোলে উড়ে বেড়াচ্ছিলাম আপন ছন্দের আনন্দে।

ওএবার চলো। তা না হলে দেরি হয়ে যাবে৻ সম্বিৎ ফিরল তোমার ডাকে। স্বপ্নের মায়া ফিরে এল বাস্তবের আঙিনাতে।

আবার গাড়িতে এসে বসা। আবার পথ চলা। কিছুক্ষণের মধ্যে সবুজতা হারিয়ে গেল পাহাড়ি পথের আঁকাবাঁকা উতরাইয়ে। বুঝতে পারলাম বেলাভূমি ছেড়ে উত্তরণের পথে এগোচ্ছি আমরা দুজনে।

কিছুক্ষণ চলার পর তুমি আবার বললে ওএকটু চা খেলে হয়না৻

বুঝতে একটুও অসুবিধা হলনা চায়ের নেশাটা অতৃপ্ত আত্মার মতন বারবার কুঁরে কুঁরে বেড়াচ্ছিল তোমাকে।

ওতোমাকে তো তখন থেকেই বলছিলাম। তুমি বললে চা খাবে গিয়ে ওই হোটেলে। এখন হলে মন্দ কী৻

রাস্তার পাশে হোগলা ছাওনি দেওয়া চায়ের ঝুপড়ির বেঞ্চিতে বসে পড়লাম দুজনে। ওপাশে দুই বিদেশিনী যুবতী চা খাচ্ছে। খাঁকি প্যান্ট সাদা টি-সার্ট। একজন একটু স্বাস্হবতী। অন্যজন ক্ষীণকায়া।

যেই না চায়ের অর্ডার দিয়েছি, ওমনি হই-হই করে কিছু লোক ওই বিদেশিনী ও আমাদের ঘিরে ফেলল। কিছু বোঝবার আগেই ভিড়ের মধ্যে থেকে একটি লোক, হয়ত বছর পঁয়ত্রিশ বয়স হবে, বেরিয়ে এসে বললওহামলোগ গরীব হো সকতে হ্যয়। ফিরভী হামারে কোই তো ইজ্জৎ হ্যয়ঃ

বুঝলাম তরুণী দুটি বেশ ঘাবড়ে গেছে ওদের দেখে। ওদের দিকে তাকিয়ে বললওহোয়াট ইজ দ্য ম্যটারঃ

ওএ.... এ....মেমসাব গালি মৎ দেনাঃ

ওদের মধ্যে স্বাস্হবতী যুবতীটি ওদের দিকে তাকিয়ে বললওবাট হোয়াট রং হ্যভ উই ডানঃ

ওবোলানা....গালি মৎ দেনা। হামলোগ অংরেজী না জানে তো কেয়া? ফিরভি গালি মৎ দেনা মেমসাহাবঃ

বেশ বুঝতে পারছিলাম, কোথাও একটা কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। কিন্তূ কোথায় হয়েছে ঠিক ঠাওর করতে পারছিলাম না। নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে আমাদের আসার আগে!

কিন্তূ কী?

আসলে এই লোকেরা ইংরেজী বোঝেনা। নেহাতই পাহাড়িয়া গ্রামের মানুষ। যুবতীরাও বুঝতে পারছে কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। কিন্তূ ঠিক বুঝতে পারছে না, কোথায়?

আমি ওদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলামওকেয়া হুয়াঃ

আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে বললওকেয়া বলু বাবু, কেয়া বলু বহেনজী.....ইনলোগ নঙ্গা হো কর পাহাড় মেঁ চড় রহে থে....হামলোগ কে ভী তো বিবি-বচ্চে হ্যয়ঃ

একটু ভ্যবচ্যকা খেয়ে গেলাম। কেনই বা এরা বিবস্ত্র হয়ে পাহাড়ে উঠতে যাবে? দেখে তো মস্তিস্ক বিকৃত বলে মনে হচ্ছে না। আসলে কোথাও একটা কিছু ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে।

ওই যুবতীদের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট ইংরেজীতে বললাম“হোয়াট ইজ দ্য ম্যটার? দে আর এঙ্গরী দ্যট ইউ ওয়ার ট্রাইং ট্যু ক্লাইম্ব দ্য হিলস্ ন্যুড”

তুমি বোধহয় একটু হকচকিয়ে গেছিলে। এই অযাচিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নয়। আমার চোস্ত ইংরেজী উচ্চারণে। এর আগে তো আমাকে এভাবে ইংরেজি বলতে শোনোনি কখনও। আমাদের পরিচয়ের শর্ত ছিল, একে অপরের সম্বন্ধে কিছু বলব না। আমি যে কনভেন্টে পড়েছি, সে কথা তো তোমায় বলিনি।

ওদের মধ্যে স্লিম যুবতীটি আমার দিকে তাকিয়ে বলল“নো। ইট ওয়াজ একস্যক্টলি নট সো এ্যস দে থিংক। উই ওয়ার হিচ-হাইকিং ট্যু নৈনিতাল । উই নিডেড ট্যু গো টু দ্য লু। বাট দেয়ার ওয়াজ নান এরাউন্ড। উই এসিউমড্ দেয়ার ওয়ার নো ওয়ান এরাউন্ড দ্য হিলস। সো উই টুক অফ আওয়ার ক্লোদস। দেন লিন্ডা ফেলট ইট মাইট বী ওয়াইজার ট্যু ট্রাই এ মোর সেক্লুডেড স্পট। সিন্স নো ওয়ান ওয়াজ এরাউন্ড উই ডিড নট কেয়ার ট্যু পুট দ্য ক্লোদস অন এগেন। হোয়াইল ট্রাইং ট্যু লুক ফর ইট, ওয়ান অফ দেম মাইট হ্যভ স্পটেড আস”

মেয়ে দুটির মুখে ভয়ের স্পষ্ট ছাপ।

লিন্ডা বলে স্বাস্হবতী মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে বলল“উই নেভার রিয়েলাইজড্ দে উড পাউন্স অন আস লেইটার হিয়ার”

আমি ওদের বোঝাবার চেষ্টা করলাম“ইন ইন্ডিয়া লেডিস আর সাপোসড্ ট্যু হ্যভ ক্লোদস অন অল দ্য টাইম”

“ইভেন হোয়াইল গোয়িং ট্যু দ্য ল্যু” লিন্ডা জিজ্ঞাসুভাবে তাকাল আমার দিকে।

“ওয়েল..” একটু থেমে বললাম“উই উইসুয়ালি পারশিয়ালি ষ্ট্রিপ হোয়াইল পারফরমিং....বাট নট ন্যুড কমপ্লিটলি”

আমি বুঝতে পারছিলাম এই মেয়েলি কথোপকথনে তোমার একটু অস্বস্তি হচ্ছে। কিন্তূ কিছু তো করার নেই। এরা বিদেশ-বিভূঁয়ে অসুবিধায় পড়েছে। ওই লোকেরা এদের ভাষাও বোঝেনা। আমি ছাড়া ওদের আর সাহায্য করবে কে? ওরা কি ভাবছে, এরা চরিত্রহীন দুটি যুবতী?

প্রশ্নটা নিজের অজান্তেই মনে মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল। চরিত্রটা কি সামাজিক রূপে বহিঃপ্রকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ? ঘরের দরজা বন্ধ করে আমরা পৃথিবীর আদিমতম রূপে চলে যেতে পারি। সারা সংসার সেটা নিয়ে দু-পাঁচ কথা ভাবেনা। অথচ বাইরে, জন্মের আদিমতম ক্রিয়াকর্ম করতে বসলেই, তা আমাদের সংস্কারে আঘাত করে। হাসি পাচ্ছিল সংস্কারটার কথা ভেবে।

যুগে-যুগে দেশে-দেশে কালে-কালে কতই না তার পরিভাষার বাহার! অথচ এ শুধু সংস্কার। সভ্যতার মূল্যায়ন থেকে বিচিছন্ন অংশীদার। ভাষাটা পালটেছে যুগে-যুগে কালে-কালে দেশে-দেশে। সত্যিটা আসলে রয়ে গেছে আমাদের নীরব মনের আকাশে। বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসাতেই তার মুক্তি । না হলে মন জ্বলে পুড়ে খাঁক হয়ে যায়, পায়না কোনো তৃপ্তি।

ওদের মধ্যে যে লোকটি তেড়ে মেরে এসেছিল, আমি তার দিকে তাকিয়ে বললামঃ‘উনলোগ টট্রি করনে কে লিয়ে জগহ ঢুন রহা থা’

‘টট্রি করনে কে লিয়ে কেয়া নঙ্গে হো কর এলাকে মেঁ ঘুমনে পড়তা? কেয়া বোলতা মেমসাহাব? হমলোগ কো কেয়া উল্লু সমঝ কর রখা? যো বোলেগা ওহি বিসোওয়াস কর লুঙ্গা? ইয়ে সব বাহর কা আদমি হামলোগ কো বেওকুফ সমঝতে হ্যয়। আর আপ ভী উনলোগ কো বাত মেঁ আ গয়া’

তুমি হয়ত বুঝছিলে ব্যাপারটা অন্যদিকে এগোচ্ছে। তাই এতক্ষণ নীরবতার পর এবার ওদের দিকে তাকিয়ে বললে‘হমে তো উনলোগ সে অভিতক জান পেহচান ভী নেহী হুই। ইয়ে তো হামারা হী দেশ হ্যয়। আপ লোগ থোরা আরাম সে বৈঠিয়ে। ম্যয় উনহে সামঝাতা হুঁ’

তারপর উঠে গেছিলে ওই লোকটির দিকে। ওকে, ওই লোকগুলো থেকে আলাদা নিয়ে দেখলাম কিছু বলছিলে। ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, কী বলছিলে? একবার তোমার দিকে, একবার ও দুটো মেয়ের দিকে তাকাচ্ছিলাম অনুসন্ধিৎসু হয়ে। মেয়ে দুটির মুখে তখনও দুশ্চিন্তার আভাস কাটেনি।

ওদের ভীত সন্ত্রস্ত চেহারার দিকে ফিরে বললাম “ডোন্ট ইউ ওয়ারি। হী উইল সর্ট ইট আউট।”

বিদেশ বিভুঁয়ে এরকম একটা ঝামেলায় পড়বে আশা করেনি ওরা। কেমন যেন করুণভাবে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। বেশ কিছুক্ষণ পরে দেখলাম ওরা চলে গেল। মনে মনে তোমায় সাধুবাদ দিলাম ঝামেলাটা সহজেই মিটিয়ে ফেলবার জন্য।

বেঞ্চে বসে বললে “কই চা টা তো দিলনা?”

বাবুর চায়ের নেশাটা তখনও কাটেনি।

“কী হল? কী বললে?”

“দাঁড়াও....আগে চা টা খেয়ে নিই” তারপর হাঁক দিলে “আরে ভাই চায়ে কাঁহা গয়া? ইয়ে দোনো লড়কিও কো ভী চায় দেনা।”

বাবুর চা না খেলে কথা বেরোয় না। আবার তোমার দিকে তাকিয়ে বললাম “কী বললে ওদের?”

“ঠিক কী হয়েছিল এখনও তো বুঝতে পারছি না।”

“হাঁদারাম....ওরা তো বললই কী হয়েছিল? বুঝতে পারলে না?”

“ঠাহর করেছি। কিন্তু বুঝতে পারলাম না ওরা উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা করছিল কেন?”

মনে হল তুমি বিদেশি সভ্যতার খুব একটা বেশি কিছু বোঝনা। কিন্তু এই মুহূর্তের হিরোটাকে জিরো করি দিই বা কী করে? তোমার কথা শোনার অনেক

সময় এখনও পড়ে আছে।

তাই ওদের দিকে তাকিয়ে বললামওহোয়ার আর ইউ ফ্রমঃ

ওইঙ্গল্যান্ড। উই আর ট্যুরিং ইন্ডিয়া ট্যু সী ইটস্ কালচার। ইন ফ্যক্ট, হীচ-হাইকিং। আই এ্যম ওয়েন্ডি। এন্ড দিস ইজ মাই ফ্রেন্ড লিন্ডা্ রোগা পাতলা মেয়েটি জবাব দিল।

ওহোয়ার ওয়ার ইউ অফ ট্যুঃ

ও নৈনিতাল । উই থট উই উড ওয়াক দিস ডিসট্যান্স। উই আর রানিং সর্ট অফ মানি। সো উই থট উই ক্যুড ওয়াক দিস ডিসটেন্স । আফাটার অল ইট ইজ নট ট্যু ফার আওয়ে। এন্ড দ্য ওয়েদার ইজ প্রীটি ফাইন্

ওহোয়াট ড্যু ইউ ডুঃ

ওউই আর ষ্টুডেন্টস্ এ্যট ইউনিভার্সিটি অফ ব্র্যাডফোর্ড্

ওইন হোয়াটঃ

ওসোসিওলজি্

আমি আড় চোখে তাকালাম তোমার দিকে। দেখলাম তুমি ভাবলেশহীন ভাবে বসে চায় চুমুক দিচ্ছ। সেখানেই সকালের তৃপ্তি। এদের কথোপকথনে তোমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

ওক্যান উই গীভ ইউ এ লিফটঃ

ওওহ....ইয়েস....প্লীজ..ঃ

ওউই আর গোয়িং ট্যু ভীমতাল। উই উইল ড্রপ ইউ সামহোয়ার ইন বিটুইন্

ওদ্যট উড বী লাভলি্

চা শেষ করে ওরা ওদের হ্যভারস্যক নিয়ে উঠে এল আমাদের গাড়িতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমতল বিলীন হয়ে গেল পাহাড়ের পাদদেশে। পাহাড়ি রাস্তায়

গাড়ি এঁকেবেঁকে উঠে চলেছে ঘোরানো পথ ধরে। ডান দিকে কয়েকটা বোল্ডারের পরে বিশাল খাদ। জঙ্গলা গাছে ভর্তি। সুদূরপ্রশারী শূন্যতার ওপারে সারি সারি পাহাড়ের মেলা। যেন প্রকৃতি তার উত্থানের চিহ্ন রেখে গেছে প্রতি পদক্ষেপে। নীচের অংশে কিছুটা সবুজতা থাকলেও বেশিভাগটাই রুক্ষ কালো চূড়া। যেন গোটা এলাকাটাকে শিবলিঙ্গ দিয়ে ঢেকে রেখেছে। আমার দূর থেকে দেখে মনে হল এ যেন শিবের বলয়।

জীবনের বলয় যেমন সংস্কারে আচ্ছন্ন, শিবের বলয়ও কী পুরানের ইতিহাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে গেছে? কিন্তূ এই দুই বলয় ভেদ করে আমরা যে পথে চলেছি সে তো দিগন্ত ছোঁয়ার পথ। অনন্তের ঠিকানা তো কেউ জানেনা। দিগন্তের ঠিকানাটা না জানলেও তো তার ক্ষীণ রেখাটা আমরা কখনও কখনও বা দেখতে পাই। সেটা অনন্তের থেকে অনেক বেশি জানা। আমাদের চেনা-জানা চৌহদ্দির ভেতরে।

অনন্তকে দিগন্তের নেশায় বাঁধবার তাগিদে, প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে, ভুলেই গেছিলাম গাড়িতে আমার সঙ্গে আরও তিন সঙ্গি আছে। তুমি চুপ করে বসেছিলে।

ওদের মধ্যে স্বাস্হবতী মেয়েটি যার নাম বোধহয় লিন্ডা, তোমার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘হোয়ার আর ইউ গোয়িং?’

‘ভীমতাল’ সংক্ষিপ্ত উত্তর।

তুমি কি ইংরেজীতে অতটা পারর্দশী নও? তাই কথা বাড়াতে চাইছ না। না কি, ওদের গাড়িতে তোলার ব্যাপারে তোমার সম্মতি ছিলনা। হয়ত ভেবেছিলে এই পথটা নৈসর্গিক দৃশ্য দেখে আমার সঙ্গে একা পরিক্রমা করবে। সেখানে এ দুটি মেয়ে যেন কাবাব মে হাড্ডি।

আমি লিন্ডার দিকে তাকিয়ে বললাম, ‘হোয়াট মেড ইউ কাম ট্যু ইন্ডিয়া?’

ওয়েন্ডি বলে মেয়েটি ঝট্ করে বলল, ‘ট্যু সী দ্য কনট্রি’

ওইস ইট ফর দ্যট ওনলিঃ

লিন্ডা আমার দিকে ফিরে বললওনট একস্যাক্টলি। একচুয়ালি উই কাম ফ্রম রিলেটিভলি ওয়েল অফ ফ্যামিলিস। ওয়েন্ডি ইজ ফ্রম ব্রমলি ইন কেন্ট। আই এ্যম ফ্রম নটিঙ্গহ্যম। উই ওয়ার নেভার গুড ষ্টুডেন্টস্। উই ডিডন্ট গেট এ চান্স এনিহোয়ার নিয়ার লন্ডন । নট ইভেন লাফবারা ইউনিভার্সিটি। সো উই মেট এ্যট ব্র্যাডফোর্ড ইউনিভার্সিটিঃ একটু থেমে বললওপ্রব্যবলি ইউ আর নট আওয়ার দ্যট ব্র্যাডফোড ইস প্রিডমিন্যন্টলি রতল্ড্ বাই পাকিস্ট্যনিস্ এন্ড ইনডিয়ানস্। দেয়ার উই র্ফাষ্ট কেম ইন ডিরেক্ট কনট্যক্ট উইথ দ্য এশিয়ান কালচারঃ

লিন্ডার কথাটা টেনে নিয়ে ওয়েন্ডি বললওউই রিয়েলাইজড্ এশিয়া হ্যস এ রীচ হেরিটেজ দ্যন ইট ইজ প্রোজেক্টেড ইন আওয়ার পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড । সো উই ডিসাইডেড ট্যু টেইষ্ট এ বিট অফ দ্য হেরিটেজ ইন আওয়ার ওউন ওয়েঃ

আমি জানলা থেকে মুখ সরিয়ে বললামওএন্ড হোয়াট ডিড ইউ সীঃ

একটু অদ্ভুত লাগছিল তোমাকে নীরব থাকতে দেখে। আশা করছিলাম, তুমি অন্তত . আমাদের এই বাক্যালাপে যোগদান করবে। কিন্তূ তুমি করলে না। মনে একটু কষ্ট হলেও, সেটাকে গুরুত্ব না দিয়ে ওদের দিকে ফিরে তাকালাম।

ওইওর কনট্রি ইজ মোর ফিলসফিক্যল এন্ড ট্র্যডিশনল। ইন ফ্যক্ট টুডেইস ইনসিডেন্ট প্রুভস্ দ্যট। ইট ওয়াস আওয়ার ফল্ট অফ নট পুটিং দ্য ক্লোদস্ অন। একচুয়ালি উই ওয়ার নট আওয়ার এনিওয়ান ক্যুড বী এরাউন্ড ইন দিস ফোরলোন পার্টঃ

এবার পুরো ব্যাপারটা বোধগম্য হচ্ছে।

নামে রাস্তাটা ন্যশনল হাইওয়ে এন.এইচ এইট্রি সেভেন হতে পারে, কিন্তূ চলাটা খুব একটা মধুর নয়। খুব ভালো মেনটেনড্ নয়। তারপর নীচু ইন্ডিকা গাড়ি। ঝাকুনিটাও দোদূল্যমান ছোট্ট পাল্কিতে চড়ে ক্রোশ পার হওয়ার মতন। শুধু ওহুন....হুনা..ঃ র মতন কোনো গান বাজছে না চলার ছন্দে। কেবলই ঘনঘন

ব্রেকের আওয়াজটা, চলার ছন্দে বারবার হেঁচকি তুলছে মসৃণতাকে বেসুরা রাগে ভরিয়ে।

কথা বলছিলাম বটে। নিছক কথা বলার জন্য। কিন্তু তোমার নীরবতাটাও সেই বেসুরো রাগের মধ্যে একটা ক্যাটাফোনিক সিম্ফনি বাজিয়ে চলেছে আমার মনের ভেতর।

আর কতক্ষণ?

জেওলিকোটে এসে প্রথম তোমার মুখ দিয়ে বেড়িয়ে এলওএই ঝাকুনিতে পেটে ছুঁচো ডন মারছে। কিছু খেলে হয়নাঃ

আমিও তোমার কথায় সায় দিয়ে বললামওআমিও এই কথাটাই বলতে যাচ্ছিলামঃ

অতএব আবার রাস্তার ধারে বেঞ্চে বসে পড়া। টোষ্ট, অমলেট, চা। তখন মনে মনে ভাবছি কখন হোটেলে গিয়ে পৌছব, কে জানে? খাওয়া শেষ করে আমরা উঠতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দূর থেকে কিছু পাহাড়ি লোককে আসতে দেখে লিন্ডা কিছুটা ভয় পেয়েই বললওআই থিংক উই উইল টেক লীভ ফ্রম ইউ। উই ক্যন মেক আওয়ার ওয়ে থ্রুঃ

ওয়েন্ডি লিন্ডার কথা টেনে নিয়ে বললওথ্যংকস্ ফর সেভিং আস। এন্ড থ্যংকস ফর দ্য লিফট টুঃ

বুঝলাম ওরা আর কোনো ঝামেলায় জড়াবার আগেই সরে পড়তে চাইছে।

আমি মুচকি হেসে ওদের বললামওটেক কেয়ার। এনজয় ইওর ট্রিপ ইন ইন্ডিয়াঃ

ওরা ওদের হ্যভারস্যক কাঁধে ঝুলিয়ে হাঁটতে শুরু করল। ওদের অবয়বটা মিলিয়ে যেতে দেখলাম একদল পাহাড়ি লোক আমাদের দিকে এগিয়ে এসেছে। ওদের মধ্যে নারী, পৌরুষ, বাচ্চা ও একজন বৃদ্ধ লোকও আছেন। আছে ভীমের মতন দশাসয়ী এক কালো লোক।

কিছুটা ভয় পেয়ে গাড়িতে উঠতে যাব দেখি অসংখ্য মানুষ ভিড় করে আমাদের গাড়িটা ঘিরে ফেলল।

আবার কী হল? এরা কারা?

ভীমের মতন দশাসয়ী লোকটা আমাদের দিকে এগিয়ে বলল—গুসতাকি মাফ কিজিয়ে। আপলোগ হামারে মেহমান হয়। থোরা পহলে যো হুয়া উসমে আপলোগকো তো কোই কসুর নেহী হ্যয়

এতক্ষণ মনে মনে ভয় কাঁপছিলাম। এবার ওদের কথার স্বরে একটু নিশ্চিন্ত হলাম।

ওই ভীম আকৃতি লোকটি বলল—আপলোগ হামারে মেহমান হ্যয়। কুছ সময় হামারে সাথ বিতায়গী, তো বড়ি মেহেরবানি হোগী

আমি তোমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। তুমি চোখের ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলে মন্দ কী? সত্যি তো। মন্দ কী? আমরা তো একসঙ্গে ঘুরতে বেড়িয়েছি। নয় সেই ফাঁকে এদের পৃথিবীটাও দেখা হয়ে যাবে। এবার ভয়টা পরিণত হল এক অজানা চাঞ্চল্যে।

এরা কিছুক্ষণ আগের ব্যাপারটা জানল কী করে? তখনই মনে হল, আজকাল তো মোবাইলের যুগ। হয়ত মোবাইলে খবর চলে এসেছে এখানে। ড্রাইভার বোধহয় মনে মনে ভাবছিল, কতক্ষণে আমাদের নামিয়ে দিয়ে আরও তিন-চারটে ট্রিপ মেরে দিতে পারত। তা না, এখন এদের জন্যে দেরি হয়ে যাচ্ছে।

তোমার দিকে তাকিয়ে বলল—ইয়ে আদমি ইস গাঁওকে মুখিয়া হ্যয়। অব তো ঔর কুছ করনে নেহী সকেগা। আপলোগকো কো তো ইনলোগ কে সাথ থোড়া গুজরনে পড়েগা। যানা হ্যয় তো যাইয়ে, মগর দের মৎ করিয়ে

পাহাড়ি রাস্তা ধরে ভীমাকৃতি লোকটার পাশে গল্প করতে করতে আমরা হেঁটে চললাম পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে। রাস্তার ধারে ছোটো ছোটো বনফুলের মধ্যে এখান-

ওখান থেকে উঁকি মারছে কিছু নাম-না-জানা ফুলের সারি। ঠিক পাঁকে ফোটা পদ্মফুলের মতন....বাহারী। কোথায় যেন একটা মাটির গন্ধ শুঁকতে পারছিলাম।

ওই লোকটি চলতে চলতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল“আপলোগ তো শহর কে আদমি হ্যয়। সবলোগ ইঁহা সে গুজর যা তা। কোই নৈনিতাল। কোই ভীমতাল। ও সব তো টুরিষ্ট স্পট হ্যয়। হামলোগকা ছোটা গাঁও ভী তো একবার দেখ লিজিয়ে”

নিয়ে গেল ওর বাড়িতে। পেছনে পর্বতমালা। তার একটু সমতল জায়গায় বড় বড় পাথর দিয়ে তৈরি ছোট্ট একটা বাড়ি। সামনে ফুলের বাগান। সেই বাগানে আমাদের দুজনের জন্য একটা বেঞ্চি পেতে দিয়ে হাঁক দিল“আরে ও মুনিয়া....সাহাব, মেমসাব লোগকে লিয়ে কুছ চায়-পানি কা বন্দোবস্ত করো”

“অভি আই..” ভেতর থেকে মুনিয়ার গলা ভেসে এল।

ওই লোকটির সঙ্গে গল্প করছিলাম। বারবার চোখ চলে যাচ্ছিল আসপাশের বাড়িগুলোর দিকে। কোনোটা একটু উঁচুতে। কোনোটা একটু নীচুতে। কিন্তূ সব বাড়িগুলোর ধাঁচ-ই এক। বড় বড় পাথর দিয়ে গড়া ছোটো ছোটো বাড়ি। কেমন যেন লোভ হচ্ছিল জায়গাটা তোমাকে নিয়ে ঘুরে দেখার....

ওদের অতিথি আপ্যায়ন শেষ হতে ওদের মধ্যে সেই লোকটি বলল“হামারে আদমি আপলোগকো গাড়ি মেঁ ছোড় আয়গা”

মনের এই কৌতূহলটা রূপায়িত করতে ওদের দিকে তাকিয়ে বললাম“নেহী নেহী। উসকা জরুরৎ নেহী হ্যয়। হামলোগ তো ঘুমনে আয়ে হ্যয়। অপনে অপনে থোড়া ইয়ে জগহ ঘুম লেঁ। আপকে ইয়ে নাস্তা কেলিয়ে হামলোগ আভারি হুঁ” একটু থেমে মুনিয়ার দিকে তাকিয়ে বললাম“চলে মুনিয়া....বড়িয়া খায়া”

পাহারের প্রান্তরের তেপান্তরের পথে আমরা হেঁটে চলেছি অনির্দিষ্টভাবে। আমাদের চলাটা যেন অনন্তের পথে বাঁক নিয়েছে। সময় হারিয়ে গেছে আমাদের মুগ্ধতার আড়ালে। প্রকৃতির মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছি আমি আর তুমি। অনুভবে

বিভোর। সময়ের অলিন্দ যেন পাখনা মেলে দিয়েছে আমাদের অনুভূতির নতুন ছন্দের সময়হীন আকাশে। নতুন রং-এর অনুভূতি জাগছে না-ফোটা কোনো পলাশে।

কতক্ষণ এভাবে ঘুরে বেরিয়েছি জানিনা। হঠাৎ তোমার কথায় চমকে উঠলাম ওসন্ধ্যে নেমে এসেছে যে। এখন না ফিরলে রাত হয়ে যাবেঽ

গাড়ির ড্রাইভার আমাদের দেখে হাই-হাই করে উঠলওইতনা দের কর দিয়া সাহাব। কিতনে সময় সে আপলোগ কো ঢুন রহা হুঁঽ

আমি গাড়িতে বসে বললামওথোড়া দের হো গয়া। জগহ অচ্ছা লাগা। ইসলিয়ে থোড়া ঘুম কর দেখ রহা থা। অব চলিয়ে..ঽ

ওকাঁহা জায়গা ? অব তো আপলোগকো সারে রাত ইয়ে জগহ দেখনে পড়েগা। দিন ঢলনে কে বাদ ইধর গাড়ি চলানা মনা হ্যয়ঽ

ওকেয়া!!ঽ দুজনের মুখ দিয়ে বেড়িয়ে এল একসঙ্গে।

ওহাঁ সাব। হাঁ মেমসাবঽ

তুমি ওর দিকে তাকিয়ে বললেওচলিয়ে না। কৌন দেখেগা ইধরঽ

ওনেহী সাব। ইধর তো কোই নেহী দেখেগা। লেকিন ভীমতাল মে ঘুসনে সে পহলে পুলিশ চৌকি পকড় লেগা। ইয়ে গাড়িকা লাইসেন্স চলা জায়গাঽ একটু থেমে বললওহমে কুছ করনে কা নেহী হ্যয়। আপকো ইধর হী রুখনে পড়েগাঽ

আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললামওইধর কোই হোটেল হ্যয়ঽ

ওহোটেল? কেয়া বোলতা মেমসাব? সুবহে জিধর নাস্তা কর রহে থে ওহ দুকান অভিতক খুলা হ্যয়। কুছ খা লিজিয়ে। ফির আরাম সে গাড়ি মেঁ সো যাইয়েঽ

কিছু করার নেই। খেয়ে আমারা বসে রইলাম গাড়িতে।

সময়টা যেন সেই মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেছে। হাতের ঘড়ির কাঁটাটা ইলেকট্রনিক নিয়মের সময়ের অঙ্কে ঘুরে চলেছে....টিক....টিক....টিক। দিন থেকে রাতে। কিন্তু

সময়টা থেমে পড়েছে জাগুড়ার গ্রামে। আমার স্বল্প জ্ঞান বলে, গতির সঙ্গে সময়ের একটা সমস্যা আছে। যেখানে গতি রুদ্ধ হয়ে গেছে, সেখানে হয়ত সময় থেমে গেছে।

ক্রমে দিন ঢলে পড়ল রাত্রির কোলে। তবুও শরীর তো মানেনা। আমি হাল ছেড়ে দিলাম গাড়ির পেছনের সোফার কোলে। গাড়িটাই একমাত্র ছাদ। ড্রাইভার যে কোথায় হারিয়ে গেছে, কে জানে? বিধ্বস্ত , জর্জরিত অবস্হায় মনে হচ্ছে, কেন যে সকালে ওই দোকানে চা খেতে নেমেছিলাম? না নামলে তো, এই ফ্যাসাদে পড়তাম না। এই তোমার চায়ের নেশাটাই কাল করলো। এখন এখানে গাড়িতে শুয়েই দেখতে হবে কালকের ভোরের সকাল।

কার কপালে কখন কী লেখা আছে, কেউ কি তা বলতে পারে?

এখন আর কথা বলতে ভালো লাগছে না। অবসাদ, বিষাদ, ক্লান্তিতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি গাড়ির সীটে লক্ষ্যই করিনি।

ঘুম ভাঙল পাখিদের কিচিরমিচির শব্দে। মুহূর্তের জন্য মনে হল, আমি কোথায়? কয়েক সেকেন্ড....তারপর প্রকৃতিস্থ হতেই বুঝতে পারলাম, এখনও সেই জেওলিকোট গ্রামে গাড়িতেই আছি।

ফিরে তাকালাম দূর পাহাড়ের দিকে। পাহাড়ের শিবলিঙ্গের মতন শৃঙ্গের ফাঁক থেকে সুর্য্যের নব কিরণ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। দু-দিনের ক্লান্তিকে নিমেষে নৈসর্গিক সৌন্দর্য স্নান করিয়ে দিল, এক আনন্দে ভরা ঐকতানে। সেখানে বেজে চলেছে এক নতুন সুর। এক নতুন ছন্দ। যেন সুর্যের রশ্মির আলোকপাতের বন্দনাগানেওডানার রৌদ্রের গন্ধ্ব শুকতে পারছি আপ্লুত হৃদয়ের গভীর গোপন কোনে। সরস্বতীর হাতের বীণা হয়ে....নব আনন্দে আবার জেগে উঠত্তেনব রূপে নব রবি কিরণ্খে

মনে হল পাপ না করেও প্রায়শ্চিত্তের ভাগীদার হয়ে ঈশ্বর বোধহয় এই নৈস্বর্গিক দৃশ্য উপহার দিচ্ছে আমাদের ঘুস হিসেবে। ঈশ্বরের দেওয়া ঘুস। একে

তো অস্বীকার করা যায়না। তার দানকে শিরোধার্য করে গাড়ি থেকে বেড়িয়ে পড়লাম। দেখলাম তুমি তখনও গাড়ির বাইরে পাহাড়িয়া জঙ্গলা ঘাসের ওপর ঘুমিয়ে আছ।

ওএই ওঠো....আমাদের ভীমতাল পৌছতে হবে্ আমার কথায় ধরমড়িয়ে উঠে পড়লে তুমি।

ওআমি কোথায়ঃ্ তোমার মুখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস।

ও রাস্তায়্

তুমি ড্রাইভারকে স্টিয়ারিং হুইল থেকে জাগালে।

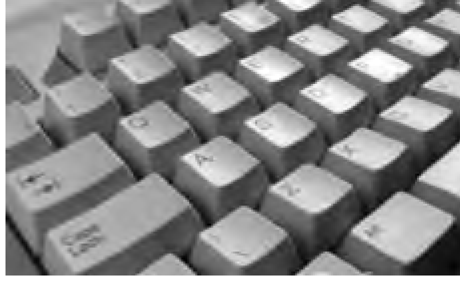
আবার রথ নামল পথে। দূর থেকে ভেসে আসছে পাখিদের কিচিরমিচির শব্দ। ছোটোবেলার ছড়াটা মনে পড়ে গেল্ওপাখি সব করে রব রাতি পোহাইল্

আমরা এগিয়ে চললাম ভীমতালের পথে।

পেছনে পড়ে রইল ঈশ্বরের দেওয়া কষ্টের মধ্যে, নতুন এক নৈস্বর্গিক সৌন্দর্যের, এর আগে না-দেখা, না-পাওয়া, না-অনুভব করা, মনের কুঠরিতে ধরে রাখার মতন এক অপরূপ স্মৃতি।

তোমাকে....

কস্তূরী



সপ্তম চিঠি

কস্তূরী

ভীমের আপ্যায়ন থেকে অবশেষে পরিত্রাণ পেয়ে তোমার সঙ্গে তাল খুঁজে পেলাম।

....ভীমতাল।

হয়ত পান্ডবদের বনবাসের মতন একটা মনোরম আস্তানা খুঁজছিলাম তোমার সঙ্গে কাটাব বলে। ভীমের নামেই এই দ্রষ্টব্য স্হান। বিশাল একটা লেকের মধ্যে একটা দ্বীপই শুধু এর আকর্ষণ নয়। পুরোনো একটি শিব মন্দির, ভীমেশ্বর মন্দির....দর্শকদের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকদের এখানে টেনে আনে। একশতবিংশ শতাব্দিতে চাঁদ বংশের কুমায়ুনের রাজা বাজ বাহাদুর এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই নয়, এই শহরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মহাভারতের আর এক অধ্যায়।

ভোয়ালি থেকে ভীমতাল যদিও মোটে এগারো কিলোমিটার, রাস্তার জন্য পৌঁছতে লেগে গেল এক ঘন্টার ওপর। এখন শুধু একটা মখমল বিছানা চাই। আর পরিষ্কার একটা বাথরুম । ব্যস...এর বেশি আর কিছু নয়। আমার অবশ্য চা টা অতন্ত জরুরি। সেটা কাল থেকেই বুঝতে পেরেছিলে। জেলিয়াকোটে রাস্তার ধারে শুয়ে আমার আর শরীরে দিচ্ছে না।

ড্রাইভার আমার দিকে তাকিয়ে বলল—কাঁহা যায়েগা সাব?

ওমন্দির মার্গ মেঁ সনোলিথ রিসর্ট পরৼ

ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে আমি বললামওতুমি মাল নিয়ে লবিতে গিয়ে বসো। আমি চেক-ইন করে আসছিৼ

আসলে আমি আমার পরিচয়টা গোপন রাখতে চাইছিলাম তোমার কাছে। কেন যে এখানে এসেছি, তাও জানাতে চাইনি তোমাকে। সেটাই তো আমাদের শর্ত ছিল, তাই নয়কি?

রিসেপশনের দিকে এগোতে, রিসেপশনিষ্ট আমার দিকে তাকিয়ে বললওকেয়া নাম বতায়াৼ

নামটা বলতেই ও বলে উঠলওওহঃ! আপ তো প্রেসকে আদমি হ্যয়। আপকে এডিটার নে ফোন কিয়া থা হামারে মালিক কো। মালিক আপকে লিয়ে লাক্সারি কটেজ রখ দিয়াৼ একটু থেমে বললওআপকো তো কল আনা থা। কেয়া হুয়াৼ

ওথোরি সি মুসিবৎ মেঁ ফস গয়া থাৼ আমি রেজিষ্টারে সই করতে করতে বললাম।

রিসেপশনিষ্ট পাশের বেয়েরার দিকে ইঙ্গিত করে বললওসহাবকো দো নম্বর লাক্সারি কটেজ মেঁ লে জাওৼ তারপর আমার দিকে ফিরে বললওইওর ফুডিং এন্ড লজিং ইস্ ফ্রী....কমপ্লিমেন্টস্ ফ্রম আওয়ার ওনার....অলসো এ কার ইজ এ্যট ইওর ডিসপোস্যল এনিটাইম। যাষ্ট ইনফর্ম দ্য রিসেপশন। টেক রেষ্ট রিল্যাক্স এন্ড এনজয়। আওয়ার ওনার উইল মীট ইউ লেটারৼ

ঘরে ঢুকে বুঝতে পারলাম সব ক্লান্তিকে মুছে দিয়েছে তোমার বিস্ময়! ঘরের অভিজাত্য দেখে নয়। আমার স্বরূপটা যে কী, সেটা হয়ত মনে মনে আঁচ করার চেষ্টা করছিলে। কে আমি? সত্যি কি আমি তাই, যেভাবে তুমি দেখেছ আমাকে? না কি, অন্য কিছু? যে লোকটা রাস্তার ধারে র্নিদ্বিধায় রাত কাটাতে পারে, সে এই স্বপ্ন পুরীতে তোমায় নিয়ে আসে কী করে?

মনে মনে মুচকি হাসলাম। এই পরিচয় না জানার খেলাতেই তো যত মজা! অপ্রত্যাশিত পাওয়ার মধ্যেই যত আনন্দ। না হলে ভেঙে যায় জীবনের ছন্দ।

তোমার স্তম্ভিত মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম “বাথরুমে কে আগে যাবে? আমি না তুমি?”

প্রশ্নটা যেন হাওয়ায় ছোড়া। তুমি কোনো উত্তর না দিয়ে, স্যুটকেশ থেকে টয়েলেটারি সেট, প্যন্টি-ব্রা আর হাউসকোটটা বার করে বাথরুমে ঢুকে গেলে। হয়ত ঠিক ঠাওর করতে পারছিলে না আমার আমিকে। দ্বন্দটা আমার চেয়েও অনেক বেশি তোমার। স্বপ্নের ওড়া ভাসমান দিগন্তের আকাশে....কোথায় যেন রাজকক্ষ স্বপ্ন পুরী তোমাকে ফিরিয়ে এনেছে বাস্তবের আঙিনায়।

বাস্তব যেন স্বপ্ন টাকে বেঁধে দিতে চাইছে উড়ন্ত পাখির বিরামহীন চলার ছন্দে। এই স্বপ্ন আর বাস্তবের টানাপোড়েনটাই তো জীবনের সব অশান্তির মূল। জীবনের ঘটনার স্রোত তো শুধু একটা মনগড়া সময়ের ব্যবধান। বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যবধান ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকে। এক সময় সেটা নিমিত্তে এসে থেমে যায়, আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে। তারপর নিভে যায় বাতি অন্তিম শয়নের সজ্জায়।

মনে হল, দু-দিনের ধকলটা উতরে বোধহয় একটু সোয়াস্তি পেয়েছ, তোমাকে হাউসকোট পরে তোয়ালে দিয়ে চুল মুছতে মুছতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে। খোলাচুলে এলোকেশী। সেই তো আমার স্বপ্নের জলপরী। সে প্রসাধনহীণ নিজ রূপে অপরূপা। তাকেই তো আমি খুঁজেছি নিভৃত অন্তরে সর্ব্বদাই স্ব- রূপে স্বরূপা। নাম নয় দিয়েছি তাকে কস্তূরী । আসলে সে আমার সুপ্ত বাসনার জলসিক্ত ডানা-কাটা পরী।

“এবার একটু শান্তি হল? তুমি রূম সার্ভিসে ব্রেকফাষ্টের অর্ডার দিয়ে খাটে একটু জিরিয়ে নাও। আমি ততক্ষণে স্নান করে আসি”

প্রাতকৃত্য শেষ করে স্নান করে যখন বাথরুমের বাইরে পা রাখলাম, তোমায় খাটে দেখতে পেলাম না। বারান্দায় উঁকি মারতে দেখলাম তুমি পলকহীন ভাবে চেয়ে আছ আকাশের দিকে।

ওএখানে কী করছ? একটু ঘুমিয়ে নিলেনাঃ

এবার আমার দিকে ফিরে তুমি বললেওএ আমায় কোথায় নিয়ে এলেঃ

ওকেন? ভীমতালের একটা রিসর্টে

ওআমি কিন্তু নিতান্তই একজন সাধারণ মেয়ে

ওকে বললে আমি অসাধারণ? সম্পর্কটা কখনও সাধারণ অসাধারণ দিয়ে বিচার হয়না। এই যে কথাটা বললে এটা সামাজিক নিয়মের ভুত-বর্তমান-ভবিষ্যতের একটা অঙ্গ। ভুত আর ভবিষ্যতটাকে নাইবা টেনে আনলে আমাদের এই চলার ছন্দে। তোমার সঙ্গে সময়টা কাটাতে দাও আমাদের নিজেদের আনন্দে

ওব্রেকফাষ্টের অর্ডার দিয়েছি। হঠাৎ মশালা ধোসা খেতে ইচ্ছে করল। তোমার আপত্তি নেই তোঃ

ওআমিও মশালা ধোসা ভালোবাসি

শাঁখরাইলের এক অখ্যাত ছেলে তো আর ব্রীটিশ ব্রেকফাষ্টের স্বপ্ন দেখতে পারেনা। লেক মার্কেট এলাকায় মশালা ধোসা খেয়েই সে কাটিয়েছে এতকাল।

ওযদি তোমার টায়ার্ড না লাগে, খেয়ে আমরা গাড়ি নিয়ে ভীমতাল লেকটা ঘুরতে যাব

ওগাড়ি? গাড়ি তো ছেড়ে দিলে

ওআরে বাবা, হোটেল থেকে আমাদের একটা গাড়ি দিয়েছে

এবার তোমার আরও অবাক হওয়ার পালা! তোমার মুখের অবাক বিস্ময় দেখে বেশ মজা লাগছিল। মহিলাদের চিন্তা ধারাকে এলোমেলো করে দিতে কার না ভালো লাগে?

এবার আর শাড়ি নয়। নীল জিনস্ আর সাদা টপস্ পড়ে মুখে একটা হাল্কা লিপষ্টিকের প্রলেপ লাগিয়ে আমার সঙ্গে গাড়িতে উঠে বসলে। বেড়াতে

এসেছি....তার প্রত্যেকটা মুহূর্তকে উপভোগ করতে চাইলে।

ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বললাম‘ভীমতাল লেক ছোড় কর ঔর কেয়া কেয়া দেখনে কা হ্যয়?’

‘বহোৎ কুছ। ভীমতাল লেক কে পাস ঔর একঠো ছোটা সা লেক হ্যয়, নল দয়মন্তী তাল। আম আদমি কা বিসোয়াস হ্যয় ইধর কা রাজা নল উস লেক মেঁ ডুব মরা। ভীমেশ্বর মন্দির কা নাম তো আপলোগ জরুর শুনা হ্যয়। ঔর কুছ আগে হিরিম্বা পর্বত হ্যয়। আপলোগ তো জরুর হিরিম্বা কা নাম ভী মহাভারত মেঁ পড়ে হোঙ্গে। উধর অব ভখন্ডি মহারাজকা আশ্রম হ্যয়। ঔর এখঠো মন্দির হ্যয় কারকোটাকা পাহাড় মেঁ....নাগ মন্দির। ঋষি পঞ্চমী কা দিন মেঁ হাজারো আদমি নাগ কারকোটা মহারাজ কে পূজা করতে হ্যয়।’

তুমি বাধা দিয়ে বললে‘হমে মন্দির-ওন্দির দেখনে কা নেহী হ্যয়। হামে সিরিফ লেক ঘুমনা হ্যয়।’

দু-দিনের ধকলের পর আবার প্রকৃতিকে কাছে করে পাওয়া। প্রকৃতির কোলে মাথা রেখে নতুন ছন্দ বোনা। এই ছিল বোধহয় তোমার স্বপ্নের বাসরে। আমি তাকে নিয়ে এলাম ভীমতালের আসরে।

লক্ষ্য করলাম, লেকের ধারে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে, তুমি পলকহীন চোখে চেয়ে আছ শান্ত জলরাশির স্নিগ্ধ সাবলীল প্রবাহের দিকে। মাঝখানে ছোট্ট একটা দ্বীপ। সেখানে দুটি বড় গাছ আর একটা ছোট্ট গাছ, যেন বিশাল জলরাশির মধ্যে একটা শান্তির নীড়ের ঐকতান শোনাচ্ছে।

এতদিন ভেবেছিলাম অবন্তিকা আর আমার ছেলের বাইরে কোনো পৃথিবী নেই। তাহলে কি তোমাকে মন ভরে চাওয়াটাই মিথ্যে? প্রকৃতি যেন নিজের মায়ায় গেয়ে যাচ্ছে জীবন সংসারের একছত্র ঐকতান। ওই গাছের সারিগুলো যেন বাবা, মা আর একটি শিশু....এই পৃথিবী....এই আমাদের জীবন। তার চারিধারে জলের মৃদুমন্দ তরঙ্গ, যেন জীবনের পূর্ণতার মধ্যে শোনাচ্ছে, একাকিত্বের নিরর

কলরব। পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন এক একটা ইউনিট। এই ইউনিট নিয়ে বাঁচা, মরা, হাসি, কান্না....জীবনের সময়ের ব্যাপ্তির অভিধান। সেটাই হয়ে ওঠে ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যতের পরিধান।

তুমি সানগ্লাসটা চোখ থেকে চুলের ওপর তুলে, আমার দিকে ফিরে বললে ওভালো লাগছে নাঃ

ওকাকেঃ

ওই নৈস্বর্গিক দৃশ্যের সমারোহকে? না তোমার ভিজে যাওয়া লিপষ্টিকের প্রলেপটাকে? না কি, তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে এই সৌন্দর্যকে অবগাহন করতে? ভালো লাগার তো কোনো ব্যখ্যা নেই। কাল নেই....সময় নেই....আছে শুধু মুহূর্তের একটুকরো অনুভূতি।

ওতুমি না বললেও, তোমার মুখ দেখে বেশ বুঝতে পারছি তোমার দু-দিনের ক্লান্তি দূর হয়ে গেছেঃ

ওদেহের ক্লান্তি তো নিমেষে জুড়িয়ে যায়। কিন্তু মনের ক্লান্তি ঃ

ওসেটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমিও হতে পারে। নয়কিঃ

ওএর স্হায়িত্ব কতখানিঃ তোমার কোথায় যেন একটা সংশয়।

ওমুহূর্তের জন্য। আচ্ছা বলত কোনো কিছুর স্হায়িত্বই বা কতখানি? সব কিছুই তো হারিয়ে যায় সময়ের স্রোতে। এমনকি আমাদের জীবনটাওঃ

ওজীবন হারাতে পারে। প্রকৃতি হারায় নাঃ

ওতাও হারিয়ে যায়। এই দেখোনা না জাপানের একটা ভলক্যানো প্রকৃতিকেও ছিন্নভিন্ন করে দিল এক নিমেষেঃ

তুমি ধ্বংসের গান শুনতে চাইছিলে না এই মুহূর্তে। তুমি শুনতে চাইছিলে জীবনের সুরে না-বাঁধা নতুন কোনো এক ঐকতান। যার শুরু , জেলিয়াকোটের পাহাড়ের পেছন থেকে বিকশিত দিনের প্রথম আলোর আভাসে ঈশ্বরের ঘুসের

মাধ্যমে। গেয়ে ওঠা নতুন কোনো সিম্ফনি। সে সিম্ফনি হয়ত বিথোভেন, মোজার্ট, টাইচেকোভিস্কি, স্ট্রস রচনা করেনি। সেখানে হয়ত আলি আকবর আর রবিশঙ্করের কোনো যুগল বন্দিস নেই। সেখানে আছে একটা সুদূর না-চেনা পথ। আর ভালোলাগার একটুকরো মুহূর্ত।

সানগ্লাসটা খুলে বললেওআচ্ছা....ওই যে পাহাড়ের মাঝ দিয়ে লেকটা বয়ে গেছে, কোথায় গেছে বলতঃ

গন্তব্যটাই যদি জানাই হয়ে গেল, চলার মাধুর্যটার তো সেখানেই ইতি। পথ যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে বোধহয় মুহূর্তটাও হারিয়ে যায়। পড়ে থাকে ফেলে আসা একটা স্মৃতি। জীবনের ধূসর বালুচরে এক শূন্যতায় ভরা আগামী দিনের পৃথিবী।

আমি লেক থেকে বয়ে আসা, তোমার হাওয়ায় ওড়া চুলে ঢাকা মুখের দিকে তাকিয়ে বললামওলেকের শেষটা খুঁজে কী হবে? যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেটাই তো বেশ্ব

না কি লেকের ধারের রেলিংটাই শেষ? ওপার টপকালেই অনিশ্চয়তার এক অজানা তরঙ্গের স্রোত । যে স্রোতে ভাসব বলে বেড়িয়েছি ঘরের বাইরে। যে স্রোতে ভেসে চলেছি গন্তব্যহীন অজানা গমতব্যে। দূর অথবা নিকটে। সুদূরটা যেন ক্রমশ নিকটের হাতছানি দিচ্ছে, এক না লেখা দ্বৈত সুরে। ব্যবধানটা যেন সুদূর থেকে নিকটে চলে আসছে জলপুঞ্জের অভিবাদনে।

সূর্য্য তখনও মধ্য গগনে তার আলোর বর্ষা ছড়িয়ে দেয়েনি। তপ্ত উষ্ণ তায়, ছায়ার আশ্রয়ের সন্ধানে, আমাদের নিবিড় কোমল আনন্দের তহবিলে হাত বসায়নি। শুধু স্নিগ্ধ জলরাশির মধ্যে মুক্তর মতন আলোর ফুলঝুরি ছড়িয়ে দিচ্ছে দিকে দিকে। দিনের বেলায় যেন কোনো অচেনা দেওয়ালি উৎসবে মেতেছে, চেনা নিয়মের বাইরে। অচেনা হৃদয়ের নিঃশব্দ স্পন্দনে। তোমার সাথে একাকী দাঁড়িয়ে....জানিনা কোন উপত্যাকায় হারাতে। সেকি ফুলঝুরির রঙে নতুন বেশে

না-পাওয়াকে সাজতে? পাহাড়ের মাঝ দিয়ে এঁকে বেঁকে ওই অজানার জলের বাঁকে; হারিয়ে যাওয়া দৃশ্যের অন্তরালে ....

তুমি জিভটা ঠোঁটের ওপর বুলিয়ে আঙুল তুলে বললেওআচ্ছা ওই দ্বীপটায় যাওয়া যায়না? ওখানে তো দেখছি একটা বাড়িও আছেঽ

ওদেখি খোঁজ করেঽ আমি হারিয়ে গেলাম পেছনের ভিড়ে। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললামওওখানে একটা রেষ্টুরেন্টও আছে। নৌকোতে করে যাওয়া যায়। বেশি দূর নয়....নব্বই মিটারঽ

ওতাহলে চলোনা....ওখানে যাইঽ জল যেন আবার হাতছানি দিল তোমাকে।

আবার সেই জল। নৌকতে বসে তোমার মুখের দিকে চেয়ে বহুদিন আগে মান্না দে র গাওয়া উত্তমকুমারের লিপেওশঙ্খবেলাঽ ছবিটার গান মনে পড়ে গেলঃ

ওকে প্রথম কাছে এসেছি?

কে প্রথম চেয়ে দেখেছি?

কিছুতেই পাইনি ভেবে

কে প্রথম ভালোবেসেছি?

তুমি না আমিঽ

তুমি না আমি?

সৌম্যদার বিয়েতে রুপোলি থালায় গোলাপটা তুলে দেওয়ার মধ্যে কোথায় যেন একটা কম্পন শুরু হয়ে গেছিল। জীবনের ক্লীশে হারিয়ে যাওয়া হৃদয়ের কম্পন। পঞ্চোন্দ্রিয়র বাইরে না-বোঝা, এর আগে না-শোনা, হৃদয়ের এক স্পন্দন।

কে শুনেছিল প্রথম? তুমি না আমি?

ওচাইনিজ না কনটিনেন্টলঽ তোমার সানগ্লাস খোলা কাজলকালো চোখের দিকে তাকিয়ে মেনু কার্ড হাতে প্রশ্নটা ছুড়ে দিলাম তোমাকে।

ওকন্টিনেন্টল্ হাওয়ায় ওড়া চুলটাকে পেছনের দিকে ঠেলে বললে আমাকে।

আমি যখন মেনু কার্ড ওলটাতে ব্যস্ত , তুমি তখন চেয়ে আছ নীল জলরাশি ছাড়িয়ে ওই পর্বত শৃঙ্গমালার দিকে। পাহাড়ের বেষ্টনিতে আবদ্ধ মৃদু কম্পনে লিপ্ত অতলের খোঁজে। যেখানে মুক্ত খুঁজতে গিয়ে ঝিনুকের মধ্যে হারিয়ে গেছে সকলে। ডুবুরিরা সে কথা ভালো বলতে পারে।

মেনু কার্ডটা দেখছিলাম বটে, মন বলছিল, তুমি ভালোবাসো জলের কাছে বসে থাকতে। মনে আছে, একদিন রোয়িং ক্লাবে জলের পাশে বসে বলেছিলে ওজল আমার খুব ভালো লাগে্

কার না ভালো লাগে জল, ফুল, অরণ্য, পাহাড়, সমুদ্র? কার না ভালো লাগে হৃদয়ের স্পন্দনকে কাছে বসে শুনতে? কার না ভালো লাগে মাঝরাতে বসে তারা গুনতে?

মনে মনে তারা গোনার একটা জল্পনা করছিলাম। হঠাৎ ঘরের ফোনটা বেজে উঠল।

ওহু ইজ ইট২্

ওমৈ ইস হোটেলকা ম্যনেজার হু মিঃ গোলেরিয়া। আপকে সাথ থোড়া মুলাকাত করনা হ্যয়। আ সকু২্

পাছে তুমি আমার আসল পরিচয় জেনে যাও, সেই ভয়, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম ওম্যয় আপকা অফিস মে অভি আ রহা হু্ঁ

ধরনের পাজামা-পাঞ্জাবিটার ওপর চটি গলিয়েওআসছি্ বলে ঘর থেকে বেড়িয়ে এলাম আমি।

মিঃ গোলেরিয়া নিজের অফিস স্যুইটে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে সাদর অর্ভ্যথনা করলেনওআইয়ে....আইয়ে..২্

মধ্যেবয়সি এক টাক মাথা লোক। পরনে সাদা-সার্ট সাদা-প্যন্ট। মুখের কাঁচা-পাকা গোঁফটা যেন অম্লান বদনে সারা মুখের শোভা বাড়িয়ে দিয়েছে। কলেজ জীবনে অনেককেই ঠাট্রা করে বলতে শুনেছিওহী ইস লুসিং হেয়ার্। আমার ওকে দেখে মনে হলওহী হ্যস গেইন্ড ফেস্। সেই ফেসের ফাঁকে অবশিষ্ট দাঁতের মহিমা ছড়িয়ে বললওওয়েলকাম ট্যু আওয়ার হাম্বেল রিসর্ট্ বলে চেয়ারটায় আমাকে বসতে ইঙ্গিত করে বললওকুছ তকলিফ তো নেহী হো রহা হ্যয়্

মাথা নেড়ে বললামওবিলকুল নেহী। আপকে আদমি বড়ে দিল সে দেখভাল কর রহে হ্যয়্

ওইয়েহি তো হামারে রিসর্ট কা মোটো হ্যয়। হর আদমি যো ইধর আয়, উসে আপনা বনা লো। লোক তো সভি নৈনিতাল মেঁ রহ কর ভীমতাল ঘুমনে আতে হ্যয়। আপ কেয়া নৈনিতাল ভী জায়েগা্

মাথা নেড়ে বললামওনেহী নেহী। নৈনতাল মেঁ তো বহোৎ রিসর্ট হ্যয়। হম তো ও সব রির্সটকে কাহানী লিখনে কে লিয়ে ইঁহা নেহী আয়ে। মৈ তো জিধর আদমি কম আতে হ্যয়, উধর কে বারে মেঁ লিখনে আয়ে হুঁ্

ওফির তো হামারে রিসর্ট কে বারে দো পাঁচ বাত আচ্ছে সে লিখে দে তো বড়ি মেহেরবানি হোগী্

জরুর ইস লিয়ে তো ইধর আয়া হুঁ্ আমি সায় দিলাম।

ওআরাম সে রহিয়ে। জিতনা দিন দিল মেঁ চাহে্ বলেই বেলটা টিপল। আর্দালি ঘরে ঢুকতে বললওদো কাপ কফি দেনা। বড়িয়া সে..্

আমি বাধা দিয়ে বললামওকেঁও ইতনা তকলিফ করতে হ্যয়? আপকা আদমি তো অচ্ছে সে দেখভাল কর রহে হয়্

ওভাইসাব....আপ হামারে মেহমান। এক চায় ভী পিলা নেহী সকু তো হামারি গুসতাকি হোয়েগা্

ওর দিকে তাকিয়ে বললামওকল লাঞ্চ কে বাদ চলা জানে পড়েগা। ঔর কোই রিসর্ট কে বারে মেঁ ভী তো লিখনা হ্যয়২

ওকাঁহা যা রহা হ্যয়২

ওবিনসার২

ওইয়ে তো নব্বই-শও কিলোমিটার হোয়েগা। পাহাড়ি রাস্তা হ্যয়। করিব তিন সাড়ে-তিন ঘন্টা লগ যায়েগা। ইয়ে আপ ভোয়ালি সে আয়া না? উধর সে কৈঞ্চি রাতিঘাট হোকে কৈরানা ব্রীজ পার হো কর কাকারিঘাট সুলিয়াসারি হো কর আলমোরা পৌহচনা হ্যয়। ফির কপর খান সে গয়রাদ বেন্ড পার হোকে বিনসার পৌহচেগা২ মিঃ গোলেরিয়া এক নিশ্বাসে বলে গেল।

আমার কিছুই মাথায় ঢুকল না। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে। আমার দিকে তাকিয়ে বলল্ওফিকর মত কিজিয়ে। জান-পেহচান এক আচ্ছা সা কিড়ায় কা গাড়ি ঠিক কর দুঙ্গা। আপলোগ কিতনে বজে জানে মাঙ্গতে হ্যয়২

ওলাঞ্চ কে বাদ। করিব দেড়-দো বজে..২ একটু থেমে বললামওআপ কেয়া ইঁহা কে রহনেওয়ালে হ্যয়২

ওনেহী সাহাব। মৈ তো মুম্বাই কে আদমি হুঁ। উধর তো বহোৎ কম্পিটিশন য্যদা হ্যয়। ইসলিয়ে ইধর চলা আয়া। তভি ইধর কোই আদমি নেহী আতে থে। জমিন ভী সস্তে মেঁ মিল গয়া। সোচা, কেউনা ইধর-ই এক রিসর্ট কর লেং২ কফির কাপটা বেয়ারা ততক্ষণে আমাদের মধ্যেখানের টেবলে রেখে গেছে। ওটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল্ওলিজিয়ে সাব২

কফির কাপে চুমুক দিয়ে ভাবছিলাম রিপোর্টার হওয়ার অনেক পার্কস্ আছে। এই যে ফ্রী থাকা-খাওয়া শুধু দু-কলম গুছিয়ে লেখার জন্য।

মিঃ গোলেরিয়া কফিতে চুমুক দিয়ে বলল্ওআপকা পেপার তো সারে ভারত মেঁ বহোৎ চলতে হ্যয়। জরদর হামারে রিসর্ট কা কোই তসভীর খীঁচা? ফিরভি..২ ড্রয়ার থেকে একটা প্যাকেট বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিল।

আমি একটু ভ্যবাচ্যকা খেয়ে গেলাম। ঘুস দিচ্ছে না তো?

ওইয়ে হামারে রিসর্টকা কা ফোটো হ্যয়। মেহেরবানি কর কর দো একঠো ছাপ দে তো..২

ওজরুর....ইয়ে কোই বাৎ হ্যয়২ এই বিনা পয়সার আতিথিয়তার বাইরে এইটুকু করতে পারব না ওর জন্যে?

রিসর্টের স্টোরিটা তো একটা উপলক্ষ্য মাত্র। তোমাকে নিয়ে কোথাও বেরোবার জন্য মন আঁকুপাকু করছিল। তাইত রিসর্টের স্টোরির নাম করে বেড়িয়ে পড়া। আমার মতন এক নগণ্য রিপোর্টারের কী ক্ষমতা আছে তোমাকে এই লাক্সারি ট্রিপে ঘোরানোর? হয়ত ট্রেনের সেকেন্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টে চড়ে কোনো সস্তার হোটেলে থেকে ঘোরা যেত। কিন্তু অবন্তিকার কাছেই বা কী জবাব দিতাম? আর মাস-মাইনের চাকুরে সে টাকাই বা জোগার হত কোত্থকে? প্রশ্ন করতো না অবন্তিকা ?

ওর দিকে তাকিয়ে উঠতে উঠতে বললামওআপ ফিকর মত করিয়ে ভাইসাহাব। মৈ বড়িয়া সে ইয়ে রিসর্ট কা কাহানী লিখুঙ্গা। বিসওয়াস রখিয়ে। আপকো ভী এক কপি ভেজ দুঙ্গ২

ঘরের বাইরে বেরিয়ে মনে হল, এরা পাবলিসিটির জন্য লাখ লাখ টাকা ঢালছে। পেপারে, টিভি এ্যডে। একদিন আমাকে একটু ফাইভ ষ্টার ট্রিটমেন্ট করাটা, এসবের কাছে কতটাই না নগণ্য! কিন্তু এই আতিথিয়তার ফলপ্রশু দু-কলম গুছিয়ে লিখতে পারলে পরিসীমা সুদূরপ্রসারী। বাণিজ্যিক দিক দিয়ে এর ব্যাপ্তি অসীম।

ঘরে ঢুকতেই দেখলাম তুমি একটা গোলাপি রং-এর জগিং ড্রেস পরে খাটের ওপর পা ছড়িয়ে মোবাইলে কার সঙ্গে কথা বলছ। আমাকে ঢুকতে দেখেইওআচ্ছা রাখছি২ বলে ফোনটা কেটে দিলে। বুঝলাম তোমার পরিচয়টা তুমি আমার কাছে আত্মগোপন করলে।

পাঞ্জাবির পকেট থেকে ছবিগুলো স্যুটকেসে ঢোকাতে ঢোকাতে বললাম ওলেকের ধারে একবার বেড়িয়ে এলে হয়নাঃ

ওএই সন্ধ্যেবেলাঃ অবাক চোখে তাকালে আমার দিকেওঘরে বসে থাকতে তোমার যেন মন চায়নাঃ খাটে একটু সরে পা টা খাটের প্রান্তে ঝুলিয়ে একটু অনীহার স্বরে বললেওআবার জামাকাপড় পড়তে হবেঃ

ওকেন যা পরে আছ, তাই পরেই চলোনা কেন? এই ভর সন্ধ্যেবেলা আমাদের দেখছেটাই বা কেঃ

এবার তোমার চোখে-মুখে একটা প্রসন্নতার হাসি ফুটে উঠলওবেশ....তবে চলো....গাড়িটা আছে তোঃ

ওফোন করে দিচ্ছি। হোটেলেরই তো গাড়ি। কোথায় আর যাবেঃ

সামনে কুলকুল করা জলের শব্দ ছাড়া জোৎস্নার শেষ আলোটুকু কেড়ে নিয়েছে অন্ধকারের ধুসর। মায়াবী পৃথিবীর স্বপ্নের জ্বলজ্বল করা ডুবে যাওয়া চাঁদটার লোড শেডিং করা অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে। সেই মৃদুমন্দ তরঙ্গের ক্ষীণ কলেবর যেন জানান দিয়ে যাচ্ছে, আমাদের অন্তরের নিভে যাওয়া স্ফুলিঙ্গের ম্রিয়মান ফল্গুধারা যেন অন্তরের গভীরে একটা নব প্রস্ফুটিত গোলাপ হয়ে ফুটছে। ঠিক তোমার হাতের রুপোলি থালার ওই গোলাপটার মতন। হয়ত প্রস্ফুটিত হচ্ছে নতুন এক বহ্নি শিখার জাগরনের ছন্দে। গোলাপ কিন্তূ কাঁটা নিয়েই জন্মায়। তাই শঙ্কা ছিল আমার মধ্যে।

ভীমতাল লেকের ধারে আমরা দুজনে জলের ধারের বেঞ্চিতে বসে আছি। ওই আলো-আঁধারিতে তোমার মুখটা ভালো করে দেখাও যাচ্ছে না। একটা সিল্যুট যেন আমার মনের লেন্সে কায়া আর মায়ার যুগলবন্দি খেলছে।

কাকে ধরব?

এখন শুধু ভেসে যাওয়া অনুভূতির মায়া। মন চাইছে অন্য কিছু। না....না....মায়া নয়, কায়া। তোমাকে একটু ছোঁয়া....একটু কাছে পাওয়া....সম স্ত

সত্ত্বা দিয়ে নিজের করে নেওয়া। হয়ত সেটা দূরের কোনো কুহকের ডাক। সেটাই আমি। এই মুহূর্তে অতীত হয়ে যাক নির্বাক।

মায়া?

না কি, আধো আবছায়ায় ছুটে চলা জীবনের বালুচরে একটুকর মুহূর্ত মাত্র?

সেই আঁধারের বিপুলতা ভেদ করে তোমার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল পুরোনো দিনের একটা বাংলা গানঃ

ওনেই সেই পূর্ণিমা রাত

কিছু সুর কিছুটা আবেগ

এ কি শুরু না শেষ?

বোঝানোর নেই কোনো ভাষা....

ভুল কে সে ভুলে ভালোবাসা

সবই যেন ভালো লাগে..২

তুমি কি কিছু বোঝাতে চাইছ আমাকে? অন্ধকারের গভীরে ওই সপ্তর্ষির দিকে চেয়ে? হয়ত ওই তারার মধ্যে চেতনাটা একটা নতুন প্রদীপ জ্বালাবার চেষ্টা করছে। না-রং-এর তুলিতে আঁকা এক ছন্দ, সুর, গন্ধ মাখা বর্ণছটায়। হয়ত মন হাতড়ে বেড়াচ্ছে একটা অস্পষ্ট না-চেনা ধূসর অবয়ব। নিভৃত অন্ধকারের মাঝে টিমটিম করে মনের অন্তঃসলিলে একটা দিয়া জ্বালাতে চাইছে। একটা অস্পষ্ট ছায়াকে ভরিয়ে দিতে চাইছে কায়ার সিল্যুটের মধ্যে....মায়ার মোহজালে। দেখার আকাশে, অদেখাকে কাছে পাওয়ার এক নিভৃত অন্তরের নিঃশব্দ চাওয়া। চাওয়াটা যেন অনন্ত মহাশূন্যে ভাসছে....একটা নতুন রাগের না-লেখা স্বরলিপিতে....আবেগের ঘোরে....ভাষাহীন কোনো সুরে।

সে সুর তো তোমার। সে সুর তো আমার। সে সুর তো আমাদের দুজনের। সে সুর তো যুগ-যুগান্তরের নিঃশব্দে গেঁথে যাওয়া মালা, অন্তহীন পথে। না-পাওয়া

জীবনের রক্তিম অনন্ত রাগে। সুরের ঝর্ণার নিঃশব্দ প্লাবনে। যেখানে তান মিশে যায় লয়ে। যেখানে মন খুঁজে বেড়ায় দোসর অনাদি কালের পটভূমিতে। যেখানে কাল শুধু বারংবার কষ্ঠিপাথরে যাচাই করতে চায় তাকে, আগুনের যজ্ঞহুতাগ্নিতে। নীরব চাওয়ার মায়াময় বাহুডোরে.... দিগন্তের বিস্তৃত শাশ্বত সত্যের নব নব রূপে ।

আমি আলতো করে, পাশে বসে থাকা, তোমার হাতে হাত রাখলাম। যেমন রেখেছিলাম বহুদিন আগে, ইডেনের নরম ঘাঁসের বিছানার মখমলে। একটু চাপ দিলাম। তুমি কিন্তূ হাতটা সরিয়ে নিলেনা।

ফিসফিস করে বললে “হোটেলে যাবেনা?”

সেই মুহূর্তে কল্পনা যেন নেমে এল বাস্তবের আঙিনায়। চাওয়াটা আর ওই দূরে দীপালি জ্বালানো নক্ষত্রের স্বপ্ন দেখা, না-পাওয়া রাতের ঘুমে-জাগরণের দগ্ধ বহ্নি নয়। চাওয়াটাকে পেতে হবে বাস্তবের আঙিনাতে....তাকে মেলাতে হবে পরিপূর্ণতার স্বাদের প্রাসাদে। দেহ মন আজ এক হয়ে যাক ভীমতালের অন্ধ তিমিরের আচ্ছাদনহীন গভীর সলিলে। আমাদের ভালোবাসার অঙ্গীকার থাকুক আজকের রাতের হিল্লোলে।

কটেজের দরজা খুলে ঘরে ঢুকতেই চমকে উঠলাম!

একটা বিশাল ফুলের তোড়া টেবলের ওপর রাখা। পাশে রংতায় মোড়া একটা বাক্স। ফুলের তোড়ার ওপর ছোট্ট একটা কার্ড। তাতে লেখা “ইট ওয়াজ আওয়ার প্লেসার ট্যু সার্ভ ইউ...উইথ কমপ্লিমেন্টস্ ফ্রম সনোলিথ রিসর্ট”

তুমি বাথরুমে ঢুকতে ঢুকতে বললে “কে পাঠিয়েছে গো?”

“হোটেল ম্যানেজমেন্ট”

কী জানি কি ভাবছিলে সেই মুহূর্তে। বাথরুমে জলের শব্দ ইতি টেনে দিল আমার কল্পনার স্রোতে। রাংতা মোড়া বাক্সটা খুলে দেখলাম, যা অনুমান করেছিলাম আগেই। হুইস্কির বোতল....গ্লেন মর্গ্যাঙ্গি সিঙ্গল মল্ট।

কটেজের বারান্দার সোফায় বসে চিকেন পকোড়া আর স্যাসেজ এর সঙ্গে হুইস্কিতে চুমুক দিচ্ছিলাম।

বেয়ারা জিজ্ঞেস করলওডিনার কিতনে বজে দেগা? ঔর অভি অর্ডার দে দে তো বড়ি মেহেরবানী হোগীঃ

ওসাড়ে নও। অন্দর মেমসাব সে পুছ লেনা ডিনার মেঁ কেয়া খায়গীঃ

এমনিতে বড় একটা সিগারেট খাইনা। আজ যেন খেতে ভীষণ ইচ্ছে করছিল। ফেরার পথে এক প্যাকেট কিনেও এনেছি। ধোঁয়াটা হাওয়ায় ছুড়তে ছুড়তে মনে হল, হয়ত বা মুহূর্তটাই এই ধোঁয়ার মতন। পলক ফেলতে নিমেষে মিলিয়ে যায় বোঝবার আগেই। হয়ত আমাদের চাওয়া-পাওয়াটাও ঠিক একই সূত্রের পথ ধরে হাঁটে। সময়টাকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চায় একাকী নীরবে। রাতের গভীর যেন সেই অন্ধকারে উষ্ণ চাওয়ার কথা বলে। হুইস্কির মাদকতা সেই আগুনের যজ্ঞের অগ্নিতে আরও বেশি করে ঘি ঢালে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে তুমি জগিং ড্রেসটা ছেড়ে একটা পাতলা ফিনফিনে সুতির নাইটি পরে বসলে আমার পাশে।

সোফার হাতলে হাতটা রেখে বললেওআমার ভডকাটা দিয়ে গেছেঃ

ওহুঃ বোতলটার দিকে ইঙ্গিত করে বললাম।

ওতোমার অনেক পয়সা খসাচ্ছি? তাই না গো? আমার সঙ্গেও কিছু আছে। ক্রেডিট কার্ডওঃ

ওদরকার হলে চেয়ে নেবঃ আমি উদাসীন ভাবে হুইস্কিতে চুমুক দিলাম।

তুমি স্যাসেজে কামড় দিয়ে, ভডকার গ্লাসটা হাতে তুলে সেই আঁধারের মায়াকে, কায়ার আকার দিয়ে ছিন্ন করে বললেওএখানে রাতটা তো বেশ। এমন রাত অনেকদিন আসেনি আমার জীবনেঃ

তোমার তালে সায় দিয়ে বললামওআমারও....কখনো আসেনি আগেঃ

সেই মুহূর্তে দুটি যুগল আত্মা মিশে গেল যুগ-যুগান্তরের স্রোতে। অনাদি কালের কালপ্রবাহের উৎসের তেপান্তরের । সবাই তো সেই মুহূর্তে সেই কথাটাই শুধু বলতে চেয়েছে নিঃশব্দে নীরবে একাকী নিজের মনে মনে। আজও অবলা থেকে গেছে সেই নীরব বাণী না-বলা রেশ হয়ে....চুপি চুপি একা, ব্যথার বেহাগের সুরে। তবুও উত্তর মেলেনি তার....যুগের প্রান্তরে চলার গতিপথের পথ মাড়িয়ে, সময়ের হাতে হাত রেখে, যুগ থেকে যুগান্তরে। আমরা তো খুঁজতে এসেছি সেই অদেখা মুহূর্তকে হৃদয় দিয়ে ভরে ।

আবার তোমার দিকে তাকালাম। অবয়বটা এখন বারান্দার আলোয় অনেক বেশি স্পষ্ট। ভীমতাল লেকের স্যিলুটের মতন ধূসর নয়। একটা উষ্ণ অনুভূতি ভেতরে ভেতরে যেন কেউটের মত ফণা তুলে উঠছে। তোমার ফিনফিনে নাইটির পেছনে লুকিয়ে থাকা অবয়বটা যেন বারবার সেই সুর শোনাচ্ছে। এ তো আমার মনের ভাবনা। তোমাকে বলিই বা কী করে সে কথা?

তুমি গ্লাসটা নামিয়ে রেখে হঠাৎ প্রশ্ন করলে আমাকেওআচ্ছা আজকের রাতটা কি পৃথিবীকে ভুলে নিজের মতন করে নিতে পারিনাঽ

হয়ত তোমার অনেক কষ্ট হয়েছিল এ কথাটুকু বলতে। অনেক সংস্কার বাধা লঙ্ঘন করে, ভীমতালের পর্বতমালা উত্তরণ করে, সমাজ সংস্কারের বেড়াজাল টপকে, নিজেকে মেলে ধরতে। আমিও তো ঠিক সেটাই চাইছিলাম তোমাকে না-জেনে, না-চিনে নিজের মতন করে বরণ করে নিতে। আমার আবেগহীন উষ্ণ তার শেষ প্রত্যুত্তর গুনতে।

স্মিত হেসে বললামওভডকা আর স্যসেজটা চেখে দেখ। রাত তো এখনও ফুরিয়ে যায়নি। অনেক বাকি পড়ে আছেঽ

ওজীবনটাই তো রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। কবে শুনব ভৈরবীর সুর? কোন সে প্রভাতেঽ

ওআজকে না হয় দিনের শেষে তোমাকে উজাড় করে দিলাম। পাওয়া না-পাওয়ার হিসেব নয় কালকে বুঝে নিলাম্

ওরাত তো একদিন ভোর হবে প্রতিদিনের মতন সুর্য্যের আলোমাখা রোদ্দূরে। সেদিনও কি তুমি থাকবে আমার না-বলা কথার স্রোতেঃ

আমি তোমার পাশে একটু এগিয়ে বসলাম। হাতখানা মেলে দিলাম তোমার কাঁধের ওপর। তোমার গালে নাকটা ঠেকিয়ে বললামওভালো লাগাটাই তো এই মুহূর্ত। তাকে কালকের চিন্তায় নষ্ট করে দিওনা্

সেই মুহূর্তে ভীমতালের অন্ধকার লেকের চারিধার বিলীন হয়ে গেল আমাদের যুগল চাওয়ার উষ্ণবহ্নির উত্তপ্ত প্রলয়ে। যেন লেকের পাকস্থলি থেকে বেরিয়ে একটা সুনামি রচনা করছে আমাদের দেহের প্রতিটা কোষে। জ্বলছে দেহ, নীরব মন, চাইছে আলো, বাসনার স্রোতে। এই সুনামীটা ক্রমশ লেকের গভীর থেকে আমাদের দেহে কামনার ভলক্যানো জাগাচ্ছে প্রতিটা কোষ জুড়ে....প্রতিটা রোমকুপে। আর নয়....আর বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারব না নিজেকে।

বারান্দার গদি থেকে উঠে পড়লাম।

ওকোথায় চললেঃ তুমি জেনেও বোকার মতন প্রশ্ন করলে আমাকে।

ওঘরে্

রোশনাই ভরা ঘরের বড় বাতিটা নিভিয়ে দিলাম। বেড-সাইড ল্যাম্পের আলোটা একটা মায়াবি ঘোর সৃষ্টি করেছে। খাটে শুয়ে গোটা হাতটা দিয়ে চোখ দুটো আড়াল করলাম। নেশার রং-টাকে আলো-আঁধারে উপভোগ করতে।

জানিনা কতক্ষণ!

সৌম্যদার বিয়েতে তোমাকে দেখা মটকা শাড়ির আভরণটা ক্রমশ যেন হাওয়ায় উড়ে হারিয়ে যাচ্ছে আমার কল্পনার মায়াবী স্বপ্নের । এখন আর আমি তোমাকে বিয়ে বাড়ির সাজে দেখতে পারছিনা। তোমার হাতের গোলাপটাও যেন

কোথায় হারিয়ে গেছে। এখন তুমি সজ্জাহীন অপরূপা। তোমার শ্যামলা অবয়বটা ভেসে উঠছে চোখের সামনে। তোমার নিটোল চোখের গাঢ় দৃষ্টি, তোমার টোল পরা হাসি, তোমার উষ্ণ অধর, তোমার শাঁখের মতন বেরিয়ে আসা চিবুক, তোমার সুন্দর গলা, তোমার তুলতুলে জোৎস্নার মতন কান, তোমার বিদ্রহ করা নন্দাদেবীর সুউচ্চ পাহাড়ের মত স্তব্ধ স্তন , তোমার ঢেউ খেলানো কোমরের মধ্যে মদির দীপ্ত গভীর নাভি, তোমার স্তনের চেয়েও আকর্ষণীয় পরিপূর্ণ দুই নিতম্ব যেন খাড়া পাহাড়ের বুক চিড়ে খরস্রোতা নদীর কুলকুল রবে হারিয়ে যাচ্ছে, কোনো জানা অথচ না-দেখা গহন অরণ্যের গভীরে....

আমিও হারিয়ে গেছি আমার স্বপ্নের বাসর সজ্জায়। লক্ষ্য করিনি কখন তুমি মৃদু পায় ঘরে প্রবেশ করেছ। বুঝতে পারলাম যখন আমার হাতটা সরিয়ে দিলে আমার চোখের ওপর থেকে।

ওকী স্বপ্ন দেখছিলে এতক্ষণ ধরে? আমি তোমার মায়াবী কল্পনা নই। আমি জীবন্ত রক্ত মাংস দিয়ে গড়া....তোমারই কস্তূরীঽ

বলতে বলতে তোমার ওষ্ঠের চুম্বন এঁকে দিলে আমার কপালে।

ওএবার হুশ হয়েছে? স্বপ্ন থেকে ফিরে আসার সময় এবার এসেছেঽ

তোমার ঠোট স্পর্শ করল আমার ঠোঁট। তোমার স্তন ঝুলে রং-তুলির মতন ছবি এঁকে দিচ্ছে আমার পাঞ্জাবি পড়া রোমশ বুকে। তোমার নিতম্বের ছোঁয়া যেন উল্কা তুলছে, আমার পাজামার মধ্যসহলে। তোমাকে দুহাতে আঁকড়ে লেপটে দিলাম আমার দেহের ওপর। ওই বেড-সাইড ল্যাম্পের আলো-আঁধারিতে লক্ষ্য করলাম তোমার শিথীল নাইটিটা কখন লুটিয়ে পড়েছে মেঝেতে। আমার পাঞ্জাবির বোতাম আলগা করতে করতে তুমি আঁকিবুকি কাটতে শুরু করলে আমার বুকে। যেন মুক্তি দিতে চাইছ আমাকে, আমার আভরণ থেকে। সুতিহীন ছোঁয়ার আলিঙ্গনের প্রতীক্ষায়....

সেই মুহূর্তে নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে থেকে বাধ ভাঙা বহ্নি ছিটকে বেরিয়ে এল আমার দেহের প্রতিটা রন্ধ্রে। মুক্তি চাই....এই দেহ, এই মন, এই আবেগ, এই সময়, যেন সেই সুর গাইছে উষ্ণ দোলার ঝুলনে। আকাশ বাতাস, দেহ মন কেঁপে উঠল থরথর করে। যেন ভেঙ্গে আছড়ে গুড়িয়ে দিতে চাইছে তোমাকে, অনাদি কালের বাসনার দ্বার উন্মুক্ত করে। ঝড় উঠেছে দেহে-মনে-শরীরের প্রতিটা শিরা-উপশিরার উষ্ণতার আকাশে।

আমরা দুজনে আমাদের অতীত, আমাদের ভবিষ্যৎ ভুলে হারিয়ে গেলাম বর্তমানের সেই প্রলয় ঝড়ে....আজ-কাল-পরশুকে পেছনে ফেলে। খরাতপ্ত আত্মার দীর্ঘশ্বাসের শ্বাস-প্রশ্বাসে...ঝর্ণার উপচে পড়া জলপ্রপাতে....

শ্বাসের গভীর উলুধ্বনির সপ্তম নিখাদ জানান দিয়ে গেল, আমরা হারিয়ে গেছি আমাদের পার্থিব চাওয়ার সীমাহীন বিভোরে।

তোমাকে....

কৌস্তভ



অষ্টম চিঠি

কৌস্তভ

শূন্য অন্ধকারের দিকে এক দৃষ্টে চেয়েছিলাম আমি।

সন্ধ্যা তখন ধীর পায়ে গুটি গুটি করে ছেয়ে ফেলেছে কিছুক্ষণ আগে দেখা হিমালয়ের চূড়াগুলো। একটা কালো আভরণ বিছিয়ে দিয়েছে দূর নীল দিগন্তের বনরাশির ওপর। গাঢ় হয়ে গুটি গুটি পায়ে নামছে রাত্রির অন্ধকার তার কোমল আচ্ছাদন বিছিয়ে। নিরবচ্ছিন্ন রিসর্টের কটেজের বারান্দার আলে রাতের অন্ধকারে ঢাকা সন্ধ্যাতারার আগরবাতি জ্বালিয়ে। শান্ত নীরবতার ধূসর অন্ধকারের কোলে। স্থির শিথিল গুটি গুটি পায়ে। পাহাড়ের বুকে নিঃশব্দের গান শোনাতে....

বেয়ারা জ্বালানো হ্যজাকটা নিয়ে এল।

আগেই শুনেছিলাম, এখানে কোনো ইলেকট্রিসিটি নেই। আলো ভালো লাগছে না। কাল রাতের জ্বলে ওঠা দেহের আলোটা, আজ যেন কেমন হিম হয়ে গেছে আজকের অমাবস্যা রাত্রির কোলে। এখন শুধু প্রতীক্ষা অমাবস্যার অন্ধকারটাকে নিজের অন্ধকারের কষ্ঠিপাথরে একবার পরখ করে দেখতে।

কালকের জ্বলে ওঠা উত্তাপ বহ্নি , আজ যেন মিশে গেছে জলপ্রপাত শেষে নিশীথের নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গে। আজ আর দাবদাহ নেই। উষ্ণতা শুধু মিছেই ঘুরে ফেরা একটা ছলনা। সৈকত থেকে তিমির থেকে তুমি....কায়াটা ভিন্ন হলেও উষ্ণতার মধ্যে তো কোনো তফাত নেই! সেই দেহ, সেই চাওয়া, সেই উত্তাপ, সেই চিরপরিচিত জলপ্রপাত। সেখানে তো আমি নেই। আছে শুধু আমার উন্মুক্ত দেহের, আমার উদ্ধত স্তনের, আমার সুতিহীন যৌবনের, গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের সরব প্রতিধ্বনি। প্রতিনিয়ত নিজের দেহটাকে সঁপে দেওয়ার নিত্য কায়ার আভাস।

ওর দিকে তাকিয়ে বললামঙইধর নেহী। দূর ওহ্ থম্বে কে পিছে রখ দেনা

একটা বেতের মোড়ার ওপর থাম্বার আড়ালে হ্যজাকটা রেখে বেয়ারা চলে গেল। রেখে গেল বারান্দার কোনের আলে আলো-আঁধারির লুকোচুরি খেলায়। সেই খেলার মধ্যে নিজেকে আবার ভাসিয়ে দিলাম আমার আপাতঃ শূন্যতার ভেলায়।

সেখানে তো আমার আমি নেই! আছে ফেলে আসা যুগ-যুগান্তরের পুরোনো বস্তাপচা পান্ডুলিপি নিত্য নতুন সাজে। লাজের সজ্জাটা হয়ত পালটে গেছে। তবুও আমার পার্থিব আকারটার সার ভেদ করলেও, পৌছনো যাবেনা আমার হৃদয়ের অন্তরে । নিথর দেহটার ক্ষণিকের বহ্নি , মুহূর্তে হারিয়ে গেছে আমার অন্তরের হৃদয়ের ফ্রীজের কোনো এক প্রাণহীন হিম শীতল কোণে।

এই কী ভালোবাসা? এই কী প্রেম?

হতে পারে এটাই প্রেমের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। তবুও হতে পারেনা ভালোবাসার আসল সদগতি। আমি তো মেতেছি ভালোবাসার গুঞ্জনে। তাকে নতুন করে রজনীগন্ধার মালা গাঁথতে প্রেমের উপঢৌকনে।

দেহের উত্তাপের মরুভুমিকে সজাগ করতে চাইলাম সামনে রাখা কফির চুমুকে।

মাসার জঙ্গল রিসর্টটা বিনসারের জঙ্গলের মধ্যে। চারিদিকে ওক, দেওদার, পাইনের সমারহ। আরেকটা অচেনা গাছের দিকে তাকিয়ে বললামঃওএ গাছটার নাম কী? তুমি জানোঃ

ওরডোডেনড্রনঃ তুমি সাবলীলভাবে জবাব দিলে আমাকে।

আবাক হয়ে ভাবলাম, এই গাছের নামগুলো জানলে কোত্থকে? তুমি কি বটানি পড়েছ নাকি? আমি তো কিছুই জানিনা। এমনকি এখনও চিনিনি তোমাকে। শুধু কাল রাতে তোমার দেহের খোলসটা নিঙড়ে ফেলে....ব্যর্থ আমি, রাতের আঁধারে খুজেছি তোমাকে। রাতের তাপে বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া উত্তপ্ত আলিঙ্গন, কখন যে ভেঙ্গে পড়েছিল তোমার স্ফুলিঙ্গের উল্কির মতন বেরিয়ে আসা স্রোতে, গোমুখের মহাদেবের জটা থেকে হরিদ্বারের শান্ত সলিল গঙ্গার ফল্গু ধারার গহ্বরে....বহুদিনের স্বপ্ন দিয়ে গড়া সৌধ মিটিয়ে দিয়েছিল পুঞ্জিভুত কামনার ক্ষয়ে যাওয়া রসে।

এই কী ভালোবাসা?

না কি, অন্ন, বস্ত্র আচ্ছাদনের মতন, জীবনের নিত্য পিপাসা? তাহলে সৈকত তিমিরের থেকে তুমি আলাদা হলে কোথায়? এ হতে পারেনা। ভালোবাসার অন্তপুর শুধু স্রোতের তরঙ্গ নয়....কোনে এক বর্ণমাখা কাব্য। শকুন্ততলা-দুষমন্ত , পৃথ্বীরাজ-সংযক্তা, লায়লা-মজনু, কিথবা ওই ট্রেনের যুবক-যুবতীর মতন পুরোনো কোনো গল্প। এ হতেই পারেনা আমার স্বপ্নের দেখা স্বর্গ....এ হতে পারেনা ভালোবাসার বিন্দু বিসর্গ....এ হতে পারেনা কোনো মধুমাখা জোৎস্না....এ হতে পারেনা তোমার চোখের দিকে তাকানো এই মৃগনয়না। এ হতে পারেনা সংসারের বালুচরের কোনো রেশ....এ হতে পারেনা আমার দেখা, চেনা, জানা পুরোনো স্বপ্নের র নতুন মোড়কে ঢাকা এক-ই ছন্দের রেশ।

নন্দাদেবী, মৃগতুনি, মাইকটোলি ও ত্রিশুল পাহাড়ের সারিগুলো আবছায়ায় হারিয়ে যাচ্ছিল, দিনান্তের শেষে হামাগুড়ি দেওয়া রাতের আঁচলে। যেন অস্ত

রাগের শেষ ঝালাটা বাজিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের কোনে গভীর নীরবে। আমি যেন এখনও শুনতে পারছি বনবীথিকার পটভুমিতে পাহাড়ের গুঞ্জন। শুনতে পারছি পাহাড়ের কোলে নতুন শব্দের না-শেখা নব অভিধান। আমি যেন শুনতে পারছি, ওই সারির ভেতরের গান। আমি যেন শুনতে পারছি, অন্ধকারের ধূসরে জীবনের নব-ঐকতান।

স্নানের পর গরম গরম কফিটার স্বাদ বেশ আরামদায়ক লাগছিল। কফিতে চুমুক দিতে দিতে একাই বসে তাকিয়েছিলাম অন্ধকারের নির্জনতার দিকে। সেখানে অনন্ত রাত্রি যেন মহাসংগীত গাইছে। আমার নিঃশেষ হয়ে যাওয়া প্রাণ যেন তার-ই প্রতিধ্বনি শুনতে পারছে।

চাওয়াটা তো অনেক দিন ধরেই জমাট বাঁধছিল বুকে। বাঁচার ক্ষিদে তো মিটছিল সৈকতের রোজগারিতে। তবুও দেহের ক্ষিদেটা তখনও নিষ্পেষিত মনোলাঞ্ছিত প্রাণ। তাকে খুঁজতে গিয়ে, কাল রাতে হারিয়ে গেল, আমার স্বপ্নের দেখা নতুন সুরের গান। জ্বলছিল বহুদিন ধরে তুষের আগুনের মতন ধিক-ধিক করে। কাল রাতে সেই বুভুক্ষ দৈহিক আত্মা যেন মুক্তি পেল রামচন্দ্রের সম্পূর্ণ আলিঙ্গনে।

অহল্যার তপস্যা স্বপ্ন ভঙ্গ হল, মোহ থেকে সত্যের উদ্ঘাটনে।

ওকফি দিয়েছেঃ স্নান শেষ করে পাজামা পাঞ্জাবি পড়ে পাশের সোফাটায় বসে কফির কাপটা তুলে নিলে হাতেওইশ্! ঠান্ডা হয়ে গেছেঃ

ওগরম করে দিতে বলিঃ আমি বললাম অন্ধকারের দিকে চেয়ে উষ্ণ অনুরাগে।

ওনা থাক। একটু পরে আরেক কাপ চেয়ে নেবঃ একটু থেমে ওপাশের নির্জনতার দিকে তাকিয়ে বললেওকেমন লাগছে এখানেঃ

ওঠিক বুঝলাম নাঃ আমি সরাসরি প্রশ্ন করলাম তোমাকে।

ওমানে এই রিসর্টটাঃ

ওই জাঁক-জমক করা স্যুটের থেকে অনেক ভালো। যাই বলনা কেন, এই কাঠের ফ্লোর, এই ইটের প্যানেল করা দেওয়াল, ইলেকট্রিসিটি ছাড়া ওই হ্যজাকের আলোর একটা নিজস্ব মাধূর্য তো আছে। আসলে আমি আজকালকার হোটেল-রিসর্টের চাকচিক্যের মধ্যে কেমন যেন হারিয়ে যাই। মনে হয়, কেমন যেন ওসব মেকী সাজানো একটা মিথ্যে একটা স্বপ্ন । আমি তো স্বপ্ন ছেড়ে নেমেছি তোমার পথের প্রান্তে । প্রকৃতির ছোঁয়ার অভাব এখনও পড়ে আছে সেই সুদূর দিগন্তে

জানিনা তোমায় কতটা আঘাত দিলাম। অকপটে স্বশব্দে সত্যি কথা বলে ফেল্লাম। হয়ত তোমার স্বপ্ন জাল দিয়েছি চুরমার করে। তবু আমি এখনও যে তোমাকে ভালোবাসি, এরপরেও বলব কী করে? ভালোবাসা তো কাল রাতের মোহ ভরা মায়া নয়। কালকের বর্তমান, আজ ভবিষ্যৎ হয়ে গেছে সেকথা ভেবে কী অতো সময় নষ্ট করা যায়?

জবাব দিলেনা তুমি। আমার মনের কথা শুনলে শুধু নিঃশব্দে। হয়ত বা চিনছিলে আমার আমিকে, আমার নিজের মতন করে। কিসেই আমার আনন্দ? কিসেই আমার মুক্তি ? কিসেই আমার জীবনের আসল পরিতৃপ্তি?

আমি টেবলে রাখা মোবাইলটা বার করে হাতে নিয়ে একবার চোখ বোলালাম। কোনো সিগন্যল নেই! মানে বাড়ির লোকেরা এই মুহূর্তে যোগাযোগ করতে পারবেনা আমার সঙ্গে।

এই সভ্যতার থেকে নিমেষে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার মধ্যে, প্রাচীনটাকে একদিকে যেমন দেখা যায়, নিজেকেও হয়ত আরো একটু বেশি করে কাছে পাওয়া যায়....একান্ত অন্তরঙ্গতার মাধুরীতে। এই মুহূর্তে, সেই নির্জনতার বড় প্রয়োজন আমার। কোলাহল আলো মেশা রিসর্টে নয়। সেখানে হয়ত আড়ম্বরের রূপটুকু কথা কয়। না থাক। ভালোবাসা....তাও নয়। এখন শুধু তুমি আমায় দেখে যাও

আমার মতন করে। এখন সময় হয়েছে নিজেকে আবার ফিরে দেখার। স্বপ্নের মায়া কাটিয়ে আসল সত্যের স্তব্ধ নিরব অন্ধকারে।

সৈকত পিঙ্কুর পৃথিবীটা যেমন সত্য, কালকের রাতটাও তো তেমনি বাস্তবের আরেক মায়ার লীলা। উত্তরসুরি তৈরির বিধাতার এক আজব কারখানা। সেখানে নেই ভালোবাসার নাম। সেখানে আছে জীবনের এক নয়া উদ্দাম। এর মধ্যে তুমি কোথায় স্বতন্ত্র আর আমি কোথায় আলাদা? কামনার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির মধ্যে কে যেন হঠাৎই বাসনার ফিউসটা উড়িয়ে দিয়েছে পলকের নিমেষে। বারবার কেবলই প্রশ্নটা মনে মনে ঘোরাফেরা করছে....আমার প্রতিটা রক্তকোষে। দৈনন্দিন প্রাতকৃত্যের মতন এটারও কি চাওয়ার মাটিতে খুব-ই প্রয়োজন আছে?

এই অন্ধকারের নিস্তব্ধ তা যেন অতীত আর বর্তমানকে একই জায়গায় এনে ফেলেছে। ক্রমশ কামনার ব্যঞ্জনাটা যেন পিঙ্কুর জন্মাবার নয় মাস আগের রাত্রির সঙ্গে মিশে গেছে কালকের উষ্ণ কলেবরে।

মাঝখানে কিছু নেই! সময় নেই! সমাজ নেই! সংস্কার নেই! চাওয়াটা যেন আমার-ই মনগড়া একটা মুহূর্তের দোলা। সেই দোলার মধ্যে নেই কোনো বৈচিত্রের খেলা! একটা দেহ আরেকটা দেহকে এক মুহূর্তে নিবিড় আলিঙ্গন করছে। সেটা তো যে কেউ হতে পারে? যে কোনো সময়? তুমি, তিমির, সৈকত অথবা অন্য কেউ। এই অন্ধকারে ঢাকা পাহাড়ের শিখর জুড়ে....ভালোবাসার সঙ্গে তার সম্পর্কের অবিচ্ছেদ্র যোগসূত্রটা, যেন আমার চিন্তার মায়াজালে একটা আবর্তের দোলাচল সৃষ্টি করেছে। সেই দোলাচলে খুঁজছি নতুন দ্বীপশিখা। ওই হ্যজাকের আলোটা কি এঁকে দেবে নতুন বলিরেখা?

পুরোটাই আমার চাওয়ার এক না-পাওয়া কল্পনা! এখানে তো আমি নেই। এখানে তো তুমিও নেই! ব্যর্থ প্রচেষ্টা করছি, সেই পুরোনো বস্তাপচা পান্ডুলিপি বৃথাই পুনরূদ্ধারের....

ওকী ভাবছঽ তুমি আমার দিকে ফিরে প্রশ্ন করলে।

ওকিছু নয়ঽ আমার নির্লিপ্ত জবাব সংক্ষেপে।

ওকিছু তো একটাঽ

ওআচ্ছা, কাল রাতে আমার দেহটাকে না পেলেও কি তুমি আমায় ভালোবাসতেঽ

আমার প্রশ্নে চমকে উঠলে তুমি!

তোমার হয়ত অনুমান করতে অসুবিধা হয়নি, আমার ভেতরে কী চলছে! কোন আবর্তে আমি নিঃশব্দে বসে ঘুরপাক খাচ্ছি তোমার সঙ্গে বসে এই মুহূর্তে।

ওহ্যাঁ....মানে..ঽ আমতা আমতা করে শব্দ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেওতুমি কি ভাবছ এটা ইনফ্যচুয়েশনঽ

ওনাঃ.... সেটা নয়, তা জানি। কিন্তু এর মধ্যে আমাদের চাওয়াটার পূর্ণতা কী লুকিয়ে আছে? সেটাই ভাবছি আমিঽ একটু থেমে বললামওযদি তাই হত তবে কি হঠাৎ এভাবে তোমার সঙ্গে একা বেড়িয়ে আসতাম এক কথায় ঝট করেঽ

ওসেটা জানি। হয়ত অজান্তে , আমাদের জীবনের না-পাওয়াটাকে কাছে পেতে আমরা খুঁজছি ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে। যা হারিয়েছি....যা পাইনি....তাকেই তো খুঁজে নেওয়ার জন্য তোমার সাথে আসা। তোমাকে ভালো লাগাটাকে বুঝতেই তো তোমাকে ভালোবাসাঽ

ওআমি না হয়ে অন্য কেউ হলেঽ আমার প্রশ্নে আবার ভ্যবাচ্যকা খেয়ে গেলে।

ওসে বলতে পারব না আমি। এর আগে তো কখনও এমন হয়নি। তুমিই প্রথম..ঽ বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলে তুমি। তারপর মুহূর্তের নীরবতার পর বললেওহয়ত আমাদের জীবনের অস্থায়ীত্বের প্রতিটা বাঁকে, এক নাম-না-জানা স্হায়িত্ব আমরা সবাই খুঁজে বেড়াই মনে মনে, আমাদেরই অজান্তে অলক্ষ্যে। বিজ্ঞানীরা বলে এন্ডরফিনস্। আমি বলি মনের কল্পনার একটা নিশ্চিন্ত খেলাঘরঽ

ধাক্কা লাগল....

কল্পনা!

দুজনেই কিন্তু একই কথা ভাবছি। নিজেদের মতন করে। আমার কাছে দেহটা যেন গলে-মিশে-পচে গেছে সময়ের স্রোতে। তুমি হয়ত এখনও পরে আছ, দেহ আর মনের যুগলবন্দির খোঁজে। ছন্দটা মিললেও, চিন্তা ধারার ব্যবধানটা কোথায় যেন ধাক্কা মারছে বুকে।

সবটাই কি আমাদের মনের কল্পনা? সবটাই কি আমাদের অন্তরের না-দেখাকে দেখা? না-পাওয়াকে আবার নতুন করে পাওয়া? না-চেনাকে আবার নতুন রূপে চেনা?

সম্বিৎ ফিরতে বললেওকিছু খাবার বলেছঽ

ওনাঃ....এখনও বলিনি। তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলামঽ

ওকী খাবে বলোঽ

ওপেঁয়াজি। আরেক কাপ গরম কফি হলে ভালো হতঽ

মচমচে ভাজা পেঁয়াজির সঙ্গে গরম গরম কফি।

আহঃ....

আগেরটা তো স্নান করতে গিয়ে ঠান্ডা হয়ে গেল। এবার একটু জমিয়ে বসে খাওয়া যাবে অন্ধকারে নিস্তব্ধ তা অনুভব করে দেখতে। হয়ত কালকের বহ্নি শিখাটা আবার নতুন আলোয় ফুটবে আঁধারের আবছায়াতে। হ্যজাকের মৃদুমন্দ আলোর আলো-আঁধারিতে। পরিবেশের সঙ্গে চাওয়ার রংটাও পালটে গেছে।

তবুও....

চাওয়াটা তো এখনও হারিয়ে যায়নি, আমাদের না-পাওয়া পৃথিবীর আঁধারে। আশা আর চাওয়ার কি কোনো শেষ আছে কোথাও?

কখন যে কফি খাওয়া হয়ে গেছে দুজনেই খেয়াল হয়নি। কখন যে পেঁয়াজির কয়েক টুকরগুলো প্লেটে ম্রিয়মান শুকনো হয়ে পড়ে আছে লক্ষ্যই করিনি।

থাম্বার ওপাশ থেকে হ্যজাকের আলো-আঁধারির আবছায়া আলো আমাদের অবয়বর সিল্যুটকে একটা মায়বী রূপলেখায় ভাসিয়ে দিচ্ছে। দেখতে গিয়েও যেন দেখা যাচ্ছেনা তাকে। হ্যজাকের একটা শন্শন্ শব্দ, নিঝুম রাতে একঘেয়ে আঁধারে....বেজে চলেছে বিরামহীন ছন্দে। যেন রোম্যন্সের ধূ ধূ প্রান্তরে একটা বেহাগের সুর, না-চেনা ছন্দ বাজাচ্ছে।

তোমার মুখটা সেই আলো আঁধারিতে আবছায়া হয়ে ভাসছে। মনে হচ্ছে তুমিও বোধহয় হারিয়ে গেছ তোমার কোনো নিজস্ব জগতে। সেখানে হয়ত আমি নেই। সেখানে হয়ত তুমিও নেই। সেখানে পড়ে আছে আত্মবীক্ষণ। কী ফেলে এসেছি আর কী পেতে চাইছি....সেই যুগলের মহা-সন্ধিক্ষণ।

বনলতা সেন শুধু মনের কল্পনা স্রোতে ভেসে থাকা মুহূর্ত মাত্র। তাই নিয়ে যত ছন্দ, যত কাব্য, রোমান্সের যত জল্পনা-কল্পনা যত্র তত্র। তাই নিয়ে কতই না বিশ্লেষণ। কিছু লোকের আঁতলামোর মেলার অধিবেশন।

অতীতকে আঁকড়ে ধরে বর্তমানকে না-দেখার এ কোন্ লুকোচুরি খেলা?

লক্ষ্য করছিলাম, ওই অন্ধকারের মধ্যে থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পোকাগুলো হ্যজাকের আলোর দিকে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে আসছে। আলোর পিপাসায়। অথবা পুরোনো রীতির গতে বাঁধা নেশায়। মরীচিকার দিকে ছুটে বেরানোর কোনো না-চেনা আশায়। হঠাৎ চোখে পড়ল বেশি পোকা ওই আলোর উত্তাপে আছড়ে পড়ছে বেতের মোড়ার চারপাশে। ডানা ঝাপটাচ্ছে তবুও উড়তে পারছে না আর। আধ-মরন্ত হয়ে ছটফট করছে বৃথাই। মৃত্যু তাক ঠাঁই দিচ্ছে না। উড়তেও দিচ্ছে না। মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে কাতরাচ্ছে ঝিঁ ঝিঁ ডাকা শব্দে। যেন মরেই বেঁচে পড়ে আছে কাঠের দাওয়ার মাটির ওপর লেপটে। ছটফট করছে, চেষ্টা করছে, তবুও পারছে না ডানা মেলে উড়তে। কোথা থেকে একটা ফিঙ্গে পাখী ওই হ্যজাকের

চারপাশে ভিড় করা পোকাগুলোর মধ্যে থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছে এখনও উড়ন্ত গুটি কতককে।

মনে হল, আমাদের জীবনটাও কী ওই পোকাগুলোর মতন?

আমার তো স্বামী আছে। একটা মেয়েও আছে। অন্নসংস্থানের তো কোনো অভাবও নেই। তবুও ওদের ছেড়ে, কেনই বা ছুটে এসে তোমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি? কেনই বা নিজেকে কাল রাতে সঁপে দিলাম তোমার উষ্ণ বাহুডোরে? সেই বা কীসের লোভে? সে তো ক্ষণিকের প্রাপ্তি? না কি, পেয়েও না-পাওয়ার অন্তহীন পরিব্যাপ্তি?

হয়ত আমাদের জীবনটাই ওই পোকাগুলোর মত আলোর নিশানায় ছুটে যাওয়া একটি মুহূর্ত। সে আলোটা ওই আঁধারের বুক চিড়ে একটা স্বপ্নিল মায়া। তাকে এড়ানো কঠিন। সে অনেক বেশি চালাক কল্পনায় মসৃন। বারবার ছুটে যাওয়া সেই মায়াকে কায়ার আকার দিতে। নানান রূপের সাজে নতুন না-চেনা আভরণে। অজান্তে নানান না-পাওয়া স্বপ্নের জীবন্ত বিশ্লেষণের মায়াজাল বুনতে।

তোমারও কী ঠিক তাই মনে হচ্ছিল?

জানিনা।

ওরা বলে ভালোবাসলে মনের কথা পড়া যায়। আমি তো এখনও কিছুই বুঝছিনা।

সামনের পাহাড়গুলো মিশে গেছে ধূ ধূ অন্ধকারে। শুধু দেখতে পারছি ওই ছটফট করা পোকাগুলোকে। আলোর রোশনাইটাও তো ওই সুদূর দিগন্তের বলিরেখার মতন আবছায়া। একটা পোকাও তো ওই হ্যজাকের আলোটাকে স্পর্শ করতে পারছে না! আমিই বা কোন সাহসে তাকে স্পর্শ করব বলো? স্পর্শ করতে চাইলেও, ওই বলিরেখাটা যেন মরীচিকার মতন ক্রমশ দূরে দূরে সরে সরে যাচ্ছে আরও। ধরতে গিয়েও, বুঝতে গিয়েও, জানতে গিয়েও, অনুভব করতে

গিয়েও, অস্পষ্ট আলো-আঁধারিতে মিলিয়ে যাচ্ছে, অজানা কোনো সময়। আমার ভাবনার চলা থেমে গেছে সেখানেই....সেই মুহূর্তেই....তানহীন চিন্তার আশ্রয়ে....

এতক্ষণ একসঙ্গে কাটিয়েও তো এতদিন তোমাকে চেনা হলনা। এখনও তোমাকে পাওয়ার স্বপ্ন হয়ে আছে পরাধীন। আমার ভাবনা ছাড়িয়ে গেছে কালরাত্রির অবগুণ্ঠনে ঢাকা বাসর পেরিয়ে। এবার তোমায় চিনে নেব সব স্বপ্নের আসর এড়িয়ে। এতদিন শুধু পড়েছিলাম জাগতিক তন্দ্রায় মগ্ন । কাল রাতে হয়েছে সে তন্দ্রার স্বপ্ন ভঙ্গ। স্বপ্নের প্রাসাদটাকে নয় হাওয়ায় ছুড়ে দিলাম। বাসরের বাইরে বেড়িয়েই নয় তোমাকে নিজের করে পেলাম। সময়ের বৈতরণী ছুটছে কূলকূল রবে। এখনও প্রশ্ন , কোথায় কোন্ মুহূর্তে তুমি আমার হবে?

ওপেঁয়াজিগুলো যে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। আর কটা ভাজতে বলবঃ্

ওনা থাকঃ্ সংক্ষিপ্ত প্রাণহীন জবাব দিলাম তোমাকে। অনেক না-বলা কথাকে নীরবতা বলে দেয়। স্বপ্নের ওড়া গাঙচিলটা, যেন ওই পোকাগুলোর মতন মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। আমি তো এখনও উড়তে চাই বিহঙ্গের মতন। সপ্তডিঙ্গা পার হয়ে সর্বদাই সর্বক্ষণ। আমাদের জীবনটাও হয়ত ঠিক তাই। ধরতে চাই....উড়তে চাই....পেতে চাই....পেখম মেলে ময়ূরের মতন অবিরাম নেচে বেড়াতে চাই। সেই নেশার ঘোরে ছুটে বেড়াই, মরীচিকার পেছনে আলেয়ার স্বপ্নের ।

সময়ের হিসেবটা যেন ওই তো সরলরেখা ধরে এগিয়ে চলেছে। কালকের মুহূর্তটা আজকের বিগত অতীত। আজকের বর্তমানটাও হয়ত কালকে হয়ে যাবে ফেলে আসা অতীত দিনের কথা স্মৃতির দুয়ারে। পূব ঢলে পড়বে চুপিসারে পশ্চিমের কোলে। আবার ওই পোকাগুলোর মতন ছুটব না-পাওয়া, না-দেখা, না-চেনা ভবিষ্যতের অন্ধকারে। আমাদের রোজকার জীবনকে ছাঁচে ফেলতে কোনো মিথ্যে স্বপ্নের সাজানো অঙ্কে। জীবনটাকে সাজাতে আবার কতগুলো সামাজিক নিয়মের যন্ত্র

কাল পর্যন্ত এই সরলরেখাটা ছুটে চলেছিল নিজ-নিজ রূপে , নিজ-নিজ ঢঙে সাজবার মেলায়। আজ এই মুহূর্তে তাকে ভাসিয়ে দিয়েছি আসল সত্যের ভেলায়। অনেক কিছু করার ছিল কাল পর্যন্ত । অনেক জায়গা তো দেখা হল। পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ, ছন্দকে নানান ভাবে দেখা....পাওয়া....ধরে রাখার চেষ্টা। আজ যেন সবই থেমে গেছে, বিনসারের অরণ্যের নিস্তব্ধ তায়। দৈহিক মানসিক ক্লান্ত যুগলবন্দির ধুসর প্রান্তে ।

দূরের ওই যে নক্ষত্রটা জ্বল জ্বল করে আজও জ্বলছে। হয়ত সেটা নিভে গেছে সহস্র কোটি বছর আগে। তবুও সেই ডুবে যাওয়া সপ্তর্ষির দিকে চেয়ে একদিন বলেছিলাম তোমায়ঃতারাগুলোর নাম বলতে কি তুমি পারো? কোনটা বিশাখা? কোনটা স্বাতী? কোনটাই বা অরুন্ধতী

ঃতারাগুলোর নাম তো জানিনা এখনও। কস্তূরী তোমার হাতে হাত রেখে শিখে নেব কোনোদিনও

ভালোবাসার দিগন্তে দাঁড়িয়ে আমরা। তারা গোনার চেষ্টা করছিলাম সারাক্ষণ বৃথাই সর্বদা। ভালোবাসার রাজপ্রাসাদে সন্ধ্যাতারা তো আমরা দুজনেই জ্বালাতে চাই। কি করে বুঝব কোনটা আজও জ্বলছে, এখন সব থেকে বড় প্রশ্ন সেটাই। বাকি তো শুধু স্বপ্নের মায়া। হাত বাড়ালেই বা, কী করে পাই? তাকে ধরতে গেলে পার হতে হবে সহস্র শতাব্দী প্রান্তরের ছায়া। যুগ-যুগান্তর ধরে কী হাওয়ায় ভাসব ধরতে সেই মায়া?

ওই হ্যজাকের আলোটা তো সময়ের প্রতিবিম্ব নয়। হয়ত এই অন্ধকারটাই আসল আলো। ভালোবাসা, আবেগ, চাওয়া, পাওয়া সব কিছুই সেই আলোর বাইরের একটা মানসিক যন্ত্র । সেই আলোর পানে কী পিপীলিকার মতন ছুটব, জানতে তার আসল মন্ত্র?

শুধু অপ্রকাশিতটাই একমদ্বিতীয়ম সময়। সেখানে হারিয়ে গেছে আমাদের বর্তমানের ক্ষণকাল। পড়ে আছে একটা স্মৃতি, বিস্মৃতির দুয়ারে করাঘাত করতে।

সামনে শুধু পড়ে আছে অনন্ত মহাকাল। মিছেই তাকে আমরা খুঁজছি জাগতিক অঙ্কের ছকে। জগত সেখানে ধূসর কালের যন্ত্র । সেখানে শুধু বিশাল এক অন্ধকার মহাকালের মহামন্ত্র । আজও হইনি তো সেই মন্ত্রে দীক্ষিত আমি। কী করে জানব আসবে কবে সে সকাল? পাখির কলকাকলিতে ভরিয়ে দেবে এই অমারাত্রির কাল। কী করে জানব কোথায় নতুন ভোর? সময়কে পেছনে ফেলে ছুটবো দুজনে স্বপ্নের বিভোর।

তুমি আমার দিকে তাকিয়ে, সেই আলো-আঁধারের মেলায় বললে ওদেখেছ....পোকাগুলো কেমন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। আমারাও তো তাকাচ্ছি না ওদের দিকেঽ

আমি একটু বিচলিত হয়ে যবাব দিলামওকেউ তো বাঁচাচ্ছে না ওদেরকেঽ

ওকেন বলতো দেখিঃ আমি ফিরে তাকালাম তোমার দিকে।

ওওরা সময়ের গতিপথে হারিয়ে গেছে। মৃত্যুরও সময় নেই ওদের দিকে দেখার....ওরা খুঁজছে অন্ধকার থেকে সাইফন করা কোনো কৃত্রিম আলো। তুলে আনতে চাইছে অন্ধকারের মধ্যে থেকে ধার করা আভা। তাই দিয়ে ভরাতে চাইছে তাদের অর্থহীন জীবনের শোভাঽ

আমি আবার বললামওতবে ধার করা জোৎস্নার আলোর পেছনে ছুটছে কেনই বা ওরাঃ

ওমিথ্যে খুঁজতে অনন্ত শূন্যের আলোর লৌহ কপাটের সোনার চাবিকাঠি, বন্ধ দরজাটার বাইরে দাঁড়িয়ে খুঁজছে ওপারের না-দেখা না-ফোটা সাদা দোপাটিঽ

সেই মোহে তো ছুটছে সবাই। মরছে....আবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে ছুটতে চাইছে। দরজাটার কপাটটা কিন্তূ বন্ধই থেকে যাচ্ছে। সোনার কাঠি গড়মিলে রূপোর চাবি হাতে নিয়ে সাজিয়ে। আমরাও তো ঠিক তাই। ছটফট করছি ওই মাটিতে পড়া পোকাগুলোর মতন। পাচ্ছি না নিজেদের ঠাঁই।

এত ঘোরা সার হল। এত দেখা, এত চেনা, এত কাছে পাওয়া, এত আশা, এত ভালোবাসা। তবুও অধরা রয়ে গেল কালস্রোতের বুকে না-পাওয়া চাবিটার নেশা। চাবিটা তো হারিয়ে গেছে ওই মহাশূন্যের বুকে। এখনও তো তার ঠিকানা পেলাম না ইহলোকে। এই কদিন হাত ধরে পাশাপাশি চলে তোমার না-দেখা ধ্রুবতারাকে। সে কি সত্যি সত্যি নিভে গেছে বহুদিন আগে?

ওডেজা ভু তুমি হাওয়ায় শব্দটা ছুড়ে দিলে। ফিরে তাকালাম তোমার দিকে। কী ভাবছিলে বলতো দেখি? পূর্ব জন্মের সুফল-কুফল কি বিচার করতে বসলে এখন থেকেই? এ কী অতীতের আয়নায় বর্তমানের মুখ? না কি ভবিষ্যতের বালুচরে খুঁজে বেড়ানো সেই না-পাওয়া চিরসুখ?

আমি একটু বিষণ্ণ হয়েই বললামওওই যে পোকাগুলো হ্যজাকের কাছে এসে মাটিতে লুটিয়ে ছটফট করছে আমাদের জীবনটাও তো ঠিক ওদেরই মতন। মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে বেঁচে থাকব। কেটে যাবে সময়ের প্রবাহ ভূত থেকে ভবিষ্যতে। এভাবে কী সত্যি বাঁচব কখনওঃ

ওতার মানেঃ তুমি বোধহয় ঠিক বুঝতে পারছিলে না, কী বলতে চাইছি আমি। তোমার আকাশ এখনও স্বপ্নিল পদ্যে আঁকা। কী করে বোঝাব তোমাকে এই চেতনার সহজ সরলরেখা?

ওভালোবাসার আশমানি আকাশে ভাসব। মেকি আলোর জ্যোৎস্নায় প্রতিদিন স্নান করব। জীবন থেকে মৃত্যুকে সাজাতে চাইব নিজের মতন করে। তারই মধ্যে অলীক কল্পনার মালা গাঁথব....ছবি আঁকব.... স্বপ্ন দেখব দু-চোখ ভরে। কেউ বা আপন, কেউ বা পর বলে কাছে টেনে নেবে বুকে। বোকার মতন তাদের কোলে মুখ লুকোব, চিনব না কখনও আমাদেরকেঃ

তুমি জবাব দিতে গিয়ে একটু থমকালে। আমার কথার মালার ভেতরের ছন্দটাকে হয়ত বুঝতে চাইছিলে।

সৌম্যদার বিয়েতে যেদিন তোমায় দেখেছিলাম মনের বরণডালায়। সেই মুহূর্তে কেন ভাবিনি এই কথাটা, সে কি তোমাকে মুহূর্তে পাওয়ার স্বপ্ন -মধুর আশায়? চাওয়ার স্রোতে হারিয়ে গেছিলাম অজানা কোন প্রাতে। আজ হয়ত সেই তন্দ্রা ভাঙল নিঝুম অন্ধকার রাতে।

একটু ভেবে তুমি বললেওআইনষ্টাইন এর থিওরি অফ রিলেটিভিটিটাও কি তবে মিথ্যেঃ

ওঠিক বুঝলাম না, তোমার কথার মানে। মিথ্যে হতে যাবে কেন? এই অন্ধকারটার মধ্যে কি কোনো রোশনাই নেই? রং নেই? বর্ণ নেই? অনুভূতি নেই? সবটাই কী তবে মিথ্যেঃ

ওকেন থাকবে না? এই নিঃশব্দের মধ্যেই তো সত্যিকারের দেওয়ালি। তোমার আমার মনের কল্পনার মধ্যে নয়ঃ

ওতবে কি সেটাও গাঁজাঃ আমি বোকার মতন প্রশ্ন করলাম তোমাকে।

ওহয়ত নয়। কসমিক ফিলসফি নিয়ে উনি অনেক ভেবেছিলেন। আমি অঙ্কটার কথা বলছি। আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়টাই তো পুরো আমাদের কল্পনার আতুরঘর। ওই আতুরঘরটা শূন্য করে দিলে কাল রাতে। আর কী নিয়ে বাঁচব আগামী কালের প্রভাতেঃ

ওসবটাই কী তবে মিথ্যে? তোমার সঙ্গে বেড়িয়ে পড়া থেকে কালকের রাতে তোমার ছোঁয়াঃ আমি প্রশ্ন করলাম তোমাকে।

ওআজ-কাল-পরশু-ই যদি নাই থাকে আজ। তবে কালকেটা আজ হয়ে যাবে, আজকেটা কালঃ

ওতাহলে পরশুটা কোথায় দাঁড়াবে বলত দেখিঃ

ওপরশুটা হয়ে যাবে কালের আগামিকাল। এটুকুই বুঝতে পারিঃ একটু থেমে মাথা চুলকিয়ে বললেওআমি অতশত জানিনা। বুঝিওনা। তবে যদ্দূর পড়েছিলাম

আইনষ্টাইনের থিওরি অফ রিলেটিভিটির মূলে এই এর্নাজির পেছনে আলোর গতিপথ আর পদার্থ আছে। ঊ = সপ২। যদি সময়ের মধ্যে স্পীডের পরিব্যাপ্তি না ঘটে....যদি গতি থেমে যায় স্বপ্নের মায়ায়....যদি পদার্থ বা মাস শূণ্যে ভাসে - তো ফরমুলাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে বলো তো দেখিঃ

ইকনমিক্স নিয়ে অনেক তত্ত্বকথা পড়েছি। বিজ্ঞানের ছাত্রী হিসেবে ফিসিক্সও একটু-আধটু পড়তে হয়েছে আমাকে। কিন্তূ জীবনের সঙ্গে এর সামাঞ্জস্য তো এভাবে ভাবিনি কখনও। নিজের অজ্ঞতাকে আড়াল করার জন্য বললাম ঃতোমাকে চাওয়াটা? সেটাও কী তবে মিথ্যেঃ

ঃএখন মনে হচ্ছে বিশ্ববহ্মান্ডের সত্যের আলোয়, সেটাও একটা মিথ্যের মায়া ছাড়া আর কিছু নয়ঃ

যেন চেতনার আগুনে জল ঢেলে দিলে। ফিঙ্গে পাখিটা আবার অন্ধকারের বুক থেকে উড়ে এসে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল আরও কয়েকটা পোকাকে। আহঃ! বেঁচে গেল ওরা। মুক্তি পেল, এই মিথ্যে আলোর রোশনাই-এর পেছনে ছোটার থেকে। অন্ধকার থেকে সত্যের আলোর জলসাঘরে।

এতদিন ধরে শুধুই ছুটছিলাম আমি। এই বোধহয় প্রথম থমকে দাঁড়ালাম। চারিদিকের বন আর দূরের পাহাড়ের ওপর ঢাকা অন্ধাকারটা যেন আলোর রোশনাইতে ছেয়ে দিয়েছে অনন্ত সকালের আভা। আর কোনো অনুতাপ নেই। নেই আর কোনো চাওয়া। চাওয়া-পাওয়া মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে মুহূর্তের স্তব্ধতায়। আমার জড়তা কেটে গেছে। আমার চাওয়াও হারিয়ে গেছে। আমার না-পাওয়া এখন আর আমায় কষ্ট দিচ্ছে না ।

হ্যজাকের বাতিটা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। এখন অনন্ত অন্ধকারে ঢেকে যাবে এই মুহূর্তটা। আমি সেই অন্ধকারের মধ্যে যেন সত্যের আলো দেখতে পাচ্ছি। আমাকে দেখতে পাচ্ছি।

সঙ্গে তোমাকেও....

এক সময় হ্যজাকটা নিভে গেল। এখন আর কোনো অন্ধকার নেই। চারিদিকে আলোর রোশনাই-এ ভরা আকাশ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত আলোর কিরণ ভরিয়ে দিয়েছে ভূলোক দ্যুলোক সব লোকের অসীম আকাশটাকে। আমি যেন সেই আকাশে, না-শোনা ভৈরবীর সুর শুনতে পাচ্ছি। যে রাগ এতদিন এতকাল ধরে খুঁজছিলাম। আজ যেন অন্ধকারের অলোয়, সেই রাগ আমায় না-চেনা সুরের মূর্চ্ছনা শোনাচ্ছে....না-লেখা ছন্দের বন্দনাগানে। ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎকে ভুলে চিরন্তনের স্বরলিপিতে গাঁথা না-চেনা সুরের আনন্দমুখর কলতানে।

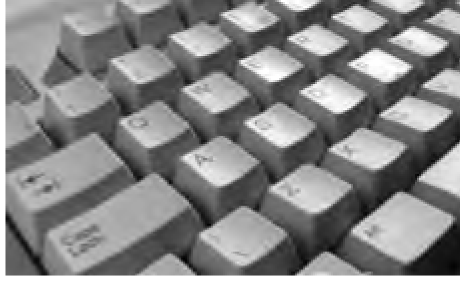
মনে মনে ভাবলাম, আমার তো তোমাকে প্রয়োজন নেই। আমার তো প্রয়োজন এখন ওই ফিঙ্গে পাখীটাকে। যে আমায় ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাবে সময়হীন সময়ের রথে। মিথ্যে থেকে সত্যের আলোকে। যেখানে সময় থমকে দাঁড়াবে একটা অনন্ত বিশ্বের মহাশূন্যে....

সেই নিভে যাওয়া হ্যজাকের শেষ দ্যুতিতে তোমার চোখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকালাম আমি। তুমি কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলে। বুঝলাম তোমার আর বলার কিছু নেই। এই চ ক্রে র মধ্যাকর্ষণ থেকে আমরা ছিটকে বেড়িয়ে এসেছি, নিজেদেরই অজান্তে , নিঃশব্দ দেওয়ালির হুতাগ্নিতে

আমার অন্ধকারে না-দেখা চোখ-দুটো যেন সেই ভাষাই নিঃশব্দে বুঝিয়ে দিচ্ছে এই মুহূর্তে তোমাকে।

তোমাকে....

কস্তূরী



নবম চিঠি

কস্তূরী

যেটা বিনসারে ছিল দূরে সেই ত্রিশূল এখন অনেক নিকটে এসে পড়েছে।

কৌশানি রয়েল রিসর্ট। হোটেলে ঢুকেই বাঁ দিকের ঘরের সারির দোতালার একটা ঘরে আমাদের লাগেজ তুলে দিল ওরা।

আমি বললামওতুমি ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নাও। আমি এখনই চেক-ইন করে আসছিঃ

চেক-ইন শেষ করতেই মোবাইলটা বেজে উঠলওআচ্ছা তুমি কোথায় বলতো? পরশু দিন থেকে তোমায় মোবাইলে চেষ্টা করে যাচ্ছি, শেষমেষ এতক্ষণে পেলামঃ অবন্তিকার ক্রোধের কারণ আছে বৈকি!

ওবিনসারে ছিলাম। ওখানে মোবাইল সিগন্যল কাজ করেনা। এইমাত্র কৌশানিতে এসে পৌছলামঃ

ওকবে ফিরছ কলকাতায়ঃ

ওএটা শেষ করেই দিল্লি হয়ে রাজধানী এক্সপ্রেসে ফিরব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভবঃ

ওকবেঃ অবন্তিকার আর তর সইছে না।

ওধরে নাও আরও তিন-চারদিন লেগে যাবেঃ

ওআর বেশি দেরি করোনা কিন্তু । আমার হাতের টাকা যে প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। ব্যঙ্ক থেকে টাকা না তুললে চলবে না এর পরে

ওকাজটা তো শেষ করে যেতে হবে। তুমি এ কয়েকদিন একটু ম্যনেজ করে নাও। আমি গিয়ে সব মিটমাট করে দেব একটু থেমে বললামওটুবলু কেমন আছে? আর বাবা?

ওটুবলু তো ঠিকই আছে। বাবার শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছে না কদিন ধরে। তুমি ফিরে এলে একটা থরো ইনভেষ্টিগেশন করাতে হবে। খালি বলে, মাথাটা সব-সময় ভার ভার হয়ে থাকে। সারাক্ষণই ঝিমঝিম করছে

ওব্লাড প্রেসার বাড়েনি তো? ডাঃ সুবুদ্ধি খানকে একবার দেখিয়ে নাও না কেন

ওতাই ভাবছি কদিন থেকে। কাল নিয়ে যাব ওনার চেম্বারে অবন্তিকা বললো অনুনয়ের স্বরেওতিন দিনের বেশি আর দেরি করোনা। আমি জানি বাকিটা তুমি সাজিয়ে লিখে দিতে পারবে ওপাশ থেকে ফোনটা কেটে দিল অবন্তিকা ।

ঘরে এসে দেখলাম তুমি বারান্দার সোফায় বসে কফি টেবলের ওপর পা রেখে, একা একা কফির কাপে চুমুক দিচ্ছ। দিতে দিতে তাকিয়ে ছিলে দূরের ওই পাহাড়ের দিকে। ত্রিশুলের ওপর অস্তগামী সুর্য্যের শেষ আভা হয়ত নতুন কোনো আবিরের হোলি খেলছিল তোমার মনে। ঠিক যেমন তাকিয়ে ছিলে, প্রিয়া সিনেমা থেকে বেরিয়ে রাসবিহারী দিয়ে রোয়িং ক্লাবে হেঁটে যাওয়ার পথের বাঁকে। তখন তো আমি তোমাকে দেখছিলাম। এখন দেখছি অস্তগামী সূর্য্য টাকে।

আমারা এখনও তো দুজনেই সেরকম আছি। অথচ কতো বদলে গেছে দুটো দৃষ্টি মধ্যেকার সময়ের প্রবাহে। আমাদের চেতনার কাহিনি ভিন্ন বাঁক নিয়েই সময়ের পথে হেঁটে নতুন চেতনার রথে।

ওখানে ছিল শহরের জ্যম ভিড় আর অট্রালিকার ফাঁকে হাজারও কোলাহল। তার ফাঁকে একফালি সূর্য্য কে ইঁটের দেওয়ালের পেছনে ডুবে যেতে যেতে তোমাকে দেখার কৌতুহল। আমার ভালোলাগার অনুভূতি দিয়ে তোমার মনকে

স্পর্শ করার চেষ্টা। সূর্যাস্তটা সেখানে গৌণ হয়ে গেছিল আমাদের নতুন ছন্দের তালে। তুমিই ছিলে মুখ্য, স্বপ্ন ছিল তোমাকে পাওয়ার। সেখানে ছিল সূর্যাস্ত কে ঘিরে, আমার স্বপ্নের স্বর্গকে মেশাবার, অনন্ত ধারার মতন বয়ে যাওয়া একান্তই নিজস্ব চেতনা।

এখন সেটা বদলে গেছে, হয়ে গেছে আমাদের সম্পর্কের যুগ্ম আরাধনা। সেখানে তার শেষ রক্তিম আভাটা অনুভূতির কম্পনে বাজাচ্ছিল মিউসিক এরেঞ্জারের মতন নতুন কোনো এক সিম্ফনি। এতদিন পর সে সিম্ফনি তার স্বরলিপি খুঁজে পেয়েছে ত্রিশূলের ওপারের অসীম মহা দিগন্তে । আমারা দুজনে শুধুই অর্কেষ্ট্রাটার নীরব বাদক সেই না-ছোঁয়া অসীম অনন্তে । এখন তো তা প্রকৃতির লীলায় পরিণত হয়েছে, কোমল থেকে নিখাদের সপ্তমাঙ্গিক ঝালার মার্গে।

তোমাকে কাছে পাওয়ার স্বপ্ন মিশে গেছে, মহাকালের মেলায়....

কে তুমি? কে আমি?

সে কথার সুর শুনবো এখন পরে। তোমার আমার মিলন তিথি গেঁথেছে হার সপ্তসুরের বৈরাগে। এই কী তবে ভালোবাসার আসল অঙ্ক? সরগমের নিখাদ পেরিয়ে ভাসছে অনন্ত প্রেমের স্বপ্ন । সেখানে শুধু আছে এই ভাসমান সময়। মহা-অসীম থেকে গভীরে, কালের বলয়।

তুমি নিঃশব্দে এক দৃষ্টে চেয়েছিলে ত্রিশুলের ওপরের চূড়াটার দিকে। চারিধার ঘেরা নিঝুম নিস্তব্ধ নিভে যাওয়া আলোটার পথে। হয়ত বা পাখনা মেলে মহাকালের রথে ময়ূরপঙ্খি হয়ে। গুটি গুটি করে নিভে যাওয়া তারার আলো গুটিয়ে নিচ্ছিল নিজেকে। নীচের চূড়া থেকে ওপরের চূড়ার শেষ শৃঙ্গের দিকে। তারপর নন্দাদেবীর বিস্তির্ণ পর্বতমালা গ্রাস করে নিল অন্ধকারের তারাহীন আকাশটাকে। জনহীন নিস্তব্ধ ধুসর অবচেতনের প্রান্তরে। তারাগুলো যেন কোথায় হারিয়ে গেছে সেই ধুসর অন্ধকারে....

ওকী দেখছ৪ প্রশ্ন করলাম তোমাকে।

ওতেমন কিছুই নয়। আর তো দেখাবার কিছুই নেই। সব হারিয়ে গেছে, ওই না-দেখা আলোকে। শেষ অস্ত রাগের দীপালোকে। দেখা তো শেষ হয়ে গেছে। এবার সময় হয়েছে ঘরে ফেরার৪

এ কী হল তোমার? এত তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়লে চলতে চলতে পথে এইবার। এখানে তো, এর পরে নতুন কোনো দ্রষ্টব্য নেই! যা দেখাব তোমাকে আমি আবার নতুন কোনো আলোকে। আমি নীরবে বসে রইলাম তোমার চেতনাকে বুকে নিয়ে শব্দহীন পুলকে।

আমি কফিটা শেষ করে প্রশ্ন করলাম তোমাকেওনা-দেখার পৃথীবীতে, আর কী কিছু দেখার আছে৪

আমার দিকে না তাকিয়েই তুমি বললেওপৃথিবীটা বড়ই ছোটো....বলোনা কেন সারা ভুমন্ডলটাও। ওখানেই লুকিয়ে আছে স্বর্গ....ওখানেই আমাদের স্বপ্ন হবে সফল। কেনই বা মিছেই খুঁজে বেড়াচ্ছি? সব চেষ্টা-ই তো বিফল৪

বুঝলাম বিনসারের রেশের জের এখনও বয়ে চলেছে তোমার একাকী বসে কফিতে চুমুক দেওয়া নিরালা মনে। কী খুঁজতে বেড়িয়েছিলাম, তাও কি ছাই জানতাম? কী পেলাম, তাও কি ঠিক চিনলাম? চেয়েছিলাম তোমাকে নিয়ে ভাসব ভাসমান ভেলায়। এই সফর বুঝিয়ে দিল এ শুধু সোনার পাথরবাটি, পৃথিবী নামক জানা পরিব্যপ্তির থালায়।

শিউরে কেঁপে উঠলাম আমি!

হৃদয়ের স্পন্দন যেন অন্য সুর বেঁধে দিয়েছে মুহূর্তটাকে তখুনি। ছন্দহীন এক অনাবিল আনন্দের জোয়ারে ভাসা। সেখানে ভাষা স্তব্ধ হয়ে স্বপ্ন মিছিল হারিয়েছে একা। সেখানে নেই কোনো সুর....তাল....ছন্দ....লয়। সেখানে শুধু পড়ে আছে এই ভাসমান সময়। আছে শুধু নব চেতনার নব অভ্যুদয়। সেই অনন্ত মহাকালের বুকে দাঁড়িয়ে আমরা দুজনে একা। এখান থেকেই শুরু বিশ্ব ছেড়ে

মহাবিশ্বের পরিক্রমা । আমাদের জানা অঙ্কের পরিব্যাপ্তি হারিয়ে গেছে ভুমন্ডলের চারপাশে। সীমিত চিন্তার বলিরেখা পার হয়ে আমরা এখন ভাসছি অনন্ত অসীম মহাশূন্যে!

সেখানে আমি নেই....সেখানে তুমি নেই....সেখানে ভালোবাসা নেই.... সেখানে কাল নেই....সেখানে অতীত নেই....সেখানে ভবিষৎ নেই। সেখানে বর্তমান বলেও কী কিছু আছে?

তোমার চেয়ারের পাশের চেয়ারটায় হেলান দিয়ে প্রশ্নটা ছুড়ে দিলাম তোমার কাছে ভুমন্ডল দেখে তো আর পেট ভরেনা। তুমি একটু বসো। আমি মেনুতে কি আছে দেখে আসি

বেরিয়ে যাওয়া শুধু একটা আছিলা মাত্র। আসলে যে কাজে এসেছি সেটা শেষ করা যত্র-তত্র। মালিকের সঙ্গে একটু দেখা করার প্রয়োজন তো আছে। সংবাদপত্র তো পয়সা খরচ করে পাঠায়নি আমাকে প্রমোদ ভ্রমণের জন্য এখানে। পাঠিয়েছে বড় করে একটা অল ইন্ডিয়া কভার স্টোরি লিখতে। তার জন্য কিছু তথ্যও তো লাগে। লেখার হাতটা আমার জন্মগত সেকথা এডিটর বোঝে। তবুও হতে পারলাম না সাহিত্যিক কোনোকালে।

অবন্তিকার সঙ্গে একদিনে চাকরি পেলেও দুজনের জার্নালিষ্ট কেরিয়ারের মধ্যে বিস্তর তফাত। বালিটিকুরি থেকে আসা মেয়েটা শুধু ডিগ্রিই করেছিল। চাকরি চেয়েছিল। চাকরিও পেয়েছিল। সেই সঙ্গে আমাকে। ঘর-সংসার দুটোকে। আমি হতে চেয়েছিলাম সাহিত্যিক। পেটের তাগিদে হয়ে গেলাম ফিচার লেখা ঔপন্যাসিক। কপালটাই মন্দ। দু-একটা গল্প-উপন্যাস পত্রিকায় থাকার জোরে ছাপাও হয়েছিল কোনোদিন। কিন্তূ তেমন ভাবে দাগ কাটেনি কখনও কারও মনে। সাহিত্যিক হওয়ার সাধ মিটেছিল বহু আগে কোনো একদিন। তাই নিজের শৈলীকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলাম অন্য এক পথে। সাহিত্যের বাসনা হারিয়ে গেল বাঁচার নতুন রথে। বুঝলাম আমার দ্বারা সাহিত্য-ফাহিত্য হবেনা কোনোদিন।

তবুও তো কলমে ভাষা আছে। আছে লেখার জোর। সেটা আর কেউ না জানেলেও, সম্পাদক মহাশয় খুব ভালো করেই জানেন সে কথা। তাইত র্নিদ্বিধায় ছেড়ে দেন আমাকে। ভ্রমণ ফিচার লিখতে জুড়ি নেই আমার। অবন্তিকাকে নিয়ে ছোট্ট সংসার বাঁচাতে নতুন সুরে লিখতে বসলাম আবার।

এখন তার পরিণতি অবন্তিকা পাক্কা গৃহবধূ। আর আমি এখানে-ওখানে রোজ খুঁজে ফিরি কাহিনির মসনদ। নিত্য নতুন জমজমাট ফিচারের ডালি দিয়ে ভরাই কাগজের পাতা। রমরম করে বাজার খায়, আমি এখন পেশাদারী বিক্রেতা। সেই বিক্রির ছলে তোমাকে নিয়ে চলা। তোমার সঙ্গে সময় কাটাব বলে রিসর্টের কাহিনি বলা। তবুও তো লেখার জন্য কিছু উপঢৌকন চাই। তাই এখন ছুতো করে তোমার কাছ থেকে পালিয়ে রিসর্টের মালিকের কাছে যাই।

রিসর্টের মালিক দিনদয়াল আগারোয়াল আমাকে সাদর আপ্যায়ন করে বলল “আইয়ে স্যর। মেরা ভাই পহেলেই বতায়া থা আপলোগ ইঁহা আ রহে হ্যয়।”

“আপকা ভাই কৌন?”

“বিনসার কা মাসার জঙ্গল রিসর্ট মেঁ জাঁহা কল আপলোগ ঠহরে থে ও তো মেরা ভাইকে হ্যয়। মেরা ছোটা জ্ঞতি ভাই। মুম্বাই সে আ কর মৈ নে ইঁহা রিসর্ট খুলা। তব ইয়ে ইতনা বড়া নেহী থা। ছোটা সে হী শুরু কিয়া। থোড়া চলনে মেঁ উসকো মুম্বাই সে ইঁহা লে আয়া। ফির ওহ্ ইধর কাম শিখকর মাসার জঙ্গল রিসর্ট ওহি কিয়া।”

“অব তো ইয়ে বড়া হো গয়া।”

“সব হী উপরোয়ালাকে মেহেরবাণী। আপকা মেহেরবাণী হোয়ে তো ঔর বড়া হো সকতা। বোলিয়ে, আপকা কেয়া সেবা কর সকু?”

“কুছ নেহী। সব হী তো ইঁহা আচ্ছা হী হ্যয়।”

“কল সুবে সুরজ উঠনে সে পহলে উঠ যাইয়ে। ত্রিশূল কা উপর সনরাইজ আপ অপনে কমরে মে সে ভী দেখ সকতে হ্যয়।” তারপর কি মনে হতে বলল, “আপলোগ

নাস্তে কিয়ে হ্যয়ঽ

ওঅভি তক তো নেহীঽ

ওফির আরাম সে ঘর মেঁ যাইয়ে। ঔর মুঝে আপ লোগকো সেবা করনে কা মওকা দিজিয়েঽ একটু থেমে রিসর্টের এক বান্ডেল ছবি আমার হাতে তুলে দিয়ে বললওবড়া বড়িয়া সে লিখিয়ে ইস রিসর্ট কে বারে মেঁ, তো বড়ি মেহেরবাণী হোগীঽ

এই প্রথম অনুভব করলাম, সঙ্গে করে একটা ডিজিট্যল ক্যমেরা এনেছিলাম বটে। কিন্তূ কোথাও ছবি তোলা হয়নি। ভুলেই গেছিলাম সেকথা অকপটে।

এমনকি তোমার ছবি একটাও নয়!

ঘরে ফিরে দেখলাম, তুমি যেখানে বসে ছিলে, সেখানেই বসে আছ ঠিক তেমনি ভাবে। ততক্ষণে খবরের কাগজের আর্টিক্যল লেখা হয়ে গেছে আমার মনে মনে। কিন্তূ টাইপ করব কলকাতায় ফিরে ঠান্ডা মাথায় অফিসে বসে কোনোদিন এক সময়।

এখন শুধু তোমার সঙ্গে শেষের কয়েকটা প্রহর কাটানোর ক্ষণ। তোমাকে শেষবারের মতন ইহলোকের ব্যাপ্তির বিন্দুতে বসে অনুবিক্ষণ করা। আজ সন্ধ্যেটা তো তোলা আছে তোমার জন্য। নয় সেই মুহূর্তটাকে সম্বল করে ভেসে বেরাই, আমার শেষ কল্পনার মায়ায়। এরপর তো আবার ফিরে যেতে হবে ঘরের লক্ষ্মী অবন্তিকার ছায়ায়। নয় পাড়ি দিলাম যুগ থেকে যুগান্তরে কালান্তরের পথে। কেনই বা ফিরে যাব ব্যর্থ মনোরথে?

কাল যখন ভোরের আলো ফুটবে। আবার না হয় হারাবো নিজেকে ত্রিশূলের অসীম মহাশূন্যে।

হয়ত সেখানে থাকবে তুমি। হয়ত সেখানে থাকব আমি। হয়ত সেখানে থাকবে আমাদের অনন্ত গভীর ভালোবাসা। কালের নখ দর্পনের চিহ্ন না মাড়িয়ে সেখানে থাকবে আজকের অন্ধকার থেকে আলোয় পাড়ি দেওয়ার মুহূর্তটুকু.... থাকবেনা কোনো প্রত্যাশা। জেগে থাকব আমরা দুজনে। অনন্ত দিবালোকে। অতীত-

বর্তমান-ভবিষ্যৎ ভুলে, অনাদি কালের অনন্ত প্রবাহের উর্দ্ধগামী না-দেখা কোনো স্রোতে।

যেখানে গোলাপকে থালায় সাজিয়ে অতিথিকে বরণ করে নিতে হয়না বিয়ের কোনো এক বাসরের আসরে। তার সুবাস ভেসে বেড়ায় দুজনের না-খুঁজে পাওয়া অন্তর । সেখানেই থাকব আমরা দুজনে যুগ থেকে যুগান্তরে ।

এলার্ম দিয়ে রেখেছিলাম।

মধ্যরাত্রির অন্ধাকারে ঘুম ভেঙে গেল। ভাবছিলাম ব্যগ থেকে অন্তত একবার ডিজিট্যল ক্যমেরাটা বার করি। নাঃ....থাক। এরপর আর তো ফ্রেমে বন্দি করার কোনো মানেই হয়না।

কাশ্মিরি শালটা জড়িয়ে বারান্দায় গিয়ে বসলাম। তুমিও গায়ের চাদরটা জড়িয়ে বসলে আমার পাশে। অন্ধকারের মধ্যে ঝকঝক করছে বরফে ঢাকা শৃঙ্গ। নীচের দিকে কিছু টুকরো অনাবৃত অংশগুলো যেন জ্বলজ্বল করছে ওই তুষারাবৃত হিমালয়ের মাঝে মাঝে।

তারপর আচমকা ধীর শিথিল মন্দর গতিতে....সহস্র কোটি মাইল নিমেষে পেরিয়ে....কোথা থেকে যেন আছড়ে পড়ল একটা আলোর রেখা। ওই ত্রিশূলের তিনটে চূড়ায়। ভোরের প্রথম কিরণ যেন অনন্ত বিশ্বের মহাসংগীত বাজিয়ে গেল ওঙ্কারের শঙ্খধ্বনিতে। তারপর মায়ের আঁচলের মতন ঢেকে দিল ত্রিশূলের তিনটি শৃঙ্গকে। প্রথমে সোনালি আলোর কিরণের আচ্ছাদনে। নীচের দিকে পড়ে থাকা রক্তিম আভার নব উদ্ভাসে। কৌশানির সোনা ঝরা নতুন প্রত্যুষে। ক্ষণিক মুহূর্তের মধ্যে লাল মিশে গেল সোনালি ধারার অবারিত স্রোতের প্লাবনে। সুর্য্যের অনন্ত রশ্মির উদ্ভাসে ভরিয়ে দিয়েছে ইহলোক-দ্যুলোক-সর্বলোকের অন্ধকারকে পেছনে ফেলে....চিরকালের রংমশালের আলোয় ভরিয়ে দিতে বিশ্বব্রহ্মান্ডকে।

দুজনে চুপ করে কৌশানি রয়েল রিসর্টের বারান্দায় বসে রইলাম। সামনে খোলা আকাশ। বহুদূর চোখ চলে যাচ্ছে। দিগন্তে দিক চক্র বল জুড়ে রয়েছে

বিশাল হিমালয়। ত্রিশূলের তিনটে পিকই পরিস্কার দেখা যাচ্ছে সোনা ঝরা আলোর বন্যায়। ঝকঝক করছে ত্রিশূলের চূড়াগুলো। বেশিক্ষণ এক-নাগাড়ে তাকাতে পারছিলাম না। চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল। বেশিক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে পারলাম না আর।

আমি তোমার দিকে না তাকিয়েই বললাম এই ত্রিশূল দেখলেই আমার শিবের ত্রিশূলের কথা মনে পড়ে যায় বারবার

তুমি কিছু না বলে, ফিরে তাকালে আমার দিকে। ভাষাহীন মৌন নীরবতায়। ঠিক যেন বুঝতে পারছ না, কী বলতে চাইছি ভাষা দিয়ে স্পষ্টভাবে তোমাকে? তোমার দিকে তাকিয়ে হাসলাম একটু। তারপর আবার ত্রিশূলের দিকে ফিরে বললাম এই ত্রিশূলের মাহাত্ম জানো

তুমি নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লে। বুঝিয়ে দিলে তোমার অজ্ঞতা পৌরাণিক কাহিনিতে। আমার স্মিত হাসিটা মিলিয়ে গেল চেতনার পথে।

সিরিয়াস হয়ে গিয়ে বললাম ত্রিশূলের তিনটে শূল হচ্ছে ট্রিনিটি। সৃষ্টি, স্থিতি আর প্রলয়। আমাদের সময়ের ভাষায় অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ। অথবা দার্শনিকের যুক্তিতে অবচেতন, চেতন আর অতিচেতন। এর বাইরে আর তো কিছু আমরা ভাবতে পারিনি কথাটা বলেই হঠাৎ চুপ করে গেলাম।

তুমি অনেকক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইলে ত্রিশূলের দিকে। আলোর ঝলকানিটাকে আবার দু-চোখ ভরে দেখলে নতুন করে। কালকের অন্ধকারের অনুভূতিটা যেন মিশে যাচ্ছে আজকের আলোর প্লাবনে। এ আলো তো আজকের নয়। এ আলো তো কালকের নয়। এ তো যুগ-যুগান্তরের স্ফুলিঙ্গ দিয়ে গাঁথা অনন্ত সময়ের রশ্মি। যা কোনোদিন নিভবে না দিন-রাতের লুকোচুরি খেলায়। চিরকাল চিরযুগ চিরসময় হয়ে বেচে থাকবে আমাদের চাওয়া-পাওয়াহীন সত্ত্বার নিমেষের প্রহরায়।

তুমি যেন হারিয়ে গেছ, সেই সেই মহাশূন্যের কায়াহীন সময়ের অন্তহীন পথে। অনাদিকালের সময়ের আচ্ছাদনের পুষ্পকরথে। তুমি যেন হারিয়ে গেছ, দিগন্ত বিস্তৃত কালের মায়ায়। তুমি যেন হারিয়ে গেছ, অনন্ত অসীম শান্তির ঘন বনছায়ায়। তুমি যেন হারিয়ে গেছ, শতাব্দী ছাড়িয়ে মহাবিশ্বের মহাকাশের মহাশূন্যের আকাশে। আজ যেন তোমায় সম্পূর্ণ চিনলাম এই আলো উদ্ভাসিত প্রত্যুষে। তোমাকে বলার ভাষা, নেই আমার জানা। নিভে গেছে সুপ্ত স্বপ্ন , নিভেছে নিভৃত বাসনা।

আমার দিকে ফিরে বললেওতাহলে জীবন-মৃত্যু দিন-রাত বলে কী কিছু নেইঽ

ওএ শুধু আমাদের মনগড়া কল্পনা মাত্র২

ওতারপরঽ

ওজানিনা তারপর কী২ উত্তর দিলাম আমি।

ওএই ট্রিনিটির বাইরেও তো কিছু আছে? বিজ্ঞান থেকে দার্শনিকের তত্ত্বের উর্ধ্বেঽ

জানা নেই তার খোঁজ।

কি বলব তোমাকে....?

আমি প্রগাঢ় নীরব দৃষ্টিতে ফিরে তাকালাম তোমার দিকে। দেখছি অপলকে মুক্ত আলোয় তোমাকে....

আমার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল একটা অস্ফুট শব্দের স্তবওহ্যাঁ....একটাই শব্দ আছে এরপর। ওটাই তো মহাওঙ্কারধ্বনি। ওখানেই সব শুরু , ওখানেই সব শেষ...২

এরপর আর কী বলব আমি?

তোমাকে....

কৌস্তভ



দশম চিঠি

কৌস্তভ

কিছুই পাল্টায়নি!

সেই পুরোনো কলকাতা ঠিক আগের মতনই আছে। গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে বর্ষার হাটুঘেরা জল। শরতের থিম পূজোর দূর্গৎসবের বর্ণাঢ্য শোভা। শীতের সময় বেড়িয়ে পড়া এখানে ওখানে। বসন্তে শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসবের সেই চিরাচরিত প্রভাতফেরি। সেই সৈকত আর পিঙ্কুকে নিয়ে আমার নাকতলার দোতালা বাড়ি। হপ্তাহে সেই তেরো ভুতের প্রলাপের অর্থহীন কচকচানি।

ঠিক আগে যেমন ছিল।

তোমাকে দেখার আগে। তোমাকে ভালোলাগার আগে। তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার আগে। তোমার সঙ্গে আমার নতুন চেতনাকে পরিপূর্ণ করার আগে।

হাওড়া ষ্টেশন থেকেওটা টহ্ করে চলে গেলে তুমি। একবার ফিরেও তাকালে না আমার দিকে। বললে নাওআবার কবে দেখা হচ্ছেঃ

আমি আশাও করিনি বলবে। কেন না আমিও তো ফিরে তাকাতে চাইনি পেছন ফিরে আবার। স্মৃতিটুকু স্মৃতি হয়েই থাক আমাদের জীবনে চিরকাল ধরে। তাকে ফিরিয়ে আনার কোনো মানেই হয়না দৈনন্দিন জীবনের প্রাঙ্গণে। আমাদের

চাওয়া-পাওয়ার শিকলের গন্ডির অভ্যন্তরে। সপ্তর্ষির ত্রিসীমানা ছাড়িয়ে....অনন্ত পথের চেতনাকে সম্বল করে....বাঁচতে হবে ইহজগতের পাদপদ্মের পাদদেশে।

এখানে তো আমরা নেই দুজনে। কথাও বিলীন হয়ে গেছে নিঃশব্দ চেতনার নীরব অনুভূতিকে কাছে পাওয়ার সংযোজনে। দুজনের কারও মধ্যে নেই কোনো অনুভূতির হিসেব। পরে আছে স্মৃতির মণিকোঠায় এক অনন্ত অন্তহীন চেতনা! সেখানে নেই কোনো পূর্ণতা....সেখানে নেই কোনো শূন্যতা....সেখানে নেই কোনো অতৃপ্তির ছোঁয়া....সেখানে নেই কোনো ভালোলাগার মায়া....সেখানে নেই কোনো বিষাদে ঢাকা কালো মেঘ।

সময়টা হয়ত থেমে গেছে আমাদের স্মৃতির দুয়ারে। অতীতের স্মৃতি মিশে গেছে ভালোলাগার ক্ষণিকের চাওয়া-পাওয়ার বাসরে। এই বিচ্ছেদের ক্ষণটাও পরমুহূর্তেই অতীত হয়ে যাবে জানি। তুমি কি ভাবে চলে গেলে থোড়াই আমি কেয়ার করি? আমরা তো থাকব পড়ে স্মৃতির মজলিশে। জ্বালাব দিয়া মনের তুলসীতলায় অতীত থেকে ভবিষ্যতে।

যে যেখানে ছিলাম সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকব চিরকাল। তোমাকে এর পরেও আর কি কিছু লেখার আছে? বলে দেবে মহাকাল।

সৌম্যদার বিয়েতে তোমার-আমার প্রথম দেখা। সেই মুহূর্ত থেকেই তোমাকে ভালোলাগা। ভালোবাসা থেকে ভ্রমণ সবটাই একটা অনন্ত মুহূর্তের প্রতিফলন। আমাদের আনন্দযজ্ঞে সাক্ষি হয়ে থাক সময়ের আবর্তন। তুমি আমার কল্পনার স্বপ্ন বাসরে দিয়া জ্বালাবে সর্বকাল ধরে। আমিও তো তোমারই থাকব সর্বদাই চিরকাল ভরে। বাসরঘরের আলো সেও তো অলিম্পিকের মতন অনন্ত মশালের শিখা। লেখা থাক আমার দেওয়া নাম-না-জানা চিরপথের সত্য বার্তা। দিগন্ত পড়ে থাক মরীচিকার কোলে। অনন্ত খেলে বেড়াক মহাকালের দোলে। তোমার আমার গাঢ় রাত্রির অমানিশা। এখন ভরে গেছে অনন্তের আলোয় দেখাচ্ছে শূণ্যতার মধ্যে পূর্ণতার নতুন দিশা। তাই দিয়ে গাঁথব মহাকালের মালা....সাজাব

তোমাকে মন প্রাণ ভরে আমার অনন্ত ফুলশয্যার ব্যথাহীন ডালা। নিভবে না সে দীপ কোনোদিন পাওয়ার মঙ্গলালোকে। চিরদিন চিরকাল ধরে জ্বলবে আলো, ফুটবে তারা নতুন পাওয়ার আলোকে।

পিঙ্কু আমার দিকে ফিরে বলল “আমাকে ছেড়ে এতদিন কোথায় গেছিলে মা?”

পিঙ্কুকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বললাম “কোথাও তো যাইনি মা। আমি তো এখানেই তোমার পাশেই আছি।”

“আমার কেন যেন মনে হল তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেছ।”

“তোমাকে ছেড়ে কোথায় যাব মা? তুমিই তো আমার সব।”

পিঙ্কু কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে বলল “তাহলে বোধহয় আমি ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম।”

“তুমি একা কেন? আমরা তো সকলেই ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখি।”

ঘর থেকে বেড়িয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ কি মনে হতে ফিরে বলল “আজ পড়তে বসে ‘হেলিওসেনট্রিক’ শব্দটা পেলাম। ওটা কী মা?”

“কতদিন আগে পড়া ছেড়ে দিয়েছি। এখন কী আর মনে আছে? দেখিও তো....পড়ে বলব।”

ইকনমিক্সটা ডিগ্রির লোভে পড়েছিলাম। সেই সুবাদে পদার্থ ফিসিক্স নিয়ে কিছু চর্চাও করেছিলাম। এখন মনে হচ্ছে শুধু পরীক্ষাটাই পাশ করেছি মাত্র। কিছুই শিখিনি আমি এতদিন এতকাল ধরে, তাই মেয়ের প্রশ্ন টাও আজ দুরবোধ্য। পিঙ্কু যেন চোখে আঙুল দিয়ে সেই কথাটাই বুঝিয়ে দিল আবার। অনেক কিছুই না-বুঝে, শুধু পুথি পড়া বুলিগুলো মুখস্ত করে, পরীক্ষার হলে বমি করে দিতে পারলেই আমি হয়ে গেলাম কৃতী! সেটাই তো আমাদের তথাকথিত সামাজিক স্বীকৃতি। তার মোহর গলায় ঝুলিয়ে আমরা হয়ে যাই বুদ্ধিজীবী

শিক্ষিত অপদার্থ ক্লীবলিঙ্গ সমান। বড়াই করি নিজেদের জ্ঞান....সব বৃথা অর্থহীন পার্থিব সম্মান।

আমি তো এ ব্যাপারে জানিনা কিছু। শেখবার চেষ্টাও করিনি কোনোদিন। অর্থ বুঝতে এখন করছি মাথা নীচু। তুমি কী এ ব্যপারে কিছু জানো? জিজ্ঞেস করা হয়নি তো তোমাকে কখনও। হয়ত অনুভূতির উপলব্ধিতে এসব কথা মাথায় খেলেনি তখন। আমিই বোকা। চেষ্টা করিনি শিখতে তার আসল সারটুকু।

দিগন্তের সীমারেখা যখন ধাবমান মরীচিকার মতন দূরে-দূরে সরে-সরে যাচ্ছে....যখন হাত বাড়ালেও সীমার কুলটা অসীমের মধ্যে নোঙর খুঁজছে....যখন সরে-সরে যাচ্ছে অনন্তের চেনা রেখাগুলি....ঘটনার প্রবাহ ক্রমশ সীমিত অর্থহীনতায় বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, ঠিক তখনই। ঠিক....ঠিক....সেই সময় চেতানাটা যেন একটা অতন্দ্র অন্ধকারের বুক চিড়ে প্রশস্ত আলোকে ভরে গেছে। তখনই তো নিজের অক্ষমতা, বারবার দ্বারে এসে করাঘাত করছে। বৃথাই খুঁজেছি তাকে অমোঘ সত্যের না-চেনা অন্ধকারে। সে অমৃত তো রয়েছে আমাদেরই মাঝখানে।

কী হবে জেনে, কোথায় চলেছি আমরা? সময়ের চলার মাপকাঠিটা তো হারিয়ে গেছে, তবুও ছুটছি মনের মণিকোঠায় নিয়ে পশরা। সীমান্তটা হারিয়ে গেছে অজানার কোলে। স্তব্ধ হয়ে গেছে শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতিটি মুহূর্তের পলে।

তুমি না সেদিন আইষ্টাইনের কী সব তত্ত্ব বলছিলে? ঠিক বুঝতে না পারলেও, অনুভব করতে অসুবিধা হয়নি, কী বলতে চাইছিলে। বিনসারের ওই আঁধারে হ্যজাকের আলো অনেক না-বলা কথা বলে দিল নিঃশব্দে। সেখানেই লুকিয়ে আছে আসল সত্য। আমাদের পাঠগণিতের অঙ্কের মধ্যে নয়! বিজ্ঞান আর দর্শনের যুগল দ্বন্দ ....এক ছন্দের কম্পনে আলোকরেখা ছড়ায়। সেখানেই লুকিয়ে আছে, এ জীবনের শিক্ষা। এতকাল পড়েছি অনেক, হয়নি এতদিন শিক্ষা। এবার তোমাকে পেয়ে পেলাম অনন্ত রংমশালের নতুন দীক্ষা।

সব শুধু আমাদের আজগুবি কল্পনা। তত্ত্ব জ্ঞানীর জ্ঞানতত্ত্বের আসরে জ্বালাতে চাইছে ম্রিয়মান স্ফুলিঙ্গ। কোনো কালের কোনো সময়ের অর্থহীন অজ্ঞতার ভোরে। বিজ্ঞান ধর্ষণ করেছে দর্শনকে নিশুতির অন্ধকারে। নতুন দর্শনের নিত্য নতুন ভাবনার ব্যঞ্জনার পার্থিব স্বরলিপি লিখেতে চাইছে বৃথাই....যুগ যুগান্তরের অনাদি কালের অনন্ত সত্য থেকে যাবে সর্বকাল ধরে সর্বদাই।

পিঙ্কুর প্রশ্নের উত্তরটা তো আমায় খুঁজে বার করতেই হবে। এ তো আর কালের প্রবাহে ভেসে যাওয়া মুহূর্ত নয়। এ তো এক ছোট্ট শিশুর মায়ের কাছে একান্ত আবদার। ওকে দেখাতে হবে সেই সত্যের বাহার।

আজকাল ইন্টারনেট থাকার জন্য অনেক সুবিধা হয়েছে। গুগল সার্চ করলে অনেক তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় অনায়াসেই।

কোপারনিকাস এইওহেলিওসেনট্রিক্ঽ শব্দটা আবিষ্কার করে কোনোদিন। সমর্থিত হয় গ্যালিলিওর উপাখ্যানের স্তুতিতে সেখানেওজিওসেনট্রিক্ঽ থেকে ওহেলিওসেনট্রিক্ঽ এর একটা পারাডাইম সিফট্ নিয়ে কতই না গুরুগম্ভীর তত্ত্ব ।

আদৌ কী তা বাস্তবে প্রযোজ্য?

এক প্রজন্ম থেকে যুগ-যুগান্তরের প্রজন্ম বলেছে এক-ই শব্দ। বারবার প্রতি পলে যুদ্ধ করছে, ব্যবচ্ছেদ করছে, রেপ করছে, ছিনিমিনি খেলছে - সেই অনাদি অনন্ত শাশ্বত সত্য। আমার নয় তোমার, কিংবা পিঙ্কু সৈকত অথবা জন্ম-জন্মান্তরের একটা প্রজন্ম আর চেতনার রঙে বিভোর হয়ে নেই। হারিয়ে গেছে সময়ের কোলে....ব্যাপ্তিটা শুধু না জেনেই। সময়ের গতিতে ছুটে চলেছে কালের প্রবাহ ধরে। ধরা পড়ে গেছে শুধু যুগ-যুগান্তরের মহাবিশ্বের মহাকাশের কালের বিস্তৃত অনন্ত সময়ের পরিব্যাপ্তির গহ্বরে।

হয়ত সেখানেই আসল দ্বন্দ ।

এরিষ্টোটাল, প্লেটোর কাছ থেকে একটা অচলকে সচলের বাহুডোরে বাঁধতে চেয়েছিল জাগতিক মাপকাঠিতে ভর দিয়ে। প্লেটোর সে পথে পা দিয়েছিল অনেকেই। আগাষ্টিন, ডেসকার্টিস, লক, হিউম, কান্ট, হেগেল থেকে মার্কস সেই অচলের পথে। নিজের তত্ত্ব বিন্যাস করেছে নিজ নিজ ঢঙ্গে। সচলের পথে হেঁটেছিল এরিষ্টোটাল একুইনাসের সঙ্গে। একুইনাস এরিষ্টোট্যলকে সমর্থন করে নিরাকারের মধ্যে সাকারের ছন্দ আঁকতে চেয়েছে জাগতিক রূপে ।

প্রশ্নটা তা নয়। প্রশ্নটা মানছি কি মানব না? সেটাই আসল প্রশ্ন যুক্তি -তক্কের ফোয়ারায়। মহর্ষি সেজে সপ্তর্ষি খোঁজা মূর্খতার লক্ষণ। অনুভব করেও বুঝতে না-চাওয়াটা বাতুলতা ভরা আস্ফালন।

আমি তো কোনো মহর্ষি নই। দূরে....বহুদূরে....ওই সপ্তর্ষির আলোটার পথে হেঁটেছিলাম, তোমাকে সহচর করে। জ্বলছে কি জ্বলছে না, তাও তো জানিনা। বিনসারের আঁধারে বসে পেলাম আলোর নতুন ঠিকানা।

ভিক্টোরিয়ায় ফুচকা খেয়ে, প্রিন্সেপ ঘাটে বসে নাই বা গুনলাম আমার স্বপ্নের ভাসা নিভে যাওয়া তারাগুলোকে। কী হবেই বা একটা মিথ্যে স্বপ্নের বুনিয়াদ গড়ে সন্ধ্যাতারার আলোকে? নাইবা খেললাম চাওয়া না-পাওয়ার খেলা....ধাবমান মরীচিকার পেছনে ছুটে বেরিয়ে বৃথাই সাজিয়ে না-সাজালাম তার ভেলা। বাস্তবের পক্ষিরাজে চড়ে....নাইবা সাজালাম মনের চাওয়ার গোলাপের থালা....অনন্ত কালের না-ছোঁয়া কল্পনার অসীমের সময়হীন রথে।

পিঙ্কু তো এখনও বর্তমান। সৈকত এখনও আমার কাছের প্রিয়বান। তুমি তো এখনও আছ আমার সামনে। আমি তো এখনও আছি হাতে তুলে নিয়ে গোলাপ। যেখানে ছিলাম আমরা সেখানেই তো আছি। আছে সব ঠিকঠাক। কিছুই তো হারায়নি এই চাওয়ার মেলায়। নয় মুহূর্তটাকে বরণ করে নিলাম, ওই গোলাপ হাতে রুপোলি থালার ডালায়।

আমি ঘরে বসে টিভি তে আজকের তাজা খবর দেখছিলাম মন দিয়ে।

ঘরে ঢুকে পিঙ্কু বলল্ওমা একটা কথা বলবঃ

ওবলোনা কেন শুনিঃ

ওসুর্য্যাস্তের আলো যখন সমুদ্রের আলোর ওপর চিকচিক করে, কোনোটাকে দেখব আমিঃ

থমকে গেলাম।

টিভিটার মিউট বটন টিপে কয়েক সেকেন্ড। হাউসকোটটা ঠিক করতে করতে ভাবলাম কী জবাব দেব পিঙ্কুকে? সময়টাকে ব্যাপ্তি দিচ্ছি উত্তরের অপেক্ষায়। নিজেকে আবার সাজাচ্ছি কালের আভরণের প্রতীক্ষায়। সময়টা শুধু আমার না-জানার পরিব্যাপ্তি মাত্র। তাকে প্রকাশ করি কেমন করে? আজ তো সময় হয়েছে নতুনকে কিছু বলার পুরোনো শিকড় ছিঁড়ে। কী দেখতে হবে কালকে? সেই চেতনাটাও তো শেখাতে হবে ওদেরকে।

মুহূর্তটাকে সঙ্গি করে উত্তর দিলাম ওকে্ওদুটোই দেখবেঃ

ওকোনটা? সুর্য্য না তার রিফ্লেকশনঃ উত্তরটা এখনও অপরিষ্কার পিঙ্কুর কাছে।

ওদুটোই....কারণ দুটো জিনিসই ঘটছে একই মুহূর্তেঃ

তুমি তো পিঙ্কুকে চেননা। তুমি তো সৈকতের কথা জাননা। আমিও রয়ে গেলাম তোমার অজানা আলোকে। তুমিও থেকে গেলে আমার চেতনার পুলকে।

এরপরে আর কি কোনো কথা বলা যায়? একটা মুহর্ত মাত্র পার হয়ে যাবে কালস্রোতের সময়। জানা-অজানা মিশে যাবে সময়ের মাটিহীন স্রোতে। আমরা চিনব আমাদের নিজেদের, নিজের আলোকে। তোমার চোখে শুনব আমি জীবনের গান। আমার মদির চাওনিতে তুমি খুঁজে পাবে তোমার ভালোবাসার প্রাণ।

তখনও থাকব আমি। তখনও থাকবে তুমি। কায়ার আকার ছেড়ে ছায়ার ধূসরে। সেখানেই অনন্ত কাল মিশে যাবে, না-বলার ছন্দের সুরহীণ স্রোতে।

জ্বলবে আলো, ফুটবে গোলাপ, খেলবে তারা, অন্ধকারের প্রাঙ্গনহীণ ভোরে। সেখানেই আছি আমি। সেখানেই আছ তুমি। সময়ের কালবর্তের আলোকিত পথহীণ নির্জন দীপালোকে।

কী বলো?

মিথ্যে তো বলিনি পিঙ্কুকে? হয়ত, ও এখন ব্যাপারটা বুঝবে না জানি। কিন্তূ একদিন হয়ত চেতনা হলে কথার মানেটা ধরবে তখুনি। আমিও তো তোমাকে জানতাম না, তোমার সঙ্গে বেরোতে যাবার আগে। হয়ত তোমাকে মন ভরে চাওয়া, তোমাকে ভালোবাসা, আমার চেতনাতে বহ্নি শিখা জ্বালিয়েছে অজান্তে অলখ্যে।

কৌশানি থেকে সোজা ফেরত চলে এসেছিলাম আবার সেই কাঠগুদাম হয়ে দিল্লিতে। যাবার সময় কত কথা হয়েছিল। ফেরাটা ছিল নীরবতার অনুভূতির স্রোতে।

না-ধোয়া নীল জিনস্ আর কোঁচকানো কালো টপস্-এর দিকে চোখ ছিলনা আমার। লিপষ্টিকের প্রলেপ লাগাতে তো ভাবিনি দুবার। বাসি জামাকাপড়গুলো নয় বাড়িতে গিয়েই ধোব। কে আর দেখছে আমাকে এখনও?

আমার সবটাই দেখে নিয়েছ তুমি। আভরণে ঢেকে কী লোকাতে পারব, তোমাকে আমার আমি?

ওঘোরাটা স্বার্থক হল বটে

ওহ্ অস্ফুট স্বরে মাথা নাড়লাম তোমাকে।

জীবনের বহু আকাঙ্খিত সব চাওয়াগুলো এক সম্পূর্ণতার পাওয়ার আলোকে বাসি হয়ে গেছে, ঠিক আমার কাপড়গুলোর মতন আনন্দের পুলকে।

ওকী যে ভূত চেপেছিল মাথায় আমার! হঠাৎ বেড়িয়ে পড়েছিলাম তোমার সঙ্গে নিজেকে চিনতে আবার

ওএকা কেন বলছ তুমি? সেও তো আমার। না বেরোলে কি জানতে পারতাম এত কিছু? বারবার ফিরে ফিরে কি পেতাম তোমাকে?

ওতোমাকে কিংবা আমাকে?

বেড়িয়েছিলাম তোমাকে জানতে, বুঝতে, ভালোবাসতে। জীবনের না-পাওয়াকে, নিজের মতন করে, নিজের সুরে সাজাতে। ফেরার সময় বুঝতে পারলাম কিছুই আসা যায়না। স্বপ্ন শুধু মায়াবী মরীচিকা ধরতে তাকে চাইনা। নিজের জীবনকে অস্বীকার করে নতুন কিছুই পাওয়ার আর নেই। এই বলয় ভেদ করে মহাকালে ছড়িয়ে পড়েছি আমরা সবাই। চাওয়াটা তো কবেই থেমে গেছে এই মহাবিশ্বের রথে। পাওয়াটাও পাখনা মেলেছে তারই পথ ধরে নতুন এক আকাঙ্খার স্রোতে।

তোমার সঙ্গে এই কটাদিন আনন্দেই কাটল বটে। তবুও তুমি এখনও অজানা আমার কাছে। বিবাহিত না অবিবাহিত, কী আসে যায় তাতে? তোমারও অনুমান করি আমার মতন ঘর-সংসার ছেলেপুলে আছে। তুমি মানুষটা যেই হওনা কেন? তাতে কি আমার প্রয়োজন আছে? ময়ূরপঙ্খিতে উড়তে তুমি খুব ভালোই জানো।

সৈকত কেমন - সেকথা ভেবে কাজ নেই আর....

ভালোবাসাটা কায়া ছেড়ে হারিয়ে গেছে বিশ্বরথে তাকেই নতুন করে সাজাই আবার।

কী হবেই আর এসব কথা এখন বসে ভেবে? কী হবেই বা আমার তোমাকে জেনে বা না-জেনে, পাওয়ার কোনো লোভে? স্বপ্নের গতিটা যখন থেমে গেছে তার শেষ প্রান্তে মিশে। সেখানেই তো সময়টা উঠে গেছে মহাকালের অদৃশ্যে।

সেখানে তো তুমি নেই....সেখানে তো আমি নেই....সেখানে তো সৈকত নেই....সেখানে তো পিঙ্কু নেই....সেখানে তো গতি নেই....সেখানে তো প্রগতি নেই....সেখানে তো আবেগ নেই....সেখানে তো বিচ্ছেদ নেই। পড়ে আছে শুধু এক

মুহূর্তের পল। শূন্যতার মধ্যে ক্রমশ ভাসছে মুহূতের্র সোনাঝরা সকাল। আলোকিত অন্ধকারে সেখানেই জ্বলবে দেওয়ালির রংমশাল।

আমরা শুধু দুটি কায়াহীন উলঙ্গ আত্মা। বাঁধা পড়ে গেছি সময়ের স্পুটনিকে....

তার শেষ কোথায় সে তো জানিনা।

তোমাকে....

কস্তূরী



অবশেষে

মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠল উলুধ্বনির মধ্যে।

যেন ওঙ্কারের শব্দটা ট্রিনিটি থেকে ছিটকে আবার উচ্চারিত হচ্ছে সৌম্যের বিয়ের বাসরে। সানাই এর আওয়াজটা হারিয়ে গেছে শতাধিক লোকের কোলাহলে। চারিদিকে বেনারসী শাড়ি আর গিলে করা পাঞ্জাবির আতিশয্যে, রং-এর বন্যা বইছে অনুষ্ঠানের আসরে। কেউ কেউ আবার এই গরমে স্যুট-টাই পরেও হাজির হয়েছে পাশ্চাত্য প্রথাতে। প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য যেন যুগলবন্দি গাইছে আগামী দিনের সুরে।

সুরটা অজানা। তবুও হয়ত একটা রেশ এখনও প্রবহমান। সেই সুর গিয়ে মিশেছে ওঙ্কারে। আর্য থেকে আনার্য সভ্যতার বুৎপত্তিতে।ওন্ম্ কখনওহুঁম্ তে রূপান্তরিত হয়ছে এই শুভ মন্ত্র চ্চারণে। সৃষ্টির প্রথম শব্দ উচ্চারণের আগমনী সুরে....শূন্যতা থেকে পূর্ণতার প্রথম বাচস্ফুটনে। এই আদি অনাদি সত্য যেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু , মহেশ্বরকে একই সূত্রে বেঁধে দিয়েছে। মন্ডুক উপনিষদের ভাষায়ওঅ্ এর পার্থিব আকারটা মিশে গেছেওউ্ এর আকারহীনের পথে। সেখান থেকে আকারহীণ আবার ভেসে গেছেওম্ এর নিরাকারে। এক অনাবিল আলোকের ঝর্ণাধারায় মহাবিশ্বের কেন্দ্রবিন্দুতে। সেখানে দেশ, স্থান কাল, পাত্র মিশে গেছে এক সীমাহীন বিশ্বের আলোকিত দেবালয়....

কিছুক্ষণের মধ্যেই দুটি মানুষকে একছত্রে বেঁধে দেবে সংসার রথের যজ্ঞহুতাগ্নির মন্ত্রের শপথ। নতুন কোনো এক যাত্রার চিরন্তন অজানা পথে। বিন্দু থেকে সিন্ধুর দিকে ছোটার স্বপ্ন প্রচেষ্টায়। মহাকালকে আবার ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে চাইবে এক অদৃশ্য মরীচিকার বলিরেখার পেছনে ছোটা ধাবমান স্রোতে। ইতিহাস হাসবে মহাকালের হৃদয় জুড়ে। হাসবে সময় অট্টহাসের নীরব ঝংকারে। আবার কোনো নোয়ার আর্কের নোঙরহীন ভাসা তীরহীন তরীতে। বিলুপ্তি থেকে আশ্রয়ের না-জানা দ্বারে। খুঁজবে আশ্রয় এই সংসার রথের ক্ষমাহীন তীরে।

কাঁদবে শুশুক গভীর নীলে তরঙ্গের গভীরে।

বিয়ের আড়ম্বর আর সুন্দরী মহিলাদের সাজের বহরে ভরে গেছে বিবাহ বাসর। গল্প গুজব, হাসি-ঠাট্রা-তামাশা সময়টা যেন সবাই উপভোগ করছে রং-এর আসরে। এটা তো শুধু দুজনের মিলন নয়। এটা সামাজিক আসরও বটে।

ওকৌস্তভ২ ওর আসল নাম নয়।

কী আসা যায় ওর সত্যিকার নামে? সে তো, যে কেউ হতে পারে? অমল, বিমল, কমল, পারিমল কিংবা ইন্দ্রজিৎ, অভিজিৎ, প্রসেনজিৎ বা অন্য কোনো কেউ। নামটা তো শুধু ওঙ্কারের প্রথম ধ্বনির একটা সূত্র মাত্র।

যে মেয়েটি রুপোলি থালা হাতে গোলাপ নিয়ে এগিয়ে এসেছিলওকৌস্তভ২ এর দিকে, তার নামটাও অজানা।ওকস্তূরী২ না হয়ে মঞ্জরী, সঞ্চারী কিংবা বিদিশাও তো হতে পারে। নামটা অবান্তর । শুধু একটা আকারকে জাগতিক পৃথীবীতে চিহ্নিত করা ছাড়া। আর কিছু নয়....

ওদের নামটা যাই হোক না কেন, যে কোনো নারী-পুরুষের ভালোবাসার অঙ্গীকারকে এক যুগল সূত্রে বেঁধে। ওদের নিজের মনে, অপরকে চিহ্নিত করার কায়া একে দিয়েছে আর পাঁচজনের মতন ওদের কল্পনার আসরে। আজকের এই উচ্ছ্বল বিবাহ বাসরে।

ওকসুতরী২র ঘিয়ে রং-এর মটকা শাড়ির খয়রি পাড়ে ঢাকা দেহের নরম শ্যামলা হাতটা দু-আঙুলে গোলাপের বোঁটাটা ধরে রুপোলি থালা থেকে লাল গোলাপটা হাতে নিয়েওকৌস্তভ২ এর কোহিনূরের গিলে করা পাঞ্জাবির বোতামের ফাঁকে গুঁজতে যাচ্ছিল। দু চোখের দৃষ্টি চার চোখে মিশে গেল। কল্পনাটা ঠিক তখনই বাস্তবে সার্থকাতা পেল।ওকৌস্তভ২ কে তার কাজল কালো চোখ দিয়ে দেখল এক পলকে।

সেই মুহূর্তে কত চিঠিই না লেখা হয়ে গেছে সেই দৃষ্টির ঝলকে। সে সব চিঠি এক অর্বাচীন দর্শকের মুহূর্তের কাব্যগাঁথা। তাই নিয়ে সে এক মুহূর্তে লিখেছে তাদের মনের স্বপ্ন কথা। কম্পিউটার তো বিবাহ বাসরে থাকেনা কোনোদিন। কাগজ-কলম নিয়ে দেখেনা কেউ কাউকে, না-দেখা স্বপ্নের র রঙে রঙিন। মনের মাধুরী মিশিয়ে তাকে রূপ দেওয়া যায় অনেক স্বপ্নের আঁকা চিঠিতে। বলা যায় তাদের জীবনের নিঃশব্দ বিন্, তাদের দৃষ্টির রং দিয়ে সন্ধ্যার আড়ম্বরের আলোকে। তাদের দৃষ্টি নিয়ে লেখা যায় কত কথা। যা হয়ত কোনোদিনই হয়নি লেখা। কত ভাবে বলা যায়, কত না-বলা কথা। নিমেষের পলকে হয়ে যায় সেই মুহূর্তে নব নব কাহিনির নতুন চিত্রপট আঁকা।

সে চিঠিগুলো তো মনের অবচেতনের মুহূর্ত মাত্র। মনের দুয়ারে ফিরে দেখলে পাতাগুলো আসলে শূন্য! তবে কি কোনো কিছুই লেখা হয়নি রূপোর থালা এগিয়ে নিয়ে হাতে? কত কথাই নাওকস্তূরী২ লিখতে চেয়েছিল, নানান রং-এর রঙিন কালি দিয়ে সেই মুহূর্তে। মনের খাতার পাতা এখন ধুসর প্যাপিরাস। মনের কলমে লেখা হয়নি একটিও শব্দ....লেখা হয়নি কোনো কাহিনি....লেখা হয়নি অনুভূতির কোনো বহিঃপ্রকাশ। মনের পটে কল্পনার পাতাগুলো সব-ই তো শূন্য রয়ে গেছে। কী হবে মনের শূন্য কাগজের না-বলা লেখাগুলো আর বুকে ধরে রেখে? মনের স্বপ্ন দিয়ে আঁকা চিঠিগুলো ছিঁড়ে ফেলাই তো ভালো। সাদা চিঠিটা কাহিনিতে ভরে কী বলবে কাকে? সেটাই তো চিনলো না এখনও। কাহিনিটা তো

শুধু নিমেষের পলকে গাঁথা এক কবিতার মালা। কাহিনিটা তো জীবনের না-পাওয়ার পূর্ণতার এক মুহূর্তের পূর্ণতার আসল বরণডালা।

একটু ভাবলেই বোঝা যাবে এ শুধু কল্পনার এক ঝলক। তাই নিয়ে লিখে যাওয়া যায় কত ঘটনার প্রবাহ ফেলতে এক নিমেষের পলক। দুজনের চিঠিতে ফুটে উঠবে তাদের পাওয়া না-পাওয়ার মোহ। প্রেমের সুরে সুর মিলিয়ে কত অন্তরের চিঠির বাকহীণ প্রবাহ। নানা রূপে আঁকা জীবনের নানান স্রোতে ঢাকা। সব মিলে-মিশে একাকার হয়ে যাবে দুজনে হৃদয়ের যুগলস্রোতে একা। ঘটনাগুলো অনায়াসেই সাজানো যেতে পারে পরপর একে-অপরের ছন্দে। কাহিনিটাকে ভুলে গিয়ে সুরটাই চিনবে লোকে তাদের দ্বিধা-দ্বন্দের বাস্তব আলোকে। চিনবে তাদের দৃষ্টির সত্য ঠিকানা। যা মুহূর্তে থেমে গেছে হারিয়ে নিশানা। প্রিয়া থেকে কৌশানি শুধু মনগড়া স্বপ্নের শরিক। কিছুই ঘটেনি আসলে পলকের দেখায়। হতেও তো পারে, এই কাহিনি আরেক স্বপ্নের মিরিক। এ শুধু চাওনির মনগড়া গল্প, কারও নিজস্ব কল্পনার মায়া। বাস্তবে তাকে যে যেভাবে দেখতে চায় সেটাই আসল কায়া।

ওকৌস্তভ্ব এক দৃষ্টে চেয়েছিল কস্তূরীর কাজল নয়নে। যা কিছু লেখা হয়েছে তার অজানা কারও বা মনের কমপিউটারে। এক পলকের দৃষ্টি দিয়ে কল্পনা করা যায়। পাতার পর পাতা চিঠি কী টাইপ করা যায়? কম্পিউটারের গোটা একটা ফাইল ভরে গেছে কল্পনার চিঠিতে। কে যেন লিখে গেছে চিঠির সমারোহ এক পলকের নিমেষে। লেখাই হয়নি কোনো রিসর্টের উপাখ্যান। এত ঘোরা, এত হাতে হাত মিলিয়ে চলা, সব-ই কারও এক নিছক কল্পনা। এবার মোছার সময় হয়েছে, মিথ্যের এ জল্পনা। মনের কম্পিউটারে পড়ে আছে একটা ফাইল মাত্র। বাংলা ওয়ার্ডটা মুছে গেছে, পড়ে আছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এখনও।

বাইরে বেজে উঠল উলুধ্বনি।ওবর এসেছে....বর এসেছে বলে হাঁক দিতে দিতে সবাই হই-হই করে ঘর ছেড়ে ছুটে বেড়িয়ে গেল তখুনি। ওখানে কী হচ্ছে সেটা

অনুমান করা খুব শক্ত নয়! ঘরের বাইরে থেকে শোনা গেল মঙ্গল শাঁখের আওয়াজ। উলুধ্বনিতে ভরে উঠল বাইরের প্রাঙ্গণ। নিশ্চয়ই রজনীগন্ধার মালা সাজিয়ে সৌম্যকে ফুল-চন্দনের টিপ পড়িয়ে, গাড়ি থেকে নামবার বরণডালা সাজিয়ে বাড়ির মহিলাদের সঙ্গম হয়েছে।

কোলাহলের মধ্যে এই ঘরটা এখন শূন্য।

শুধু কৌস্তভ আর কস্তূরী....

পলকহীণ ভাবে একে চেয়ে আছে অপরের দিকে। দেখছে দুজনে একে অপরকে। না-চেনা মানুষটাকে মনের স্বপ্নের আঁকা পুলকে। কোনো গল্প নেই ওদের মধ্যে, আছে শুধু ওরা দুজনে একাকী বিবাহবাসরে। শুনছে শুধু হৃদয়ের শব্দ নিঃশব্দ কুজনে। ভাষাহীন নীরব চাওনির এক যুগল ঐকতানে। সেখানেই ফুটছে ওদের ছন্দের রেশ না-লেখা স্বরলিপির স্বপ্ন ভাষাহীণ অনুরাগে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে....

চারিদিকের হট্টগোল ছেড়ে আকাশটা আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে ওদের সামনে। অথবা সবকিছুই যেন আকাশ হয়ে যাচ্ছে। আলোয় আলোয় ভরে যাচ্ছে দশদিক। এ বিয়ে বাড়ির বৈদ্যুতিক নিওন আলোর রোশনাই নয়। এ এক নতুন অচেনা আলো। কখনো না-দেখা এক অনৈস্বর্গিক আলোর ঝলমলে বর্ণছটা। যেখানে অন্ধকার মিশে গেছে আলোর বণ্যার প্লাবনে। ওঙ্কারের ম্ এর শেষ ধ্বনি, বারবার ঝংকার তুলছে সেই আলোকিত বিশ্বের অনন্ত পরিব্যাপ্তির চতুরমন্ডলে।

ওরা বুঝতে পারছিল যে বিয়ে বাড়ির হইচই হা-হা-হি-হি শব্দের মূর্চ্ছনার ঝালার নিখাদের শেষ মার্গটা যেন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। হারিয়ে যাচ্ছে শব্দের আলোড়নের বাইরে।

ওদের চারপাশের শব্দগুলো, আস্তে আস্তে পরিণত হচ্ছে দূরের ভেসে যাওয়া সমুদ্রপাড়ের ঢেউগুলোর মতন, একটা অস্ফুট গুঞ্জন হয়ে শান্ত নীরবতার মৃদু তরঙ্গের না-শোনা রবে। তারপর আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছেনা। একটা অস্ফূট

অব্যক্ত স্পন্দন যেন ফিস ফিস করে, মাথার চারদিকে গোলাকার হয়ে ঘুর ঘুর করছে। সেই ফিসফিস করা না-বলা কথা, যেন হারিয়ে গেছে, ওদের অপলক দৃষ্টির না-বলা কম্পনে।

কিছুই বলা হলনা। কিছুই শোনা হলনা। অথচ নিঃশব্দে হৃদয়ের কম্পনে বোঝা হয়ে গেল অনেক কিছু....শুধু এক মুহূর্তের নিমেষে....মুহূর্তের ক্ষণে। নিঃশব্দ অনুভূতির চেতনার নব উন্মোচনে। সময়ের ব্যাপ্তিকে পেছনে ফেলে থেমে যাওয়া সময়ের উর্ধলোকে....উত্তরণের পথে!

এখন আর ওরা সৌম্যর বিয়ে বাড়িতে নেই। মটকা শাড়ি কিংবা কোহিনূরের পাঞ্জাবিটারও কোনো অস্তিত্ব নেই। গোলাপটা যেন এক অদৃশ্য পৃথিবীর দুয়ার খুলে দিয়েছে, থেমে যাওয়া সময়টাকে ধরে....

চারিদিকের চারপাশটা যেন একটা অনন্ত শূন্যের মহাসংগীত গাইছে। সৌম্যর বিয়েটা তো শুধু একটা উপলক্ষ্য মাত্র। ওদের চাওয়া না-চাওয়া, পাওয়া না-পাওয়া অঙ্গীকারহীন রথে চেপে বসেছে। যেখানে স্পুটনিক পৌছয় না। যেখানে স্পেস রিসার্চ স্তব্ধ হয়ে গেছে স্পেসহীন ময়ূরপঙ্খি সাজিয়ে। তার চলার শুরুও নেই। তার চলার শেষও নেই। চলাটা যেন থেমে গেছে ক্ষুদ্র পরমানু থেকে বিশ্বজাগরণের চেতনায়....

একে চেয়ে আছে অপরের দিকে।

অপলক দৃষ্টিতে....

ওরা অবাক হয়ে দেখছিল। একটা ঘোর লাগা, হাল্কা কুয়াশার আবরণে চারদিক যেন আস্তে আস্তে ঢেকে যাচ্ছে। ঠিক সেই ছোটোবেলায় দার্জিলিঙের ম্যালে দেখা, কুয়াশার একটা নতুন রিপ্লে শুরু হয়ে গেছে কখন!

ওরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সেই অনন্ত রশ্মির দিকে। বিস্ময়ে কান পেতে রইল, অন্তরের সেই হারিয়ে যাওয়া গুঞ্জনের নিস্তব্ধ তার সমূদ্রে। অবাক হয়ে, নাক দিয়ে, সেই অপার্থিব কুয়াশার গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করল। অবাক হয়ে, মুখের

মধ্যে জিভের ওপর সেই শব্দের স্বাদ নেওয়ার চেষ্টা করল। অবাক হয়ে, সারা শরীরের ত্বক দিয়ে, সেই প্রোজ্জ্বল আলোটার স্পর্শ পেতে চাইল।

অনুভব করল আস্তে আস্তে ওদের চারদিকে একটা মায়াময় আবরণ ছড়িয়ে যাচ্ছে। ওরা বুঝতে পারছিল সারা প্রকৃতি যেন কি একটা বিশাল কাজের জন্য প্রসতুত হচ্ছে। আকাশ, বাতাস, আর চারদিকের লোকজন, চারদিকের শব্দ....সব যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

ওরা জানত না, তাই বুঝতে পারল না, সেই মুহূর্তে সারা প্রকৃতি এক অদ্ভুত জগতের মধ্যে প্রবেশ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ওরা জানত না, তাই বুঝতে পারল না, যে ওদের চোখের সামনে অভিনীত হতে চলেছে....বিশ্বপ্রকৃতির এক অপূর্ব লীলা। পঞ্চ তন্মাত্র অবগুণ্ঠণ খুলছে মহাবিশ্বের প্রথম উদ্ভাসের জন্মলগ্নে। তার কিরণে প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর রূপ রস শব্দ গন্ধ বর্ণ স্পর্শ।

এর আগে তো কেউ শেখায়নি এই লীলার মাহাত্ম। অথবা সত্য। ওরা জানত না, তাই বুঝতে পারল না, ওরা আজ এই মুহূর্তে সাক্ষী বিশ্বপ্রকৃতির এই অতি বিরল না বোঝা খেলা।

ব্রহ্মা যেন তার দ্বার খুলে দিয়েছে স্তবের প্রথম উচ্চারণের মহা মন্ত্রেওঁ

সময় তার সরল রেখার অনুভূমিক গতি ছেড়ে ঢুকতে চলেছে অন্য এক অনৈস্বর্গিক উল্লম্ব মাত্রার দিকে। সময় তার গতিপথ থামিয়ে, উড়ে চলেছে মহাকালের কোলে। দিগন্তে র শেষ রেশ পেরিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে তার পার্থিব ব্যাপ্তির বাইরে। তার চতুর্থ মাত্রার প্রতি ধাবমান হয়ে। ওদের চোখের সামনে তূরীয় লোকের অবগুণ্ঠণ ধীরে ধীরে উন্মোচন করছে....উল্লম্ব সময়ের সীমাহীন অনন্তে । ওরা নিজেদের নিয়ে পাড়ি দিচ্ছে ভার্টিকাল টাইমের পথে.....এই সময়ের কোনো গন্ডি নেই, কোনো ব্যাপ্তি নেই, কোনো শেষ নেই! আবার কোনো শুরু ও নেই!

অনন্ত পথের যাত্রায় নেমে পড়েছে ওরা দুজনে, সেই সময়ের হাত ধরে।

ওকৌস্তভহ সামনের দিকে তাকাল।ওকস্তূরীর মুখটাই সে শুধু দেখতে পাচ্ছে। আর কিছু নয়। সেই অনৈস্বর্গিক কুয়াশায় হারিয়ে গেছেওকস্তূরীর দেহের বাকী অংশগুলো....তার সুন্দর গলা, তার শাঁখের মত কান, তার দিগন্তে হারিয়ে যাওয়া সাঁওতাল পরগনার পাহাড়ের ঢেউয়ের মত স্তব্ধ বুক, তার মদির নাভি, তার স্বপ্নিল নিতম্বের হারানো ছন্দ।

ওকৌস্তভহওকস্তূরীর চোখের দিকে আবার তাকাল। ওর চোখের চাওনি অবাক করে দিল তাকে। সেই অতল দৃষ্টি তো সে এর আগে কোনো মেয়ের চোখে দেখেনি!

সেই দৃষ্টির মধ্যে কোনো আমন্ত্রণ নেই....কোনো বিসর্জন নেই.... কোনো ভড়ং নেই....কোনো ছলাকলাও নেই। আবার কোনো অবহেলাও নেই। অথচ কী যেন একটা আছে। কিছু একটা, যা সে এর আগে দেখেনি কখনো। একটা স্হির দ্যুতিতে মেয়েটির চোখদুটি উজ্জ্বল হয়ে আছে। শুকতারার মত জ্বলজ্বলে, সন্ধ্যাতারার মত শান্ত নিবিড় স্বপ্নিলে । স্বপ্নের দেখা রাজকন্যার রূপকথা। বইয়ে পড়া বনলতা সেনের পাখির নীড়ের চেয়েও অনেক বেশি স্নিগ্ধতা।

ওকৌস্তভহ অবাক চোখে চেয়ে রইল সেই দিকে।ওকস্তূরীহ ভুলে গেছে তার না-পাওয়ার অঙ্ক। চাওয়ার মাত্রাহীন মোহনা।ওকৌস্তভহ ও ভুলে গেছে তার পুরোনো ঠিকানা।

আস্তে আস্তে ওরা দুজন সেই স্নিগ্ধ অচেনা কুয়াশার মধ্যে গলে গলে মিশে যাচ্ছে। সেই সময় হঠাৎ ওদের মনে হল, সময় যেন স্হির হয়ে গেছে। পেছনের অতীত আর সামনের ভবিষ্যৎ যেন হারিয়ে গেছে। সময় যেন হঠাৎই একটি বিন্দুতে কেন্দ্রিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আর সেই বিন্দুটি যেন বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছে। না....না....সামনেও নয়, পিছনেও নয়....বরং উল্লম্বভাবে। সময়ের বলিরেখা পথের গতি পালটে ফেলেছে। সরে যাওয়া মরীচিকার মতন দিগন্ত ছেড়ে শাশ্বত সত্যের উর্দ্ধালোকে।

সেখানে ওদের কোনো অতীত নেই। সেখানে ওদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। সেখানে শুধু দাঁড়িয়ে আছে বর্তমান। সময় যেন সেই বর্তমানে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে।

সেখানে ওকৌস্তভ২ আর ওকস্তূরী২ ছাড়া আর কেউই নেই!

কিছুই নেই। ভালো নেই....মন্দ নেই....আলো নেই....অন্ধকার নেই....শব্দ নেই....বর্ণ নেই....গন্ধ নেই....স্বাদ নেই....স্পর্শ নেই। এক অকল্পনীয় রূপহীন অরূপ জগতের সিংহদরজা তাদের জন্য খুলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে মহাকালের পথ ধরে....

ওরা অবাক হয়ে দেখছিল বিশ্বপ্রকৃতির এই আজব খেলা। ওরা জানতেও পারল না, যা ওরা অনুভব করছে, তা ওদের চেনা জানা সময়ের অচেনা চতুর্থ তূরীয় মাত্রা।

যাকে বলা হয় উল্লম্ব সময়....বা ভার্টিকাল টাইম।

দুজনের অন্তর থেকে বেড়িয়ে এল, এক না বলা ওঙ্কারধ্বনি ওতোঁমাকে..২

আলতো হাতে ওকস্তূরী২ গুঁজে দিল গোলাপটা ওকৌস্তভ২ এর গিলে করা কোহিনূরের পাঞ্জাবির বোতামের ফাঁকে। তারপর হাঁটু গেড়ে উঠে বসে, শিথিল পায় একটা স্মিত হাসি হেসে চলে গেল ঘরের ওপ্রান্তে ।

কে যেন ওকৌস্তভ২ এর মনের কম্পিউটারের বোতামগুলো নিয়ে খেলছে তখনও। ওকস্তূরী২ তখনও তাকিয়ে আছে ওকৌস্তভ২ এর দিকে পলকহীন ভালোবাসায় নিঃশব্দে নীরবে।

এক্সপ্লোরার খুলে কেউ দেখছে ফাইলটার নাম ওতোমাকে..২ কেউ খুলে দেখছে কারও স্বপ্নের গাঁথা গল্পের আকারে। কী-বোর্ডের বোতামগুলোর ওপর হাত বুলিয়ে যাচ্ছে সেই আকারহীন রচয়িতা আনাড়ি ভাবে। ঠিক যেন সুরতরঙ্গের লহরার স্বরলিপি খুঁজছে। কিন্তূ সে স্বরলিপি তো লেখাই হয়নি, এক পলকের মুহূর্তে।

ওকস্তূরীর স্মিত হাসিটুকু যেন গেঁথে সপ্তসুর তুলছে না-জানা সুরের ঝংকারে। সে সুরের কোনো তাল-লয় নেই। সুর-তাল-লয় যেন বাঁধা পরে গেছে অতীত-বর্তমান-ভিবিষ্যৎ পেরিয়ে চেতনা থেকে অবচেতনের সিংহ দরজায়।

মনে হল কেউ বুঝিওকৌস্তভ২ এর মনের কী-বোর্ডের টচ্-প্যাডটায় হাত বুলিয়ে পয়েন্টারটা নিয়ে গেছেওতোমাকে..২ ফাইলটার দিকে। মাউস টিপে হাইলাইট করছে ফাইলটাকে। তারপর ডান দিকের কোণায় হাত রেখেওডিলিট২ বোতামটা নিয়ে অপ্রাসঙ্গীক ভাবে নাড়াচাড়া করছে।

কী হবে সাদা স্ক্রীনের ফাইলটা কল্পনার খাঁজে রেখে?

ওকস্তূরীর দরজা দিয়ে মিলিয়ে যাওয়া অবয়বটায় শেষ বারের মতন দেখে। মনে মনে টিপলো কারও স্বপ্নের দেখাওডিলিট২ বটনে.... মুছে গেল সব না-লেখা কল্পনা, হারিয়ে গেল গল্পটা, সেই না-লেখা চিঠিওতোমাকে..২

ওকৌস্তভ২ অন্যমনস্কভাবেওকস্তূরীর যাওয়ার পথটার দিকে চেয়ে রইল। তারপর একবার নিজের রিষ্ট ওয়াচটার দিকে তাকাল। ঘড়ির কাঁটা দুটো ওর দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কি যেন বলাবলি করে উঠল।

ওকৌস্তভ২ সেদিকে তাকিয়ে আলতো করে হাসল। তারপর মনে মনেই বলল, ওসময়, তোমাকে..২

****